জীবন সৈকতে

মে ১৯৫৫ থেকে ডিসেম্বর ১৯৬৬ পর্যন্ত
বিভিন্ন দিনে মহামানব শ্রীজীবনকৃষ্ণের
শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতবাণী চয়ণ করে লেখা
একটি দিনলিপি।

জিতু চট্টোপাধ্যায়

মাণিক্য

১২/১বি, গাঙ্গুলী পাড়া লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০২

প্রকাশক ঃ
মাণিক্য
C/O. অরুণ ঘোষ
১২/১বি, গাঙ্গুলী পাড়া লেন
কলকাতা ৭০০ ০০২

ISBN : 978-81-906999-3-8

প্রথম প্রকাশ ঃ
রথযাত্রা, ১৪১৬

বর্ণ সংস্থাপনে ঃ
শঙ্কর প্রসাদ দাস
১৭/১/৩৭, বিধান নগর রোড
কলকাতা ৭০০ ০৬৭

মুদ্রণে ঃ
দেবী অফ্‌সেট প্রাঃ লিঃ
১৩ এম, আরিফ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৬৭

প্রচ্ছদ চিত্রায়ণ ঃ
শ্রী শঙ্খশুভ্র সাঁই
সিউড়ী, বীরভূম

সম্পাদনা ঃ
স্নেহময় গাঙ্গুলী
বোলপুর, বীরভূম
দূরভাষ : ৯৮৭৫০০৭১৬৮

মূল্য ঃ ৬০ টাকা

—ঃ পরিবেশনায় ঃ—

১) মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০১২

২) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী,
কলকাতা ৭০০ ০০৬

৩) শ্রী অরুণ ঘোষ
১২/১বি, গাঙ্গুলী পাড়া লেন
কলকাতা ৭০০ ০০২
দূরভাষ - ০৩৩ ২৫৫৬-৮২৭৪

৪) পবিত্র দত্ত
ভুবনমোহন রায় রোড
বড়িশা, কলকাতা - ৭০০ ০০৮
দূরভাষ - ০৩৩ ২৪৪৭ ৩৪৬৩

৫) অসীম বিশ্বাস
৭/৭, প্রিয়নাথ ঘোষ লেন
হাওড়া - ৪
দূরভাষ - ৯২৩১৬৭৪৪০১

৬) শ্রী সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরধাম
১/১ কালী ব্যানার্জী লেন
হাওড়া - ১

৭) নির্মলচন্দ্র মণ্ডল
এ-৯/৫৯, কল্যানী, নদীয়া
দূরভাষ - ৯৮৩১০৭৭০৪২

৮) শ্রীধর ঘোষ
চারুপল্লী, বোলপুর, বীরভূম
দূরভাষ - ০৩৪৬৩-২৫৫৩৭৬

মুখবন্ধ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (জিতু) হাওড়া মোটর কোম্পানীতে কাজ করতেন। তিনি ১৯৫৪ সালে কালীঘাটের পৈতৃকভিটা ছেড়ে হাওড়ায় বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন। পরের বছর শ্রীজীবনকৃষ্ণের পদতলে আশ্রয় লাভ করেন। তার প্রথম দর্শনের বিবরণ তারই লেখা থেকে উদ্ধৃত করা হ'ল।

'তিরিশ বছর বয়সের পর থেকে ধীরে ধীরে ভগবৎ চিন্তার উন্মেষ হতে থাকে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু হয়; ধর্ম বিষয়ে আলোচনায় যাঁরা অগ্রণী তাঁদের কথা শুনতে আগ্রহ বাড়ে। কিন্তু তৃষ্ণা মেটে না। কিসের জন্য ব্যাকুলতা তা বুঝতে অক্ষম, মন কী চায় তা-ও ঠিক জানা নেই, শান্তি কোথায় তাই বা বলবে কে? কী এক অজানা অচেনা জিনিসকে পাবার জন্য অস্থিরতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

বেশ কিছুদিন এইভাবে কেটে গেছে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি। অফিস থেকে বাড়ি ফেরা হচ্ছে। সহকর্মী বন্ধু শ্রীকালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। কথা প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ করলেন যে সম্প্রতি এক মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। কদমতলা এলাকায় কেদার দেউটি লেনে তিনি থাকেন। কারও কাছ থেকে কোনো কিছু তিনি গ্রহণ করেন না, কারও সেবা তাঁর দেহ সহ্য করতে পারে না, কারও বাড়ি তিনি যান না, কাউকে মন্ত্রও তিনি দেন না। অথচ বহু লোক তাঁকে স্বপ্নে দর্শন ক'রে থাকেন। ... বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও অভিনব, প্রচলিত ধারার যেন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, এর পর থেকে বন্ধুবর প্রায়ই তাঁর কাছে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু মনে এক বিরাট দ্বন্দ্ব। তখন সবে একটু আশ্রয় গড়ে উঠেছে, ভোগবাসনায় আসক্তিও কম নয়, তখনকার ধারণা অনুযায়ী সুকৃতির অঙ্ক শূন্য, দুষ্কৃতির বোঝা ভারী। ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী পড়ে ধারণা হয়েছে যে, ভক্তদের পাপতাপ গ্রহণ করার ফলেই তাঁর গলায় ক্যানসার। বন্ধুবর কথিত সেই মহাপুরুষ কে তা তখন জানা নেই। কিন্তু প্রকৃতই যদি কোনো মহামানব তিনি হন তবে তাঁকে পাপের বোঝা সমর্পণ করে পুণ্য সঞ্চয়ের আগ্রহে মন উৎসাহ পেল না, নিজেকে সংযত করতে হলো।

কিন্তু যত দিন যায় সেই মহাপুরুষকে দর্শন করার আগ্রহ তত বেড়ে

চলে। ১২ই এপ্রিল তারিখটির কথা কখনো ভোলার নয়। সেদিন সকাল থেকেই কি এক দারুন অস্বস্তি, কি এক অব্যক্ত যাতনা! অফিসে সাধারণত কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়, কিন্তু সেদিন অফিসের কাজও মনকে টানতে পারছে না, সারা অঙ্গে তুষের আগুন— সর্বক্ষণ জ্বলছে। সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে কোনো রকমে আর স্থির থাকা গেল না, বেরিয়ে পড়তে হলো কদমতলার পথে। নির্দিষ্ট পথের আভাস জানা আছে, বাড়ি থেকে মিনিট দশেকের হাঁটা পথ। নিজের উপর সব কর্তৃত্ব তখন হারিয়ে গেছে। পা দুটি দেহটিকে টেনে নিয়ে এসে থেমে গেল সেখানে— যেখানে আসার জন্য এতদিন ধরে ব্যাকুলতা। যেখানে সকল জ্বালার শান্তি, যেখানে সকল দ্বন্দ্বের, সকল দুঃখের অবসান, যেখানে ধর্মজগতের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর, যেখানে আবহমানকাল ধরে মানুষের কাতর প্রার্থনা সার্থক হয়ে রূপায়িত হয়ে আছে শ্রীজীবনকৃষ্ণ মূর্তিতে!...

তখনো বাইরে দাঁড়িয়ে। অনিমেষ নয়ন শ্রীজীবনকৃষ্ণে নিবদ্ধ। এমন বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ, দেহের সঙ্গে প্রতি অঙ্গের এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য, এমন আকর্ষণী অন্তর্ভেদী চাহনি আগে তো কখনো দেখা যায় নি। কণ্ঠস্বর কত স্নেহসিক্ত অথচ কী তেজোময়! প্রতিটি কথা যেন ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেহকে নাড়া দেয়। তখন পাঠ চলছিল। একজন পাঠ করছিলেন, আর মাঝে মাঝে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করছিলেন। ব্যাখ্যায় তখন কান ছিল না, ব্যাখ্যাকারই সমস্ত প্রাণটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে কোথায় চলে গিয়েছে সেই জ্বালা, সেই অব্যক্ত যাতনা, সেই সীমাহীন অস্থিরতা। কিছুক্ষণ পরে পাঠ শেষ হয়ে গেল। পঠিত গ্রন্থটি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত) সকলে একে একে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। দু-একজনের তখন নজর পড়েছে বাইরের দিকে। আমাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁরা ভিতরে আসতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তখনো দ্বিধা, তখনো সঙ্কোচ। অবশেষে আহ্বান এল জীবনদেবতা শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছ থেকে, 'কে রে বাবা, ভেতরে আয়।' বাইরে থেকে তিনি নিয়ে এলেন ভিতরে। হাঁটু গেড়ে কোল পেতে বসে ছিলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তাঁর ইঙ্গিতে কোলে মাথাটি নত ক'রে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে বাঁচা গেল। মুখটি তাঁর কোলের ভিতর, মাথায় এবং পিঠে তাঁর শ্রীহস্তের মৃদু স্পর্শ। সমস্ত দেহে অনির্বচনীয় আনন্দের প্রবাহ। ইন্দ্রিয়ের কাজ তখন স্তব্ধ, শান্তি আর আনন্দই যেন তখন সত্তার স্বরূপ। ...

সেই আনন্দের আমেজে কয়েকটি দিন বিভোর হয়ে থাকা গেল। ক্ষুধা নেই, ঘুম নেই, আনন্দ মুরতি শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে, অন্য কিছু ভালো লাগে না। কেবল ভালো লাগছে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে। ..... চারদিন পরের কথা। সেদিন ১৬ই এপ্রিল, শনিবার। তখন প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর রামনাম গান হোত। প্রথমে রামনাম সংকীর্তন, পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি দেবীর আরতি স্তব। আবিষ্ট হয়ে সেই সঙ্গীতাঞ্জলী শোনা গেল। এমন শ্রবণসুখকর উদ্দীপনাময় সঙ্গীতানুষ্ঠান আর কোথাও শোনা গেছে বলে মনে হলো না। গানের পর প্রণাম, সে দিনের পালা সাঙ্গ করে অনেকেই তখন বিদায় নিয়েছেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ কোল পেতে বসে আছেন খাটের উপর। প্রণাম করার পর তিনি প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ বাবা, কিছু দর্শন হলো?' কিছু দর্শন হয়নি শুনে আবার প্রণাম করতে বললেন। তন্ময় হয়ে প্রণাম করার সময় মাথায় তাঁর করকমলের কোমল স্পর্শ অনুভূত হলো। অবর্ণনীয় আনন্দে বিভোর হয়ে মন চাইছে তাঁর চরণলগ্ন হয়ে মগ্ন থাকতে। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর নির্দেশে মাথাটি তুলতে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় আবদ্ধ হলো তাঁর শ্রীমুখে। এ কী অভাবনীয় দৃশ্যান্তর! কে ইনি? স্বর্ণকান্তি জ্যোতির্ময় পুরুষ। হাস্যোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল। পশ্চাতে বিচ্ছুরিত জ্যোতিপুঞ্জ। সেই ভুবনভোলান রূপ থেকে নয়ন ফিরান অসম্ভব। সর্বাঙ্গে তখন বিদ্যুৎ শিহরণ। সেই অবস্থাতেই ভিতর থেকে এল হাসি। বাইরে হাসির অভিব্যক্তি। কিন্তু অন্তরে উঠেছে প্রশ্ন, 'ওগো বলো, কে তুমি? তুমি কি সর্বজীবের পরম আশ্রয়? তুমি কি সেই? ... তুমি কি সে-ই? তুমি কি সে-ই?' কিন্তু কী আশ্চর্য! অন্তরের প্রশ্ন তিনি জানলেন কেমন করে? যতবার প্রশ্ন আসছে মনে, ততবারই বাইরে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত উত্তর ধ্বনিত হলো, হ্যাঁ—! হ্যাঁ—!! হ্যাঁ—!!! বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, কোন এক ভক্ত এসে আমাকে ধরে ফেললেন। সেদিন যারা ঘরে উপস্থিত ছিলেন তাদের কাছে পরে শুনেছি, যখন তাঁর কৃপায় তাঁর সুবর্ণময় রূপ আমার দর্শন হচ্ছে তখন ঘরের বাকীদের উদ্দেশ্যে উনি বলেছিলেন, ও এখন হিরন্ময় পুরুষকে দর্শন করছে! কী আশ্চর্য!'

দীর্ঘ বারো বছর ধরে মহামানব শ্রীজীবনকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গকরার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। কী আশ্চর্য, এই বারো বছর স্ত্রী,

দুইপুত্র ও এক কন্যার ছোট্ট সংসার নিয়ে তাকে কখনও বিব্রত হতে হয়নি। তাঁর সহধর্মিণী এ বিষয়ে তার খুবই অনুকূলে ছিলেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম ভাগ্যবতী নারী, যিনি শ্রীজীবনকৃষ্ণের কথা শোনার অনেক আগেই তাঁকে অন্তরে দর্শন করেছিলেন।

প্রথম দিকে প্রতি শনিবার তিনি অফিস ফেরৎ কালীঘাটের বাড়ীতে মায়ের কাছে যেতেন বলে সেদিন শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে যাওয়া হত না। তিনি একবার এক স্বপ্নে দেখলেন— শ্রীজীবনকৃষ্ণ চোখ বড় বড় করে বলছেন, এ কী ছেলেখেলা? প্রত্যেক দিন আমার কাছে আসবি। এরপর থেকে তিনি মায়ের সঙ্গে দেখা করে অল্পক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে সোজা চলে যেতেন কদমতলায় শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে। প্রতিদিনের আলোচনার সার কথা যেটুকু স্পষ্টভাবে মনে থাকত সেটুকু ডায়েরীতে লিখে রাখতেন। সেই ডায়েরীই পরে ''জীবন সৈকতে' নাম দিয়ে ত্রৈমাসিক মাণিক্য পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানে দ্বৈতবাদী রামকৃষ্ণময় জীবনকৃষ্ণ কিভাবে ১৯৫৮ সালের ৪ঠা জুনের পর নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অদ্বৈতবাদে উত্তীর্ণ হয়েছেন ও শেষে আত্মিক একত্বের মূর্তরূপ হয়ে উঠেছেন তার একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনার বিশেষ অভাব অনুভব করে তিনিই প্রথম এই মহান কার্যে ব্রতী হন। তার সেই লেখা ''মহাজীবন'' এই ডায়েরীর প্রথমেই উদ্ধৃত হ'লো।

অনুরাগীবৃন্দসহ শ্রীজীবনকৃষ্ণের পুরী, বেনারস ও আলপুকুর বাসকালে তাঁরই ইচ্ছাক্রমে জিতেনবাবু সেখানেও তাঁর সঙ্গী হয়েছেন। বেনারসে তাঁর সঙ্গসুখের স্মৃতি ''বরযাত্রী'' প্রবন্ধে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রী ধীরেন রায় মাঝে মাঝে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করে শ্রীজীবনকৃষ্ণের কথা সমর্থন করলে ঘরের আলোচনা অন্য এক মাত্রা পেত। তারই ছোট্ট কিন্তু নিখুঁত এক ছবি এঁকেছেন ''আমার পণ্ডিতমশাই'' প্রবন্ধে। তবে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান শ্রীজীবনকৃষ্ণ বিরচিত ধর্ম জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ''ধর্ম ও অনুভূতি''-র নিবেদন অংশটুকু লেখা। স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা এই ''নিবেদন'' ঐ গ্রন্থটির উচ্চমানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

এছাড়া ''ধর্ম ও অনুভূতির'' প্রচ্ছদটিও তার নিজের আঁকা। সেখানে শ্রীজীবনকৃষ্ণের বহির্লেখ (outline)-এর মধ্যে ''ধর্ম ও অনুভূতি'' কথাটা লেখায় এর প্রতীকি ব্যাঞ্জনা বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। এর অর্থ ধর্ম অনুভূতিমূলক আর এই অনুভূতি হয় দেহের ভিতর। শ্রীজীবনকৃষ্ণ স্বয়ং অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেছিলেন, বাবা দেশটা যদি ফ্রান্স হতো তাহলে এত সুন্দর প্রচ্ছদ পরিকল্পনার জন্য তোকে পুরস্কৃত করত। জিতেনবাবু শুনে বললেন, এই তো আমার পুরস্কার পাওয়া হয়ে গেল। আমি অন্য কোন পুরস্কার চাই না।

১৯৬৪ সালে বৌবাজারের গীতা ভবন থেকে প্রথম 'ধর্ম ও অনুভূতি' পাঠের ডাক এলে শ্রীজীবনকৃষ্ণের স্মরণে এল জীতেনবাবুর কথা। তিনি তার প্রিয় জিতুর বাড়ীর কাছে গিয়ে রাস্তা থেকে ডাক দিলেন, 'জিতু, জিতু' বলে। জিতু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তার আরাধ্যকে দেখে অভিভূত। জিজ্ঞাসা করে সব জেনে বললেন, আপনি এসেছেন আর আমি পাঠে যাব না। আপনি যেখানে যেতে বলবেন সেখানেই যাব। শ্রীজীবনকৃষ্ণ খুশি হলেন। পরে পাঠের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনে ও শ্রোতাদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া জেনে নির্দেশ দিলেন, যেখানেই পাঠ হবে প্রথম তিনদিন পাঠ করবে জিতু— তারপর সেখানে অন্য পাঠক পাঠানো হবে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের আদরের জিতু খুব কাছ থেকে জীবনকৃষ্ণসমুদ্রের নানান তরঙ্গ প্রত্যক্ষ করে ব্রহ্মানন্দে অভিষিক্ত হয়েছেন। কিন্তু আম খেয়ে মুখ মুছে ফেলেননি, অন্যদের তা আস্বাদন করানোর জন্য, সমুদ্রস্নান করানোর জন্য, সযত্নে তার জীবন্ত ছবি এঁকেছেন এই গ্রন্থের পাতায় পাতায়। এই ছবি পর্যবেক্ষণ করতে করতে পাঠকের অন্তরে ব্রহ্মসমুদ্রের প্রত্যক্ষ দর্শন হলে এই উদ্যোগ সার্থক হবে।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
মহাজীবন	. . .	i – xiv
জীবনসৈকতে	. . .	১ - ২০৬
আয় বাবা আয়	. . .	২০৭ - ২১০
বরযাত্রী	. . .	২১১ - ২২২
আমার পণ্ডিতমশাই	. . .	২২৩ - ২৩৩
লহ প্রণাম	. . .	২৩৪

মহাজীবন

আমাদের এই ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। ঋষি মুনি অবতার সাধু সন্তের আবির্ভাবে এই পুণ্যভূমি পবিত্র হয়ে আছে। আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের দর্শনশাস্ত্র মূল্যায়নের অতীত। আমাদের সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য— সর্বত্রই ধর্ম তার প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু যাঁরা এই ধর্ম চেতনাকে উজ্জীবিত করেছেন সেই প্রণম্য আচার্যদের আধ্যাত্মিক জীবনের কথা, তাঁদের ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশ, অনুভূতি ও উপলব্ধির ধারাবাহিক বিবরণ খুবই বিরল। 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম'। ধর্মজীবনের রহস্য অস্পষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এতদিন ধারণা ছিল— অনুভূতির কথা বললে অপরাধ হয়।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন প্রচলিত ধারণার বিপরীত কথা। তিনি বলেছেন— গোপনতা অষ্টপাশের একটি পাশ। গোপন করলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। সত্য স্ফুরিত হয় প্রচারের জন্য। দেহেতে আত্মার প্রকাশ ও লীলা। সেই প্রকাশের কাহিনীর নাম ভাগবত। এই ভাগবত প্রচারে অপরের ভক্তি বিশ্বাস বাড়ে, অপরাধের প্রশ্নই ওঠে না।

কঠোপনিষদে একটি মন্ত্রে আছে—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ (১/২/২৩)। আত্মা যাঁকে বরণ করেন তিনিই আত্মাকে লাভ করেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে শিশুকাল হতে আত্মিক শক্তির অভ্যুদয়, বিকাশ ও পরিণতির কথাই আমরা প্রধানতঃ আলোচনা করব।

বাংলা সন ১৩০০ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে শ্রীজীবনকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয় ১২ বছর ৪ মাস বয়সে। কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বে ঊষা যেমন পূর্ব গগনকে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে, তেমনি শৈশবে ও বাল্যে কিছু দর্শন ও অনুভূতি শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনপ্রভাতকে মহিমামণ্ডিত করেছে। মাতৃহারা এই শিশুটি প্রথমে দিদিমার কাছেই লালিত পালিত হয়েছিলেন। প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন বছর বয়সে তিনি কালী মূর্তি দর্শন করেন। একদিন মধ্যরাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে। দিদিমাকে খুঁজতে খাটের শেষ প্রান্তে এসে দেখেন খাটের নীচে পূজার উপকরণ সাজান। দিদিমা পূজা করছেন। সামনের

দিকে চোখ ফেরাতে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন। ভয়ঙ্করা কালীমূর্তি দেখে শিশু জীবনকৃষ্ণ ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। পূজার আসন থেকে ছুটে এসে দিদিমা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। এইভাবে জীবনের প্রভাতলগ্নে কালী— আদ্যাশক্তি, দর্শন দিলেন, বরণ করলেন তাঁকে। আর এক দিনের কথা। তখন তাঁর বয়স চার বছর। দুপুরে তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে। পিছনের রান্নাঘর হয়ে পাশের বাড়ীতে যাবেন, দেখলেন সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক বিধবা মহিলা। পিঠে এলো চুল। ধীরে ধীরে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। এই মহিলাটির কোন পরিচয় তিনি আর পান নি, বা পরেও কখনও দেখেন নি তাঁকে। পরবর্তী কালে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন, পরাবিদ্যা মূর্তিমতী হয়ে তাঁকে দর্শন দিয়েছেন ওই শিশুকালে। আরও কয়েকটি অনুভূতির কথা বাদ দিয়ে তাঁর সাড়ে দশ থেকে এগার বছর বয়সের সময় একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সময়ে একবার শ্রীজীবনকৃষ্ণ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে তখন কেউ ছিল না, একটি অপরিচিতা নারী এসে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিনেও ঠিক ওই সময়ে সেই মহিলাটি যখন তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তখন শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে গা?' মহিলাটি উত্তর দিলেন, 'আমি শীতলা'। এই দর্শন প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন, 'রিপুনিচয়ের তেজ খর্ব করার জন্যই আদ্যাশক্তি ওই রূপে এসে আমার দেহটি শীতল করে দিলেন।'

শিশুকাল হতে 'কানু অনুগত তনু'তে এবার সচ্চিদানন্দগুরুর আবির্ভাব—শ্রীজীবনকৃষ্ণের বয়স তখন বার বছর চার মাস। স্কুলের ছাত্র তিনি। পড়াশুনা সেরে খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে শুয়েছেন। নিদ্রায় অভিভূত বালক স্বপ্নে দেখলেন— অপরিচিত সৌম্যকান্তি এক পুরুষ তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন। পরপর দুদিন রাত্রে সেই অজানা মানুষটি দেখা দিলেন তাঁকে। পরে পনের বছর বয়সে একটি ছবি দেখে বুঝেছিলেন— ঐ যে অজানা মানুষটি মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা দেন, তিনি আর কেউ নন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার বহু পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূল শরীরে লীলা সংবরণ করেছেন কিন্তু

সচ্চিদানন্দগুরুরূপে তিনি বালক জীবনকৃষ্ণকে কৃপা করেছেন, পরে ভগবান-দর্শন করিয়েছেন যার কথা যথাসময়ে আলোচিত হবে।

এবার রাজযোগে অভিষেক। তের বছর আট মাস বয়সে তাঁর একটি অভিনব অনুভূতি হল। একদিন মধ্যরাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পাশে বসে সারারাত তাঁকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। ঊষার আগমনে রাত্রির অন্ধকার যখন বিলীয়মান, স্বামী বিবেকানন্দ অদৃশ্য হলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণের মাথার মধ্যে একটা ধ্বনি ও লেখা ফুটে উঠল— 'রাজযোগ'। এখানে বলা প্রয়োজন যে স্বামী বিবেকানন্দকেও বালক তখন জানতেন না। পরে তাঁর ফটো দেখে চিনেছিলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ যখন বালক মাত্র, ধর্ম সম্বন্ধে কিছু ধারণা ছিল না, কিছু জানতেন না বা বুঝতেন না তখন অন্তর্যামী ভগবানের কৃপায় তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে তিনি কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কথা উল্লেখ করতেন ঃ

'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী
আমি অবাক্ হয়ে শুনি কেবল শুনি। ...'

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলতেন, বাবা, আমি কিছু করিনি। শুয়ে থাকতাম আর দেখতাম সব আপনা হতে হয়ে চলেছে। তিনি কোন মানুষ গুরুর আশ্রয় নেন নি, জীবনে কখনও পূজা অর্চনা করেন নি, একটা মন্ত্রও জানা ছিল না তাঁর। সমস্যা কণ্টকিত যন্ত্রযুগের মানুষের কাছে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন এক নূতন প্রেরণার উৎস। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলতেন, বাবা, ভগবানকে পেতে হলে কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু ভগবানের কৃপা।

সচ্চিদানন্দগুরুর আবির্ভাবে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহ যোগযুক্ত হল। কুণ্ডলিনী বা মহাবায়ু জাগ্রত হল। এবার দেহে কোষের পর কোষ মুক্ত হবে, একটির পর একটি ভূমি অতিক্রম করে আত্মিক শক্তি এগিয়ে চলবে ভগবান দর্শনের পথে। বেদমতে আমাদের দেহেতে পাঁচটি কোষ,— অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ। এই পাঁচটি কোষের মধ্যে আছে সাতটি ভূমি। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূ এবং সহস্রার। সাধারণতঃ দেবমন্দিরে যেমন সাতটি সিঁড়ি অতিক্রম করে প্রতিমা দর্শন করতে হয়; আমাদের এই দেহমন্দিরেও সাতটি ভূমি অতিক্রম করে সহস্রারে শ্রীভগবান দর্শন হয়।

অন্নময় কোষ হচ্ছে আমাদের এই স্থূল দেহ। সাধারণ মানুষের মন এই অন্নময় কোষেই আবদ্ধ থাকে। সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায় মন অন্তর্মুখী হলে ধীরে ধীরে অপর কোষগুলির আবরণ উন্মুক্ত হয়। অন্নময় কোষ থেকে মন এল প্রাণময় কোষে। এই কোষে প্রথম তিনটি ভূমি— লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি। এই প্রাণময় কোষে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দর্শন করলেন— পেটের দক্ষিণ দিকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বিজড়িত হয়ে স্বচ্ছ নীলাভ জল কল্ কল্ করছে। এ কোষ মুক্ত হল। এবার আত্মিক শক্তির ঊর্ধ্বগতি হল মনোময় কোষে, চতুর্থ ভূমি— হৃদয়ে। এই ভূমিতে মন অবস্থান করার সময় একদিন শ্রীজীবনকৃষ্ণ যেদিকে চাইছেন, দেখছেন— সেই দিকই জ্যোতির্ময়। চোখ পড়ল একটি গাছের ডালে, দেখছেন সেই ডালটি যেন পারা অথবা গলানো রূপার মত জ্যোতির্ময় হয়ে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও এই রকম অনুভূতির কথা পাওয়া যায়। একদিন তিনি কালীঘরে পূজা করছেন। দেখছেন— কোষাকুষি, বেদী, মার্বেল পাথরের মেঝে, চৌকাঠ সব চিন্ময়, জ্যোতির্ময়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ এই দর্শনের রহস্য ভেদ করে বলেছেন— তাঁর অন্তরে উদ্ভূত আত্মিক জ্যোতি চক্ষু হতে প্রতিফলিত হওয়ায় তিনি চারিদিক জ্যোতির্ময় দেখছেন অর্থাৎ নিজের চৈতন্যে জগৎ চৈতন্যময় দেখছেন।

এইবার বিজ্ঞানময় কোষে মনের উত্তরণ। বিজ্ঞানময় কোষে তিন ভূমি— কণ্ঠ অর্থাৎ পঞ্চমভূমি: ভ্রূ-মধ্য অর্থাৎ ষষ্ঠভূমি এবং শিরোমধ্যে সপ্তমভূমির কিয়দংশ। কণ্ঠদেশে মন অবস্থানকালে শ্রীজীবনকৃষ্ণের এক বিস্ময়কর অনুভূতি হয়। একদিন দুপুর বেলায় তিনি শুয়ে আছেন। চারিদিকে প্রখর সূর্যের আলো। তিনি হতবাক হয়ে নিজের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দর্শন করলেন। তাঁর স্থূল দেহ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। উপরার্ধে তিনি পুরুষ নিম্নাঙ্গে তিনি নারী। এই অদ্ভুত দৃশ্যে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন, ছুটে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। এই বিস্ময়কর বিচিত্র উপলব্ধিতে তিনি বুঝেছিলেন যে আত্মার লিঙ্গ ভেদ নেই। তিনি পুরুষও বটেন নারীও বটেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত একটি কাহিনীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক গৃহস্বামী বাড়ীতে কালীপূজার আয়োজন করেছেন। তাঁর এক প্রতিবেশী প্রতিমা দর্শন করতে এসে দেখেন যে প্রতিমার গলায় পৈতে পরান। তখন সেই প্রতিবেশী গৃহস্বামীকে প্রশ্ন করলেন, ভাই, তুমি একি

করেছ? মায়ের গলায় পৈতে পরিয়েছ? গৃহস্বামী বললেন, 'ভাই, তুমিই ঠিক চিনেছ! আমি এখনও জানি না— মা পুরুষ না নারী।' শ্রীজীবনকৃষ্ণের এই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দর্শন প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। যুগল মূর্তির প্রচলিত রূপে নারী এবং পুরুষ দুজনের মূর্তি পাশাপাশি লম্বিত ভাবে দেখা যায়; যেমন হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ বা রামসীতা মূর্তি। এগুলিকে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বলা হয়। কিন্তু এগুলি অর্ধনারীশ্বর মূর্তি নয়, ভাবরূপের মূর্তি। অর্ধনারীশ্বর হলেন উপরার্ধে পুরুষ নিম্নাংশে নারী।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের অনুভূতি প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। মন এখনও বিজ্ঞানময় কোষে, কিন্তু পঞ্চমভূমি ছেড়ে সে উঠে এসেছে ষষ্ঠ ভূমিতে। এই ভূমিতে দুটি দর্শনের কথা উল্লেখযোগ্য। এই ভূমিতেই উন্মীলিত হল তৃতীয় নেত্র বা জ্ঞানচক্ষু। একে উপ-নয়নও বলে। দুটি চক্ষু হতে দুটি পৃথক জ্যোতির গোলক বেরিয়ে ভ্রূর উপর এসে এক হয়ে গেল। এই জ্যোতির গোলকের মধ্যে দেখা গেল বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধদেব জ্ঞানের প্রতীক। এই জ্ঞানচক্ষু উদ্ভাসিত না হলে সহস্রারে শ্রীভগবানকে দেখা যায় না। এর পর মায়ামূর্তি দর্শন। এই দর্শনের কথা শ্রীজীবনকৃষ্ণ রচিত 'ধর্ম ও অনুভূতি' গ্রন্থ থেকে জানা যাক—

"তারপর দিনদুপুরে খোলা চোখে নৃত্যপরা রহস্যময়ী মায়ামূর্তি দর্শন। অপূর্ব নারীমূর্তি— অপূর্ব দর্শন। এই নারীমূর্তি দূরে নয়, অতি নিকটে দর্শন হয়। ইনি কৃপা করে দ্বার খুলে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান বা সপ্তমভূমিতে প্রবেশ।

এই নারীমূর্তির গায়ের রং স্নিগ্ধ ঘাস ফুলের রং। বসন ফিকে নীলাম্বরী। নাসায় নীল পাথরের বেশর। দৃষ্টি ভূমিতে আনত এবং আবদ্ধ। ভ্রূ-মধ্যে হাতের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে নৃত্যপরা, নৃত্য ধীর। মূর্তিতে আনন্দ যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে উচ্ছলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ইনি রহস্যময়ী মায়ামূর্তি। আনত ও আবদ্ধ দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিলেন—মায়া রহস্যময়ী। অনুভূতির দ্বারা মায়ার রহস্য ভেদ হয়। জীবন-মৃত্যু রহস্য ভেদ হলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।"

মায়া ষষ্ঠভূমির দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। মন চলল বিজ্ঞানময় কোষের শেষ ভূমিতে। সপ্তম ভূমির দ্বারদেশে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দর্শন করলেন রেশমের

পাতলা পর্দা ঝুলছে, তার পিছনে উজ্জ্বল সূর্য। অহং-এর এই শেষ আবরণ অপসৃত হলে, প্রাণসূর্যকে দেখা যাবে আত্মা বা শ্রীভগবান রূপে।

এবার সপ্তমভূমি— এখানেই হয় শ্রীভগবান দর্শন। শ্রীজীবনকৃষ্ণের বয়স তখন চব্বিশ বছর আট মাস। অটুট ব্রহ্মচর্যে বীর্যবান নির্মলকান্তি এক যুবক তিনি, সবল সুগঠিত দেহ। উপনিষদ বলেছেন— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ (মুণ্ডক ৩/২/৪)। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন, "If a single fibre of the body anyhow gets soiled, there will be no thorough and complete emanation of the soul from the body." এই বিষয়টি সম্ভবত প্রচলিত প্রথায় অন্যরূপ পেয়েছে। বলা হয়— কালো পাঁঠা একটুও খুঁত থাকলে মায়ের বলিতে লাগে না। মায়ের বলি— অর্থাৎ দেহের পূজা, জীবত্ব থেকে শিবত্বে উত্তরণ। একটি গানে আছে— মন চল নিজ নিকেতনে। শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনে এই 'নিজ নিকেতনে' যাত্রা শুরু হয়েছিল বার বছর চার মাস বয়সে। এই যাত্রাপথের একটি অধ্যায় শেষ হতে সময় লাগল আরও বার বছর চার মাস।

শ্রীভগবান দর্শনের সুদুর্লভ অনুভূতির বিশদ বিবরণ ইতিপূর্বে জগতে প্রকাশ পায় নি। শ্রীজীবনকৃষ্ণ চির-অব্যক্তকে ব্যক্ত করেছেন, ভগবান দর্শনের মর্মকথা জানিয়েছেন জগতকে—

চারিদিক জ্যোতির্ময়। অবর্ণনীয় স্নিগ্ধ জ্যোতির যেন এক সমুদ্র। উদ্ভাসিত জ্যোতিঃপুঞ্জের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সচ্চিদানন্দগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এই বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে নীল রেখা দ্বারা সীমায়িত অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মাকে তিনি তর্জনী সংকেতে দেখিয়ে, বলে, বুঝিয়ে দিচ্ছেন— "এই ভগবান! এই ভগবান দর্শন!" শ্রীজীবনকৃষ্ণের তখন পৃথক অস্তিত্ব নেই, শ্রীভগবানের মধ্যে থেকেই শ্রীভগবানকে দেখছেন। এই অনুপম দর্শন হচ্ছে ত্রিপুটি অবস্থায়। আছেন—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা। জ্ঞানরূপে আছেন সচ্চিদানন্দগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি শ্রীভগবানকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। জ্ঞেয়— আত্মা বা শ্রীভগবান। জ্ঞাতা শ্রীজীবনকৃষ্ণ তখন কোথায়? তিনি শ্রীভগবানের মধ্যে থেকেই সব দেখছেন, সচ্চিদানন্দগুরুর কথা শুনে তাঁর নূতন পরিচয় লাভ করছেন। দেহের

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব— তখন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে তন্মাত্র অবস্থায় রয়েছে। উপনিষদের একটি মন্ত্রে যেন এই অবস্থার কিছু আভাস পাওয়া যায় ঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।। (কঠ উপনিষৎ-২/২/১৫)

'ব্রহ্ম সন্নিধানে সূর্য দীপ্তি পায় না চন্দ্রতারকাও দীপ্তি পায় না, এই সকল বিদ্যুৎও দীপ্তি পায় না। অল্প দীপ্তিমান অগ্নি কী প্রকারে দীপ্তি পাইবে? দীপ্যমান তাঁহার অনুগত হইয়াই দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহার জ্যোতিতেই সমস্ত কিছু প্রকাশিত হইয়া আছে।'

শ্রীভগবান দর্শন করিয়ে দিয়ে সচ্চিদানন্দগুরু শ্রীভগবানের মধ্যে লীন হয়ে গেলেন। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এক হয়ে গেলেন, পৃথক অস্তিত্ব বিলীন হল। তখন নূতন উপলব্ধি হল যে সচ্চিদানন্দগুরু শ্রীভগবানেরই এক রূপ। এর পর শ্রীভগবান বা আত্মার অবস্থানের দিক পরিবর্তন ঘটল। বদনমণ্ডলের দিক হতে শিরোদেশের পশ্চাতে তিনি বিবর্তিত হয়ে প্রসারিত হলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন— আত্মার এই প্রসারিত রূপ এক গোছা ধানের শীষের মত— ধান্যশীর্ষবৎ অথবা তাকে ধূমকেতুর লেজের মতও বলা চলে। ক্রমে সে রূপ মিলিয়ে গেল, ফিরে এল দ্রষ্টার জৈবী চেতনা।

এই দর্শন প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ জানিয়েছেন— যে নীল রেখা দ্বারা জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে শ্রীভগবান বা আত্মা সীমায়িত ছিলেন সেই নীল রেখার মধ্যে তিনি দর্শন করেছেন এটমের মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জ্যোতির্বিন্দুর মালা, তখন তাঁর মনে হয়েছে— এই কি রাসলীলা? তিনি আরও বলেছেন যে এই ভগবান দর্শনের সময়েই প্রকৃত সমাধি অবস্থার সূত্রপাত হয়।

কিন্তু ধর্মজীবনের চির আকাঙ্খিত ভগবান দর্শনের সুদুর্লভ অনুভূতিকেও শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁর নিজের সাধনার ফললাভ বলে মনে করতে পারেন নি। তাঁর মনে এক অভিনব প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি তো জানতেন না যে ভগবানকে দেখা যায়, তবে দেখলেন কেমন করে? তিনি বলেন যে মানুষ জন্মায়

অসংখ্য সংস্কার নিয়ে। তার পরিবারের সংস্কার, গোষ্ঠীর সংস্কার, দেশের সংস্কার— সব সংস্কার থাকে তার মধ্যে, শুধু তাই নয়; পৃথিবীতে আবহমানকাল ধরে যা কিছু হয়েছে সব কিছুর সংস্কার থাকে তার মধ্যে। জন্মগতভাবে সেই সংস্কার প্রকাশ পায় ব্যষ্টির সাধনে। তাই যিনি ভগবান দর্শন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তিনিও দেখেন শ্রীভগবানকে। অতীতের ভগবান দর্শনের সংস্কার অজ্ঞাতভাবেই ফুটে ওঠে তাঁর মধ্যে। তাই দ্রষ্টার পক্ষে, সাধকের পক্ষে সত্য হলেও যা সর্বজনীন নয়, যার কোন প্রমাণ দেখান যাবে না মানুষকে তাকে তিনি গ্রহণ করতে রাজী নন।

শ্রীভগবান দর্শনের বহু পরে একটি অনুভূতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দর্শন দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "দেখ, ভগবান দর্শনের কথা যদি কেউ বলে, তুই বলিস— ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) কৃপা করে আমায় ভগবান দর্শন করিয়ে দিয়েছেন"। পাছে উত্তরকালে এই দর্শনের জন্য তাঁর মনে কোন অহংকার জাগে তাই কৃপাময় সচ্চিদানন্দগুরু তাঁকে শিক্ষা দিলেন— ভগবানের কৃপায় ভগবান দর্শন, তোমার চেষ্টায় নয়।

এর পরের অধ্যায় আত্মার সাধন বা বেদান্তের সাধন, সম্পূর্ণ হতে সময় লেগেছিল বার বছর চার মাস। বেদমতে বস্তুতত্ত্বের সাধনে এক একটি অধ্যায় শেষ হতে বার বছর চার মাস করে সময় লাগে। এই বেদান্ত সাধনার উদ্বোধন হল একটি বিশিষ্ট অনুভূতির মাধ্যমে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ 'বিশ্বরূপ' দর্শন করলেন, দেহের মধ্যে আত্মা, আবার আত্মার মধ্যে জগৎ। 'এত বড় বিশ্বসংসার আমার ভিতরে! আমি আত্মা! আত্মা ভিতরে!' অসীম বিস্ময়ে তিনি ভাবেন— 'এত বড় জগৎ'— 'এত বিরাট এই জগৎ'! ..... কেমন যেন একটা ভেল্কি লেগে গেল! জগৎ বীজে পরিণত হ'ল। 'বীজবৎ' অবস্থা। বিরাট বিশ্ব পরিণত হ'ল এক ক্ষুদ্র বীজে। কিন্তু তাও রইল না, বীজ পরিণত হল স্বপ্নে। এতেও তৃপ্তি নেই তাঁর মনে। স্বপ্ন ত'আছে। ..... স্বপ্ন মিলিয়ে গেল, কিছুই রইল না। আমি— আত্মা— জগৎ— বীজ— স্বপ্ন— কিছু না— বোধাতীত! শ্রীজীবনকৃষ্ণের প্রাণচৈতন্য লয় হল মহাকারণে। এখানেই সগুণ সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটল।

ধীরে ধীরে শ্রীজীবনকৃষ্ণের বোধ যখন ফিরে এল তখন তাঁর

মনে হল— আমি ত' ছিলাম না। আমি না। তবে কে? হে ভগবান, তুমি— তুমি! অহংতত্ত্বের লয় হল, শ্রীজীবনকৃষ্ণ ফিরে এলেন তত্ত্বজ্ঞানে। এই সময় এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। একদিন সকাল বেলা। তাঁর ঘরে তখন কেউ ছিল না। তিনি হতবাক হয়ে দেখলেন— তাঁর দেহ হতে এক সজীব সালংকার পার্থসারথী মূর্তি বেরিয়ে তাঁর ঊরুদেশে বসলেন। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তিনি তাকিয়ে রইলেন সেই পার্থসারথী মূর্তির দিকে। কিছুক্ষণ পরে সেই জীবন্ত মূর্তি আবার তাঁর দেহের মধ্যেই লীন হয়ে গেলেন। বেদান্ত সাধনের সময় নানা বিচিত্র অনুভূতি লাভ করে তিনি নিঃসংশয় হলেন যে বাইরে কোথাও কিছু নেই। মানুষের দেহে ভগবান, মানুষের দেহটিই তাঁর বৈচিত্র্যময় লীলার আধার।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে যে তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ হল সেই তত্ত্বজ্ঞানই ক্রমশ অবতারত্বে পরিণত হল। এই অবতারত্বের বিকাশ পথে তিনি একদিন দেখলেন এক ঋষি শূন্য থেকে নেমে এলেন, কিন্তু মাটিতে পা দিলেন না, শূন্যেই রইলেন। তাঁর বিশাল দেহ, বিরাট বক্ষ আর পাখীর পালকের মত মোটা শক্ত দাড়ি। ঋষি ঘোষণা করলেন, 'চৈতন্য শীঘ্রই অবতার হয়ে আসছেন'। তাঁর মনে হল— মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বোধ হয় আবার কোথাও দেহ ধারণ করেছেন বা করবেন। ঋষি সেই কথাই জানিয়ে গেলেন। কিন্তু তা নয়। চৈতন্য উদ্ভূত হল তাঁর নিজের দেহে। তিনি দেখলেন— সহস্রারে দপ্ করে লাল দীপকের আলো জ্বলে উঠল। দেহে চৈতন্য উদ্ভূত হল, এবার জ্যোতি রূপে এই চৈতন্যের অবতরণ। অবতরণ হল দুবার। প্রথম— সহস্রার থেকে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত। দ্বিতীয় অবতরণ— সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত। এই হল প্রকৃত ঈশ্বরকটিত্বের উপলব্ধি। আগমের সাধনে যে অন্তর্মুখী প্রাণচৈতন্য মূলাধার থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, নিগমের সাধনে সেই প্রাণশক্তি অবতরণ করল সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত। এবার 'মানুষ রতন' দর্শন। তিনি পরম ভক্ত, তাঁর সারা কপাল জুড়ে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। তিনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করছেন, আর সেই সঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণের হাতের তালুও কির্ কির্ করছে। ভক্তির অবতার রূপে মানুষ-রতনকে দর্শন করে শ্রীজীবনকৃষ্ণের অবতারত্বে অধিষ্ঠান হল। তিনি বলেছেন, মানুষ-রতনকে দর্শন না করলে প্রকৃত ভক্তি লাভ হয় না।

উপলব্ধির আলোকে শ্রীজীবনকৃষ্ণ অবতারত্বের রহস্য উন্মোচন করেছেন, কিন্তু তিনি কোথাও থেমে যান নি। তিনি ছিলেন ধর্মজগতে প্রগতির প্রতীক। উপনিষদের বাণী— 'চরৈবেতি'— 'চরৈবেতি' তাঁর জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল।

বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে তিনি একলা এগিয়ে গিয়েছেন, দেখতে চেয়েছেন মানুষের আত্মিক জীবনে আরও কত রহস্য লুকিয়ে আছে,— কী অসীম অনন্ত শক্তির উৎস তাঁর সীমায়িত ওই বরতনু। তাঁর কাছে তাঁর অন্তর্যামী দেবতাকেও হার মানতে হয়েছে। একবার তিনি দৈববাণী শুনলেন, 'পাশ্চাত্য কাঁদছে; তুমি সেখানে গিয়ে তাদের উদ্ধার কর'। পরে তিনি বললেন, 'ওরে, কি হল জানিস? দেখছে আমি নাম-মান-যশ চাই কি না। কারণ ওখানে গেলে ওদের নানারকম দর্শন ও অনুভূতি হ'ত। ওরা আমাকে মাথায় করে রাখতো। খুব নাম যশ হ'ত।' যিনি নির্দেশ দিয়েছেন সেই জীবন দেবতাকেও রেহাই দিলেন না। তিনি বললেন, 'কেন ভগবান, পাশ্চাত্য কাঁদছে কেন? তুমি কাঁদাচ্ছ, তাই তো কাঁদছে। তুমি তো সর্বশক্তিমান! তুমি পাশ্চাত্যকে নিয়ে এসো না এখানে। তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়'। এই রকম মানুষ ছিলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। দৈব নির্দেশকেও অকাতরে উপেক্ষা করেছেন।

দৃঢ়চেতা এই মানুষটি সাধারণ মানুষের মতই তাঁর ব্যবহারিক জীবন যাপন করেছেন। তিনি এক বৃহৎ বর্ধিষ্ণু পরিবারে পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর প্রাপ্য কোন কিছুই তিনি গ্রহণ করেন নি। নিজের উপার্জিত অর্থেই জীবন কাটিয়েছেন। উচ্চ শিক্ষা শেষ করে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন। হাওড়া জেলায় আমতার সন্নিকটে নারিটে ন্যায়রত্ন ইনষ্টিটিউশনে তিনি প্রায় এক বৎসর শিক্ষকতা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি মিলিটারীতে চাকরী নেন। তাঁকে মেসোপটেমিয়ায় যেতে হয়। এই সময়ে তাঁর উপার্জিত অর্থ থেকে কিছু সঞ্চয়ের ভাণ্ডার গড়ে উঠল। চাকরী যখন শেষ হল ওই সঞ্চিত অর্থে তিনি বিলাতে গেলেন স্যানিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। বৎসরাধিককাল বিলাতে থেকে তিনি দেশে ফিরলেন। এবার তাঁর চাকরী হল কলকাতা

কর্পোরেশনে। তিনি দুটি বিভাগে প্রায় ত্রিশ বছর কাজ করে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর দিব্যজীবনের কিছু আভাস পেয়েছিলেন তাঁর সহকর্মীরা। তাঁর অবসর গ্রহণ কালে বিদায় অভিনন্দন পত্রে রেলওয়ে বিভাগের সহকর্মীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ক'রে লিখেছেন— 'আমরা দিনের পর দিন তোমার সত্যনিষ্ঠা সত্যাচরণ লক্ষ্য করেছি। তোমার নির্মল বুদ্ধির দিব্য জ্যোতিতে স্নান করে ধন্য হয়েছি। সেই পুণ্য জ্যোতি আমাদের ভাবী জীবনের পথকে আলোকিত করুক। ... হে সাধু তোমাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার!'

শ্রীজীবনকৃষ্ণ অকৃতদার ছিলেন। থাকতেন মাসতুত ভাইয়ের বাড়ীতে পৃথক একখানি ঘরে। ছুটির দিনে বন্ধুদের নিয়ে কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। তিনি চেয়েছিলেন ধর্মজীবনকে কর্মজীবনের আবরণে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। তাঁকে ঘিরে আর এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে যা ধর্মজগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁর ব্যষ্টির সাধনের চরম সার্থকতা হয়েছে সমষ্টিগত সাধনের এক নূতন ধারায়। তাঁর অন্তর্মুখী প্রাণচৈতন্য নিজ দেহের গণ্ডী ছেড়ে তাঁর অজ্ঞাতসারে পরিব্যাপ্ত হয়েছে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে। তাঁর রূপ উদ্ভাসিত হয় মানুষের অন্তরে। স্বপ্নে, ধ্যানে, নিদ্রার আবেশে, কখনও বা জাগ্রত অবস্থাতেও তাঁকে দেখা যায়। তবে প্রধানতঃ স্বপ্নেই এই দর্শন হয় বেশী। স্বপ্নে তাঁর দর্শনলাভ করেন সর্বধর্মের সর্বশ্রেণীর মানুষ, আবালবৃদ্ধবনিতা। দর্শনকারীদের মধ্যে বিদেশীও আছেন। এই দর্শনের কাহিনীও আবার বৈচিত্রে ভরা। তাঁর জীবিতকালে তাঁর কাছে আসার পর মানুষ যেমন তাঁকে অন্তরে দর্শন করতে শুরু করেছেন, তেমনি আবার তাঁর কথা জানা না থাকলেও, তাঁর কাছে আসার আগেই বহু মানুষ তাঁকে দর্শন করেছেন। তাঁর ঘরে মেয়েদের আসার সুযোগ ছিল না। কিন্তু মায়েরা আরও বেশী সৌভাগ্যবতী। নিজ বাড়ীতেই তাঁরা নানাভাবে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছেন। আবার দেহ হতে দেহান্তরে এই দর্শন পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বাড়ীর কোন একজন লোক হয়ত তাঁর কাছে এসেছেন, তিনি শ্রীজীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে পরিবারের অপর সকলেও তাঁর দর্শন পেতে লাগলেন। এই দর্শন কেবল সেই পরিবারটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বিস্তৃত হয়েছে

আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, কখনও বাড়ীর দাসদাসীদের মধ্যেও। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দেখার পর থেকে দ্রষ্টাদের আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়ে যায়, অনুভূতির বিচিত্র সম্পদে তাদের আত্মিক জীবন সমৃদ্ধ হয়। এই আন্তর অনুভূতির প্রভাবে ধর্মের নূতন ধারা সৃষ্টি হয়, জীবত্ব থেকে শিবত্বের পথে মানুষ এগিয়ে চলে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ কাউকেই মন্ত্র দিতেন না। কারও কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। তাঁর ঘরে ফল ফুল মিষ্টান্ন ইত্যাদি আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রায় সকলেই এসেছেন নিজ নিজ দর্শন ও অনুভূতির নৈবেদ্য সঙ্গে নিয়ে। কেউ বা সঙ্গে এনেছেন পরিবারের অপর সকলের অনুভূতির উপচার— বাবা মা ভাই বোন স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের অনুভূতির কথা। শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরখানি ছিল নিত্য আনন্দের হাট, যে হাটে তিনি নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন, গ্রহণ করেন নি কিছু। সর্বসাধারণের অন্তরে অনুভূতি ও উপলব্ধির রুদ্ধ দুয়ার তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মানুষকে জানিয়েছেন— ভগবান মানুষের অন্তরে, মানুষের দেহ-মন্দিরেই তাঁর অফুরন্ত লীলার প্রকাশ!

যিনি মানুষকে এই অস্তি-জ্ঞান দান করলেন এবং ঠাঁই নিলেন মানুষের অন্তরে, তিনি কে? তাঁর স্বরূপ কী?

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন, বুধবার ...

৩রা জুন মঙ্গলবার, শ্রীজীবনকৃষ্ণ অত্যন্ত আকস্মিকভাবে কলেরা রোগে আক্রান্ত হলেন। বিকালে তাঁর ঘরে নিয়মিত কথামৃত পাঠের আসর ভেঙে গেল। তিনি প্রায় বেঁহুশ অবস্থায় শয্যাগত হয়ে রইলেন। সারারাত ওই ভাবে কাটল। কেউ তখন বুঝতে পারলেন না যে শ্রীজীবনকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবনে আর এক নূতন অধ্যায় জন্মলাভ করতে চলেছে। তার কিছু আভাস পাওয়া গেল ৪ঠা জুন বিকাল থেকে। কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সেদিন তিনি যেন আবহমানকালের পুঞ্জীভূত সংস্কারের ব্যাধি থেকে মুক্ত, স্বরূপ প্রকাশোন্মুখ, শুচিস্নাত এক নবজাতক। দ্বিধা এবং সঙ্কোচের আবরণ দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজেই উদঘাটিত করলেন তাঁর ব্রহ্মত্বের স্বরূপ। যে আসে তাকেই তিনি প্রশ্ন করেন, ''হ্যাঁরে তোরা ভজিস শ্রীরামকৃষ্ণ, কিন্তু

দেখিস জীবনকৃষ্ণ! কেন? এর কারণ কি?'' ৬ই জুন তাঁর বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হল। তিনি বললেন, ''দেখ, আমরা পড়ি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, আলোচনা করি তাঁরই জীবনী, তাঁরই কথার যৌগিক ব্যাখ্যা করি। আর, সবার মধ্যে রয়েছে একটা Basic unity। আমরা সকলে তাঁর ভক্ত, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। না, না, ভক্ত বলব না। ওতে অহংকার হয়। আমরা সকলে তাঁর দাসানুদাস। কিন্তু তাঁকে না দেখে তোরা (স্বপ্ন, ধ্যান ইত্যাদি অবস্থায়) আমাকে দেখিস কেন?'' এই প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? সকলেই নিরুত্তর! ... এই সময়ের প্রায় পাঁচ বছর আগে শ্রীজীবনকৃষ্ণের এক অভিনব অনুভূতি হয়। তিনি এক বিরাট অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটি লোককে টেনে তুললেন। লোকটির নাম অনাথবন্ধু। অনাথবন্ধু হাত জোড় করে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে বললেন, ''বাবুজী মশাই! আপনি জানবেন— আপনি ভগবান, তবে গুপ্তভাবে লীলা!''

শ্রীভগবানের গুপ্ত লীলা এবার ব্যক্ত হল। তার ব্যাপ্তিও ঘটল বিরাট আকারে। এক এক করে 'কুড়িয়ে পাওয়া মানিক' এই নামে তাঁর রচিত 'ধর্ম ও অনুভূতি' গ্রন্থের তিনটি খণ্ড প্রকাশ হ'ল। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হল 'Religion & Realisation', গ্রন্থকার হিসাবে নিজের নাম দিয়েছেন— 'Diamond picked up in the street'। দেশের নানা জায়গায় পাঠচক্র গড়ে উঠল। এই পাঠচক্রগুলিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং শ্রীজীবনকৃষ্ণ রচিত গ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা করা হয়। যাঁরা পাঠ শ্রবণ করেন বা তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি পাঠ করেন তাঁদের অন্তরেও ফুটে ওঠেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। নিত্য নূতন অনুভূতির আলোকে তাঁরা নূতন আত্মিক জীবন লাভ করেন। শুরু হয়ে যায় ধর্ম জগতে এক অভিনব নূতন অধ্যায়।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ লোকান্তরিত হয়েছেন বাংলা ১৩৭৪ সনের ২৬শে কার্তিক, ইংরাজী ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর। কিন্তু তাঁর অবিনাশী ঐশী শক্তি পঞ্চভূত আশ্রয় করে পরিব্যাপ্ত হয়েছে অসীম আত্মিক চৈতন্যে। তাঁকে অন্তরে দর্শনের ধারা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। যারা দেখছে তাঁকে তাদের মধ্যে কতই না পার্থক্য! বয়সে, বিদ্যায়, বিভবে— এদের মধ্যে কতই প্রভেদ। একজনের ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে আর

একজনের অনুভূতির কোন মিল নেই। তবু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই স্থাপিত হয়েছে ঐক্য, বহুত্বের মধ্যে ফুটে উঠেছে একত্ব, আর সে একত্বের যোগমূর্তি হল— তাঁর রূপ! ... তিনি এক, আবার তিনি বহু। ব্যবহারিক জগতে তিনি বহু, আবার আত্মিক জগতে তিনি এক। 'স একঃ'।

সত্যের নূতন প্রকাশ— সেই এক হচ্ছেন মানুষ, স্বর্গের দেবতা নন। উপনিষদ বলেছেন, এই ধরার মানুষ আত্মিক বিবর্তনে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন (ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৮/৩/৪)।

আজ তার প্রমাণও দিচ্ছে মানুষ তথা জগৎ। মানুষী তনুর অবসানেও সেই এক—স একঃ— শ্রীজীবনকৃষ্ণ অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে মানুষকে সকল ক্রিয়াকর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে ধর্মজীবনে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। চণ্ডীদাসের কবিতায় নূতন তাৎপর্যে মানুষের জয়গান ধ্বনিত হচ্ছে—

'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

২১শে মে, ১৯৮৫ **শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়**
জীবনকৃষ্ণপল্লী
শ্রীনিকেতন
বীরভূম।

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯২২-১৯৮৯) কলকাতার কালীঘাটের এক মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালে পিতৃবন্ধু প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ ধন্য হয়েছিলেন। কর্মজীবনে তিনি হাওড়া মোটর কোম্পানীর ডিরেক্টরের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। কিশোরদের জন্য ‘‘অবিস্মরণীয় কাহিনী’’ লিখে সাহিত্যজীবন শুরু করেন। কিন্তু এর পরেই আধ্যাত্মিক পুরুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন এবং জীবনের গতিপথ বদলে যায়। ‘পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ’-এর লেখক অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তার সহৃদয় বন্ধু ছিলেন। বহু স্থানে একই মঞ্চে অচিন্তবাবুর সাথে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। রামকৃষ্ণময় জীবনকৃষ্ণ প্রদত্ত রামকৃষ্ণবাণীর দেহতত্ত্ব ব্যাখ্যার মনোগ্রাহী আলোচনায় তিনি ছিলেন বিশেষ পারঙ্গম।

শ্রীরামকৃষ্ণের ‘এগিয়ে পড়’-মন্ত্রের সূত্র ধরে নতুন সূর্য শ্রীজীবনকৃষ্ণের আলোকসামান্য জীবনের প্রচারের প্রথমপর্বে তার ভূমিকা অবিস্মরণীয়। পরবর্তীকালে ত্রৈমাসিক মাণিক্য পত্রিকা মারফৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান পিপাসু মানুষদের কাছে জীবনকৃষ্ণবাণী পৌঁছে দেবার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ‘‘জীবনসৈকতে’’ নাম দিয়ে লেখা তার এই ডায়েরী ধর্ম জগতে তার অশেষ অবদানকে নতুন করে স্মরণ করায়।

জীবন সৈকতে

(১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস থেকে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন দিনে শ্রীজীবনকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী।

অমৃত সমুদ্রের অবিরাম স্রোতধারায় অবগাহন করেও তৃপ্তি হয় না। সঞ্জীবনী বারি সংগ্রহ করে রাখার চেষ্টাও চলে। সিন্ধুর বিন্দু।

তরঙ্গমালার বিভিন্ন রূপ, বিচিত্র তার বর্ণসুষমা, মানুষকে উজ্জীবিত করার অমোঘ তার শক্তি। সংগৃহীত শীকরপুঞ্জ সেই অর্ণবমহিমা প্রকাশ করুক। সত্যের অমৃত আস্বাদনে সকলের নবজীবন লাভ হোক— এই প্রার্থনা।)

প্রথম প্রবাহ

* **সার্থক এই মনুষ্যজন্ম**। কেননা, এই মানুষই ভগবানে পরিবর্তিত হয়। ভগবান তৈরীর এমন কল আর কি আছে রে! এই দেখ্ না - এই দেখ না .... (শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুহুর্মুহু সমাধি)।

* **ভগবান নদীতীরে নেই, হিমালয়ের চূড়ায় নেই, কন্যাকুমারিকায় নেই; আছে তোর ভেতরে**। তাই কাতর হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়— 'হে ভগবান! তুমি ভেতরে রয়েছ, দয়া করে দেখা দাও।'

* **মানুষের ভেতরে রয়েছেন ভগবান্, আর মানুষ সে কথা ভুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে** — পুরী — রামেশ্বর — দ্বারকা — বদরিকা! কোথা ভগবান্! কোথা ভগবান্!

* (একজন নূতন লোক আসিয়া শ্রীজীবনকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল —) **আমাকে প্রণাম করছেন কেন? ভগবানকে চান বলে তো? তিনি যে আপনার ভেতরে রয়েছেন**। ওহি রাম সব্‌সে নিয়ারা। কাতর হয়ে ডাকুন, কাঁদুন, বলুন যে — হে ভগবান্, তুমি আমায় দেখা দাও, তিনি রূপ ধারণ করে ফুটে উঠে বলে দেবেন, দেখিয়ে দেবেন, জানিয়ে দেবেন তিনি কে, তিনি কেমন!

* **তোরা যে আমাকে স্বপ্নে দেখিস— সে কি আমি?** না রে, সে ভগবান্।

* **তোরা যতক্ষণ আমাকে স্বপ্নে না দেখিস ততক্ষণ আমি দুশ্চিন্তায় থাকি**। (একজন নবাগতকে) আমার নাম কী জানিস বাবা? জীবনকৃষ্ণ। কৃষ্ণ অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম। সেই নির্গুণ ব্রহ্ম আমার সাকার রূপ ধরে দেহেতে ফুটে ওঠে। ওই হলো সচ্চিদানন্দগুরু লাভ।

* **সচ্চিদানন্দগুরু দেহেতে উদয় হলে আয়ু বেড়ে যায়**। কেননা সাধন-ভজন না হলে তার আর নিষ্কৃতি নেই। তাই ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলেছেন— হাসপাতালে নাম লেখালে রোগের একটু কসুর থাকতে ডাক্তার সাহেব ছাড়ে না। যত ঈশ্বরানুভূতি হবে তত দেহের পরিবর্তন হবে। তাই ব'লে কি দেহ চিরস্থায়ী হবে? না, তা নয়। কারণ দেহের নিজস্ব শক্তির একটা নির্দিষ্ট আয়ু আছে।

* **যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তিনি কখনও জীবোদ্ধারের কথা বলতে পারেন না**। তিনি তত্ত্বজ্ঞানে বেঁচে থাকেন কিনা। তিনি ঈশ্বরের নরলীলা দেখেন। অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের লীলা দেখেন — মানুষকে উদ্ধারের কল্পনাও করেন না।

* **মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। রক্ষা করতেও ভগবান্, মারতেও সেই ভগবান্**। তাই জীবনভর খালি ভগবানকে ডেকে যা।

* **হ্যাঁ বাবা, কিছু স্বপ্ন দেখেছিস?**

বাঃ বেশ! কী দেখেছিস রে? ওরে বল না। তুই তো বলবি মানুষের দেহে ভগবানের লীলার কথা। সেই তো সত্যিকারের ভাগবত রে! পুঁথি ভাগবতের চেয়ে সে যে অনেক বড় জিনিস।

* **সংসারে ভার কখনও বোঝা বলে মনে করিস নি**। আনন্দের সঙ্গে সে বোঝা বইবি! সেও যে ঈশ্বরের দান। তা না হলে জন্ম থেকেই তো তিনি অন্য রকমভাবে তোদের গড়তে পারতেন।

✻ ঘরে আলো জ্বলছে। আমি দেখছি— এই দেহ ঘর, আর এই দেহঘরে আলো জ্বলে। বৈদিক যুগে ঋষিরা দেহের ভেতরে এই আলো দেখতে পেতেন। পরবর্তী কালে দেহের এই স্বাভাবিক শক্তি হারিয়ে গেল। তখন থেকে শুরু হলো প্রতীক। যে আলো জ্বলতো দেহের ভেতরে সেই আলো এল বাইরে। নিয়ম হলো— পুজোর সময় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে— জাগ্‌দীপ। এমনি আরো কত কী!

✻ মানুষ ভগবানকে ডাকে কেন? আত্মজ্ঞান লাভের জন্যে। ডারউইন (Charles Robert Darwin) Struggle for existence না বলে যদি Struggle for regaining his own Self বলতেন তবে কি চমৎকারই না হতো! মানুষ নির্গুণ থেকে এসেছে আর নির্গুণে ফিরে যাবার জন্যেই সব সময় চেষ্টা করছে।

✻ ধর্ম নীতিবাদ নয়, ধর্ম হাতে করে ধরার বস্তুও নয়, ধর্ম বোঝাবার বিষয়ও নয়, ধর্ম অনুভূতির জিনিস। ধর্ম সম্বন্ধে যে কোন কথা যদি সর্বজনীন না হয় তবে সে ধর্মই নয়।

✻ Rational way of thinking–কে যে যার নিজের পরিভাষায় 'দর্শন' (Philosophy) বলেছে। কিন্তু তা নয়। Actual Visualisation – কেই দর্শন বলে।

✻ 'দুঃখ' হচ্ছে মানুষের অভাব। সেই অভাব মেটে যখন মানুষ ঈশ্বরত্ব লাভ করে।

✻ মানুষের মস্তিষ্কের সৎ বৃত্তিগুলিই হচ্ছে দেবতা।

✻ প্রকৃত সাধু ভগবানকে চায়। যারা সাধারণ লোকের সেবা চায় তারা সাধু নয়, ভন্ড। সন্ন্যাসী রাজার বাড়িতে যাবে না, রাজার দেওয়া ভোজ্য খাবে না, এমন কি রাজার ছায়া পর্যন্ত মাড়াবে না। ছায়া মাড়ালেও ভোগের লিপ্সা হয়। তাই মহাপ্রভু প্রথমে প্রতাপরুদ্রকে কাছে পর্যন্ত আসতে দেন নি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে— দেশের লোককে চালায় কে? রাজা, না সন্ন্যাসী? নেপোলিয়ন এর উত্তর দিয়ে গেছেন। সেণ্ট হেলেনায় নির্বাসনের সময় তিনি বলেছিলেন,— 'আমি আর কী করতে পারলুম! এর চেয়ে ঢের বেশি করে গেছেন— যীশু খ্রীষ্ট'। দেখ্ না, বুদ্ধদেব ও আলেকজাণ্ডার প্রায় সমসাময়িক। লোকে বলে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। কেউ কি বলে— আলেকজাণ্ডারং শরণং গচ্ছামি?

✻ শঙ্করাচার্য লিখেছেন— কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। কিন্তু ওই ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) ছবির দিকে চেয়ে দেখ দেখি। তিনি কি কৌপীন পরেছেন? না। সাধারণ মানুষেরই মত ধুতি পরা। শঙ্করের মত্ তাহলে থাকছে কোথায়?

✻ বাবা, ভগবানকে পেতে হলে কোন কিছুর দরকার নেই। ফল, ফুল, ভোগ, নৈবেদ্য কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনি যে আপনার বাপ, আপনার মা। তাঁকে প্রাণভরে ডাক, কাতর হয়ে বল— জীবনের আরও একটা দিন কেটে গেল। দেখা দাও।

✻ যে স্বস্বরূপকে ভুলে পঞ্চভূতে গঠিত দেহকেই 'আমি' বলে ভাবে, তাকেই ভূতে পাওয়া বলে।

দ্বিতীয় প্রবাহ

✻ গঙ্গায় কত লোকই তো স্নান করে। কেউ স্নান করে নিজে পবিত্র হবার জন্য, আবার কেউ স্নান করে গঙ্গার জলকে পবিত্র করার জন্য।

✻ এই দেহরথে যে ভগবান্ রয়েছেন, সহস্রারে যে ভগবান্ দর্শন হয়, মানুষ সে কথা ভুলে গিয়ে কাঠের রথে জগন্নাথের মূর্তি চাপিয়ে দড়ি টানাটানি করে। এই দড়ি টানা কী?— সহস্রারে কুণ্ডলিনীকে টেনে তোলা—

(শ্রীহস্ত দিয়া দড়ি টানা দেখাইতে গিয়া শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে রথযাত্রা শুরু হইয়া গেল। নিম্নভূমি হইতে কুণ্ডলিনী ক্রিয়াশীলা হইয়া ঊর্ধ্বদিকে উঠিতে লাগিল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধি-ভঙ্গের পর—)

দেহে যে দিন কুণ্ডলিনীর জাগরণ শুরু হলো সেইদিন থেকেই রথযাত্রা আরম্ভ। চৈতন্য সাক্ষাৎকারের সময় থেকে নিগমের সাধন হলো পূর্ণযাত্রা।

* **জীবনে কখনও একটা ফুল দিয়ে পুজো করতে পারলুম না**। এখন বুঝি যে পুজো করতে পারলে ঠাকুরের কৃপা কিছুই বুঝতে পারতুম না।

সাধন অবস্থায় ঠাকুরের অনেক দৈহিক কষ্ট হয়েছে। একদিন আমাকে সুধীন জিজ্ঞাসা করেছিল — আপনারও কি খুব কষ্ট হয়েছে? বললুম, মোটেই না। আমার কোনো কষ্টই হয়নি। খাটে শুয়ে থাকতুম আর দেখতুম — আপনা থেকে সব হচ্ছে। সাধন কাকে বলে তাই আমি জানি না।

* **ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) পার্থসারথি মূর্তি দেখেছিলেন — এ-কথা কথামৃতে আছে**। আমিও দেখেছি পার্থসারথি মূর্তি — ডাহা জ্যান্ত মূর্তি রে বাবা! আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে বাঁ পায়ের ঊরুর ওপর বসলেন। তাঁর হাতে আবার গয়না। আমি হাঁ হয়ে দেখতে লাগলুম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার ভেতরে ঢুকে গেলেন। .... সেটা ১৯৩০ সাল হবে।

* **ঠাকুর বলছেন, 'কালী মন্দিরে বজ্রপাত হলো আর দরজা জানালার স্ক্রুগুলোর মাথা সব উড়ে গেল'**।

কালীমন্দির হচ্ছে দেহ। বজ্রপাত অর্থাৎ পরমাত্মা-সাক্ষাৎকার। স্ক্রু-কব্জা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি। ইন্দ্রিয়াদির মাথা কেটে যায়। কী হয় তা তোদের বলব না, বলতে নেই।

* **বছর তিনেক আগে একটা দর্শন (অনাথবন্ধু দর্শন) হয়েছিল**। সে-কথা কখনো প্রকাশ করি নি। আজ সব খুলেই বলি। কী হবে আর চেপে রেখে? দেখছি—

একটা বিরাট গহ্বর। ভেতরটা অন্ধকার। আমি সেই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে সমস্ত হাতটা ঢুকিয়ে দিলুম, দিয়ে একজন লোককে টেনে বার করলুম, তার নাম অনাথবন্ধু। সে হাতদুটি জোড় করে আমাকে বললে— বাবাজী! মশাই! আপনি জানবেন আপনি ভগবান্, তবে গুপ্তভাবে লীলা।

* **আমার একটা ভাব এসেছে— মনে হচ্ছে— এসব কিছু নয়, কিছু নয়। বেদ-পুরাণ সব এতটুকু— এতটুকু**। যে কথামৃত নিয়ে জীবন কাটালুম সেই কথামৃত এখন আলুনি লাগছে। কোটি কথামৃতের কোটি ব্যাখ্যা করেও ভগবানকে বোঝান যায় না।

দর্শন? অনুভূতি? ওতে তো অহঙ্কার বাড়ে। ব্যাখ্যা করি কেন? সময় কাটাবার জন্য।

* **কিছুদিন হলো এমন অবস্থাতেও (সমাধি অবস্থাতেও) আর একজনের মুখ হয়ে যাই**। এর ফলও আমায় দেবে না। এর মধ্যে দিয়েও আমাকে শিক্ষা দিচ্ছে যে ভগবানই এক এক রূপে রয়েছেন।

* (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে বালব্রহ্মচারীর গল্প আছে। এই প্রসঙ্গটি পাঠ হবার পর শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন—)

ঠাকুর বালব্রহ্মচারীর উপমা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে— যে নারীদেহের গঠন পর্যন্ত জানে না তারই অজগর বৃত্তি হবে, অর্থাৎ বসে বসে খাওয়া পাবে।

কিন্তু যোগযুক্ত হয়ে মানুষ যখন পূর্ণত্ব লাভ করে, বাইরে থেকে খাবার আসার কথা মনে ওঠে কী করে? ওরে ও-খাওয়া নয়, ও-খাওয়া নয়। আমার অজগরবৃত্তি। এর মানে কী বল দেখি?— এই-যে আমি কোথাও নড়ি না, চুপ করে বসে আছি অজগরের মত। খাবার আমার

মুখে এসে পড়ছে। তোরা যারা না-দেখে আসছিস — তারাই ঠিক অজগরের আকর্ষণের মত আমার আকর্ষণে আসছিস। আমি তোদের খাচ্ছি। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দগুরু লাভ করে তোরা আমার সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছিস। এই হচ্ছে সত্যিকারের অজগরবৃত্তি।

* **ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলেছেন— সাধু নারীর অন্তরে থাকবে।** 'অন্তর' কথাটার দুটো মানে। (১) অন্তর মানে তফাৎ আর, (২) অন্তর মানে ভেতর।

এখন, সাধু যদি মেয়েদের কাছ থেকে তফাতে থাকে তবে তাদের ধর্মলাভ হবে কী করে— কেমন না? হবে, যেমন বৌমারা এখানে না-এসে বাড়িতে বসে আমায় দেখছে — অমনিভাবে হবে।

তোরা তো বসানো শিব— তারা যে পাতাল ফোঁড়া শিব।

* **বহুদিন আগে এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে বাগবাজারে শ্রীমার (শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী) কাছে গিয়েছিলুম।** শ্রীমা পায়েস খেতে দিয়েছিলেন।

তারপর তিনি বেঁচে থাকতে আর কখনও ওখানে যাই নি।

আর একবার এক বন্ধু বললে এক জায়গায় যেতে। সেখানে কথামৃত পড়া হয়, সে-তো নাছোড়বান্দা। অনেক টানাটানি করাতে তো গেলুম। তখন গৌরীমার কথা কিছু জানি না। দেখলুম, তিনি খুব ঘোরাঘুরি করছেন, কিছুক্ষণ পরে আর থাকতে পারলুম না। বন্ধুকে গাল দিতে লাগলুম— দুর্! তুই এখানে এসেছিস 'ধম্ম' করতে? চল চল ...!

* ঠাকুরের জীবন অ-সাধারণ। **মানুষ ওই-জীবনকে আদর্শ করে চলতে পারবে না।** দক্ষিণেশ্বরের বাগান চাই, মন্দির চাই, পঞ্চবটী চাই, রসদ যোগানদার মথুরবাবু চাই, ব্রাহ্মণী চাই, তোতাপুরী চাই— সাধারণ মানুষের পক্ষে কি তা সম্ভব?

তাই তো ঠাকুর আমাকে এইভাবে সৃষ্টি করেছেন। দেখিয়েছেন যে— You must eke out your livelihood and be a pious man at the same time.

* **ঠাকুর বলেছেন, ঈশ্বরীয় লীলা চার রকম— ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা।** এছাড়া আর এক রকম লীলা আছে— ভগবান লীলা। সে কী রকম? সহস্রারে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে তিনি যে-লীলা করেন তাই হচ্ছে ভগবান লীলা।

* **ভগবান্ যে দেহধারণ করে আছেন তার প্রমাণ কী?** প্রমাণ ওই সচ্চিদানন্দ-গুরু। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে মানুষের তো কত ত্রুটি-বিচ্যুতি, কত স্খলন রয়েছে। তাতে ভয় কী? তিনি যে অন্তর্যামী! অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব জেনেই তো কৃপা করে তোদের দেহে ফুটে উঠেছেন। তবে যতটা সম্ভব সাবধান হয়ে চলা উচিত।

* **বুদ্ধদেবকে যে বেদবিদ্রোহী বলা হয় তার কারণ দুটো।** প্রথমতঃ, বেদের কার্মকাণ্ডে যাগ-যজ্ঞ-বলি ইত্যাদির কথা আছে; তিনি এই কর্মকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বেদ বলছেন— তিনি (ভগবান্) স্বয়ম্ভু স্বয়ংপ্রকাশ। আপনা থেকে হয়। আর বুদ্ধদেব দেখাতে চেয়েছিলেন যে বিবিদষায় অর্থাৎ চেষ্টা করে ভগবানকে পাওয়া যায়। এই জন্যেই বুদ্ধদেবকে বেদবিদ্রোহী বলা হয়।

* **Ten commandments-ই বল আর পঞ্চশীলই বল— এ-সব-কি ধর্ম নাকি?** এ-সব তো নীতিমূলক কথা— সামাজিক নীতি। ও-সব টেকে না।

* যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন, **knock and the gate shall be opened unto you.** এ-যে বিবিদিষার কথা! Knock করলেই gate open করা যায় না। চেষ্টা করে ভগবানকে পাওয়া যায় না। আত্মা যাকে বরণ করে তারই হয়।

* যীশু বলেছেন— **Parable of the Ten Virgins; কুমারী মেয়েদের বলা হলো বাতি জ্বেলে জেগে বসে থাকতে। বর আসবে, যে ঘুমিয়ে পড়বে সে আর দেখতে পাবে না।**

ওরে তা তো নয়, এ-যে vague কথা। বর যখন আসে সে কি চুপি চুপি আসে? সে যে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আসে। জানিয়ে দেয় — এই! এই!

তৃতীয় প্রবাহ

✻ **The difference between Thakur (Shri Ramakrishna) and his predecessors cannot be conceived.** যীশু বলছেন, Father, Thou art in Heaven। মহম্মদ বলছেন, হো আল্লা, হো আল্লা। চৈতন্যদেব বলছেন, হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ! কেবল ঠাকুরই মনুষ্যজাতিকে একটা fixed definite concrete, practical কথা শোনালেন— ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বর-দর্শনই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ঈশ্বরকে যে দেখা যায় মনুষ্যজাতি সে কথা ভুলে গিয়েছিল। তাঁর পরের কথা হচ্ছে— চাঁদামামা সকলকার মামা। ঈশ্বরকে কেউ ইজারা দিয়ে বসে নেই। তাই ঠাকুর দ্বৈতবাদে সহজ করে বলছেন, সকলেরই ঈশ্বর দর্শন হতে পারে, অর্থাৎ সকলের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন, সকলেই সেই ঈশ্বরে পরিবর্তিত হতে পারে।

✻ **শ্রীরামপুরবাসী জনৈক ব্যক্তি— আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে ঠাকুরের কেন অসুখ হয়েছিল? তিনি যদি ভগবান্ তবে তাঁর ক্যান্সার হ'ল কেন?**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— ওরে, ওসব লোকের সঙ্গে তর্ক করতে নেই। তিনি না বোঝালে এসব জিনিস বোঝে কার সাধ্য? এ হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা। ঋষিরা একে বিদ্যা বলেছেন। এই বিদ্যার সঙ্গে দেহের আধিব্যাধির কোন সম্পর্ক নেই। ঠাকুরই তো বলে গেছেন, দেহধারণের সুখদুঃখ আছেই। তবে এই বিদ্যায় কি হয়? দেহেতে সর্বক্ষণ একটি অপূর্ব আনন্দস্রোত বইতে থাকে।

✻ **নবাগত এক ভদ্রলোক চারিদিকে দর্শন করছেন শ্রীশ্রীজীবনকৃষ্ণ মূরতি।** যেখানে দৃষ্টি পড়ছে সেখানেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখমণ্ডল। এই কথা শুনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলতে লাগলেন—

ঠাকুর একবার স্বামীজীকে সমাধিস্থ (অর্দ্ধবাহ্য) অবস্থায় ছুঁয়ে দেবার পর স্বামীজী প্রায় এক মাস ধরে সব চিন্ময় দেখেছিলেন। যে দিকে চাইছেন সব চিন্ময় ব'লে মনে হচ্ছে। এ হচ্ছে চতুর্থ ভূমির অনুভূতির কথা। আর এখানে কি হচ্ছে? চারিদিকে আমাকে দেখছে। রূপদর্শন— এ হচ্ছে ষষ্ঠভূমির অনুভূতি। এবার তোরাই তুলনা কর।

✻ **কথামৃত পাঠ হচ্ছিল। মহাপুরুষেরা ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন।** শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন— মহাপুরুষ কারা বল দেখি? ঠাকুর কি বলছেন? যাঁরা ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন তাঁরা মহাপুরুষ। অর্থাৎ যাঁরা 'কৃষ্ণ কথা কহ জীব— কৃষ্ণ কথা কহ' বলে গেছেন। এঁরা হচ্ছেন ঠাকুরের পূর্ববর্তী আচার্যেরা। আর সচ্চিদানন্দগুরু অর্থাৎ ভগবানকে দেখান কে? তিনি ভগবান্।

✻ **ঠাকুরের ওই যে কথা — মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ— এ কথা নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।**

বলা যেতে পারে যে সর্বভূতেই তো তাঁর প্রকাশ। গাছ যে বাড়ছে সেও তাঁর প্রকাশ। কিন্তু গাছ বাড়ার কথা বললে বোটানিস্টরা এসে নানাভাবে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবে যে গাছ কেন বাড়ে। তাই গাছপালার মধ্যে তাঁর প্রকাশ একথা অনুমান সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষটা যখন নিজে দেখে— তখন? তাই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ।

আবার এ কথার আর এক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ঈশ্বর মোজেসের মধ্যে একভাবে প্রকাশ হয়েছিলেন। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদের মধ্যে এক এক ভাবে প্রকাশ হয়েছিলেন। শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্যদেবের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ হয়েছিলেন। আবার, ঠাকুরের মধ্যে আর-একভাবে প্রকাশ হয়েছিলেন। তাই মানুষের মধ্যে তাঁর বেশী প্রকাশ।

✻ **ক্রিয়াকর্ম, কৃচ্ছ্রসাধন করলেই কি সাধন হয় রে!** যে ভগবানকে ডাকে সেই সাধক। সাধন ভজন আমি কিছুই জানি না। দেখতাম কি যেন সব হচ্ছে— এই পর্যন্ত। তখন যেন মনে হত— These were part and parcel of my existence.

*** ঠাকুর যে কৃষ্ণময়ীকে দেখেছিলেন আমিও তাকে দেখেছি।** দেখেই মনে হয়েছিল— এই সেই কৃষ্ণময়ী! সাত-আট বছর বয়েস। এদিকে তাকাচ্ছে ওদিকে তাকাচ্ছে, ছোটাছুটি করছে। আমার লেখায় ওকেই বলেছি রঙ্গময়ী মায়া। কি আশ্চর্য বল দেখি!

*** ঠাকুর বললেন— মহামায়া দ্বার ছেড়ে না দিলে হয় না।** মহামায়া কোথায় দ্বার ছেড়ে দেবে বাবা?— ষষ্ঠভূমিতে। সাধন-ভজনের এইসব কথা এমন পরিষ্কার করে আর কেউ কখনও বলে নি। আর বলবেই বা কি করে? নিজের না হলে কি ধরতে পারা যায়?

*** 'মার' এসেছিল বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতির কাছে প্রলোভন দেখাতে।** ঠাকুরের কাছেও এসেছিল। আমাকেও ছাড়েনি। আমি তখন— ওই যে কথামৃতে আছে না থোলো থোলো কালোজাম?— দেখছি। সে দেখা দিলে মেথরের বেশে— দূরে একটা গাছের তলায়। কিন্তু খুব ভীরু লাজুক— যেন আমার সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতে পারছে না। এরা সব আসে দেহেরই ভেতর থেকে। দেহের বাইরে থেকে কিছু হয় না।

*** আত্মাসাক্ষাৎকার না হলে অহং (ego) যায় না।** কারো অহং চলে গেছে কিনা কি করে বুঝবি? আত্মা কোথায়? তোর ভেতরে। তাই তার রূপ তোর ভেতরে ফুটে উঠলে তবে বুঝবি যে তার অহং চলে গেছে।

*** ঠাকুর বলছেন, উঁচু জমিতে জল জমে না, খাল জমিতে জল জমে।** কিভাবে মানুষের দেহে আত্মানিঃসৃত হয় একথা ঠাকুরই প্রথম বলে গেছেন। কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে সহস্রারে নাচতে থাকে। সেই ধাক্কা খেতে খেতে সহস্রার নীচু হয়ে যায়। তখন আত্মা নিঃসৃত হয়, খাল জমিতে জল জমে।

*** ঠাকুর যে গল্পের ছলে, উপমার ছলে, দেহতত্ত্বের অমন চমৎকার কথা বলে যাচ্ছেন তা কেউ ধরতে পারত না।** ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ

ছিলেন তিনি। তাই তাঁর সংস্পর্শে বা তাঁর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যেও যারা আসত তাদের মন আপনা থেকেই সহস্রারে উঠে যেত। তিনি তাদের দেহকে এক অপূর্ব আনন্দরসে ভরিয়ে দিতেন। সেই আনন্দটুকু পাবার জন্যেই তারা তাঁর কাছে যেত। দেখছিস্ না অশ্বিনী দত্ত ঠাকুরকে বলছেন, আপনি ভারি মজার লোক। ঠাকুর বললেন, তুমি তো ঠিক ধরেছ। (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত— ১। পরিশিষ্ট)

*** এক এক সময় আমার মনে হয় যে সংস্কার যায় না।** দেখ্‌না, বুদ্ধদেবকে যে যা দিচ্ছে, বুদ্ধদেব তাই গ্রহণ করছেন। বুদ্ধের বাবা— ও রাজা মহারাজা যে যাই বলুক, তিনি অন্ততঃ তাঁদের জাতের Head man ছিলেন। খুব ভোগে থাকতেন। বুদ্ধের সে সংস্কার যায় নি।

এদিকে ঠাকুরের কথা ভাব। তিনি ছিলেন সাতপো জমিওলা লোকের ছেলে, তাই তাঁর মাথায় পাঁচটা টাকা রাখার জায়গা ছিল না। সকালে উঠেই বলছেন, ওরে রামলাল, ও টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয় বাবু। কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি। বুকে যেন বিল্লী আঁচড়াচ্ছে। কত তফাৎ বল দেখি!

*** বুদ্ধদেবকে তো রাজার বেটা, রাজার বেটা সব করে। কিন্তু রাজ্য ক'মাইল ছিল জানিস?** বুদ্ধদেবের সময় কপিলাবস্তুর area ছিল ৯ মাইল। ..... আমার ঠাকুরদাদাকে (পরমারাধ্য ঁনিত্যধন ঘোষমহাশয়কে) লোকে মুন্সীগঞ্জের রাজা বলত। কি, না তাঁর ৩০০ ঘর প্রজা ছিল।

*** গীতার ওই যে কথা 'সম্ভবামি যুগে যুগে'— এই সম্ভবামি কথার মানে কী বল দেখি?** সম্ভবামি কথার একটা মানে হ'ল আপনা থেকে হওয়া, আপনা থেকে জন্মানো। যেমন একটা এঁদো পুকুরে আপনা থেকে পদ্মফুল ফুটে ওঠে। একটা খানা খুঁড়ে জল ঢেলে রাখ, কিছুদিন বাদে দেখবি তাতে একরকম মাছ জন্মেছে। এ চারা ফেলে মাছ জন্মানো নয়। এ আপনা-থেকেই হয়।

*** এই সেদিন সকালে ভাবতে লাগলুম গীতার কথা। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগের কথা কেন বলেছে? এ সব এল কোথা থেকে?** কর্মযোগের

কথা ছেড়ে দে, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এ দুটোর দরকার কি? যে কোন একটা হলেই তো হোত। হঠাৎ মনে হ'ল আরে এ যে সচ্চিদানন্দ থেকে উৎপত্তি। জ্ঞান হল সৎ, কর্ম হল চিৎ, আর ভক্তি হচ্ছে আনন্দ। সচ্চিদানন্দ কথাটাকে ভেঙেই জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ করা হয়েছে।

* **(উমাপদবাবুর কীর্তন গান শেষ হলে) ওই যে গান গাইলি— প্রভু নাম বিলায়— ওর মানে কি জানিস?** নামের মধ্যে দিয়ে অনুপ্রবেশ করা। এই যে তোরা আমার কথা শুনিস বা আমাকে দেখিস, ওতেও সেই অনুপ্রবেশ হচ্ছে। সেই অণুই স্বপ্নে আমার রূপ ধরে ফুটে উঠছে। মহাপ্রভু তো নাম বিলোলেন, কিন্তু অণু ফুটলো কোথায়?

* (নবাগত শ্রীজাহাঙ্গীর বাটলিওয়ালার কথাপ্রসঙ্গে) **ওরে, ওকে পার্শী, পার্শী করিস্ নি।** পার্শী বললে ওকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। ও যে আমাদের আপনার লোক। He is our own man। এই সনাতন ধর্ম ওদের দেহেতে ফুটবে। একজনের হয়েছে ওতেই হবে।

* **যীশু বলছেন, Love thy neighbour (প্রতিবেশীকে ভালবাসো), সে কি রকম?** আমার প্রতিবেশী যদি এক অসৎ চরিত্র নেশাখোর হয়? তাই ঠাকুর বলছেন, গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গ খোঁজে; সাধু সাধুসঙ্গই চায়। চণ্ডীদাসই ঠিক বলেছেন, পিরীতি দেখিয়া পড়্শী করিবে, তা বিনু সকলই পর।

* **(ইউরোপ, আমেরিকাবাসীদের সম্বন্ধে) ওরা কি বল দেখি! ওদের দেহ এমনি যে সেই দেহ থেকে আত্মা নিঃসৃত হয় না।** গত দু হাজার বছরের ইতিহাস দেখ দেখি। এমন একজনও নেই যার ষোল আনা ঈশ্বরলাভ হয়েছে। আর ইতিহাস ঘাঁটতেই বা হবে কেন? ওপর ওপর দেখলেও বোঝা যায়। আমি বলি কি? ঈশ্বরলাভ মানেই ঈশ্বরে পরিবর্তিত হওয়া। যদি কারো ষোল আনা ঈশ্বরলাভ হয়ে থাকে তবে সে যেখানেই থাকুক আর যত লুকিয়েই থাকুক না কেন তার রূপ শুদ্ধ আধারে ফুটে উঠবে। ওদের মধ্যে কই একজনও তো নেই।

* **ওরে একটা মজার কথা শোন।** (লণ্ডনে) আমার এক room-

mate ছিল। সে এখন হাইকোর্টের জজ। সে বলতো, তুমি এখানে এসেছ Sanitation শিখতে? ওরা Sanitation কি শেখাবে? যারা কখনও জলশৌচ করে না, তারা Sanitation-এর জানে কি?

(জানুয়ারী ১৯৫৭, পৌষ-মাঘ, ১৩৬৩)

চতুর্থ প্রবাহ

* **ক্যালিফোর্ণিয়া, কি প্যারিসে, কি লণ্ডনে মন্দির হোল কি না এ ঠাকুরের শিক্ষা নয়। ঠাকুরের শিক্ষা কি?** ওই যে হনুমানের কথায় বলছেন, আমি বার তিথি নক্ষত্র ওসব কিছুই জানি না, আমি এক রাম চিন্তা করি।

কুবীর বলে, ভাব রে মন, ভাব গুরুর শ্রীচরণ।

এই হোল ঠাকুরের শিক্ষা।

* **কবীর বলেছেন, 'খোঁজেঙ্গে তো মিলেঙ্গে',** খুঁজলেই তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু না খুঁজলেও তো তাঁকে পাওয়া যায়। দেখ না এগার বছর বয়েসের সময় আনুড় গ্রামে যেতে যেতে ঠাকুরের জ্যোতি দর্শন হোল। ঠাকুর কি তখন ভগবানকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন?

* **বার্ণিশ করা কাল চটিজুতো পরা এমন পরমহংসের কথা তোরা কোথাও পেয়েছিস কি?** ঠাকুর নিজেই বলছেন সে কথা, মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর সঙ্গে কোন পরমহংসের মেলে কিনা? তিনি এসে সব কিছু পালটে দিয়ে গেছেন। পরমহংস সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও বদলে দিয়ে গেছেন। গৌরী পণ্ডিত এসে জিজ্ঞাসা করছেন, কই গো, পরমহংসবাবু কোথায়? তার মুখ দিয়ে একথা বার করিয়ে ঠাকুর জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে এবার থেকে বাবুর বেশে পরমহংস আসবেন।

* **ঠাকুর বলেছেন, স্বপন কি কম গা!** উল্টো দিক দিয়ে ধরলে এর মানে দাঁড়ায় যে স্বপ্নের অনুভূতিকে তিনি খুব উঁচু স্থান দিয়ে যাচ্ছেন। বেদান্তের সাধনে একটা অনুভূতি হচ্ছে যে জগৎ স্বপ্নবৎ! এই

আত্মিক স্বপ্ন যদি কেউ একটাও দেখে তবে তার বেদান্তের সাধন যা হবার তা আপনা থেকেই হয়ে যায়।

*** বেদ পুরাণে যা বলে গেছে 'কোর না অনাচার হবে' তন্ত্রে আবার তাকেই ভাল বলেছে।** এসবের মানে কি বল দেখি? অর্থাৎ ঠাকুর তিনটিকে উচ্ছেদ করছেন। তাই তিনি বলছেন— মা, তোমায় যখন পাই তখন বেদ পুরাণ তন্ত্র যেন এক পাশে পড়ে থাকে।

আদ্যাশক্তিই ব্রহ্ম— এই কথা বলে ঠাকুর সাংখ্যকে criticize করেছেন। সাংখ্যের মতে পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা। ঠাকুর বললেন, না আলাদা নয়। পুরুষ আর প্রকৃতি এক এবং অভেদ।

ঠাকুরের একটি বড় কথা হ'ল সচ্চিদানন্দই গুরু। শব্দগত অর্থ ধরলেও ওর এক সুন্দর মানে পাওয়া যায়। লঘু মানে হাল্কা, যা পড়ে যায়। Law of gravitation-এর against-এ যিনি আমাদের শরীরকে ধারণ করে রয়েছেন, যিনি ছেড়ে দিলে আমরা পড়ে যাই, অর্থাৎ মরে যাই, তিনিই গুরু। কে তিনি? ভগবান! তাই ঠাকুর বলেছেন, সচ্চিদানন্দই গুরু!

* আমার দিকে চেয়ে কী দেখছিস বল তো?

জনৈক ভদ্রলোক— **দেখছি আপনার Physical transformation হয়েছে। আপনাকে ঠিক ঠাকুরের মত দেখতে হয়েছে।**

হ্যাঁরে, ঠাকুরের সেই সব ভাব এসেছে, ভেতরে বাইরে। বয়স তো অনেক হোল, এখন ভাবছি, এখানেই শেষ হবে, না তেড়ে ফুঁড়ে বেরোবে। সেই যে আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম দুজন থাকবে না, একজন থাকবে — সে স্বপ্ন ফোটে কিনা কে জানে!

আমার জীবন আর ঠাকুরের জীবনে কত তফাৎ। ঠাকুরের কথাকে আমরা Gospel বলে মনে করি, স্বীকার করে নিই। কিন্তু আমার কথা তো কেউ নেবে না, তাই আমার কথা দেহেতে ফোটে। ঠাকুর নিজের কথায় বলেছেন, আমায় কঠোর সাধন করতে হয়েছিল, কিন্তু আমি জীবনে কখনও একটা ফুল দিয়ে ঠাকুরের পূজা করিনি। এমনকি কখনও একটা ভাল আসনে বসে ধ্যান করিনি। দেহের মধ্যে যিনি আছেন তিনি

যেন সব করিয়ে নেন। ঠাকুরের জীবনেও অবশ্য এর আভাস আছে। ঠাকুর বলছেন, মনে সাধ ছিল বিয়ে করব, শ্বশুরবাড়ী যাব, সাধ-আহ্লাদ করব। কোথা থেকে একটা ঝড় এসে সব ওলট-পালট করে দিলে।

*** ঠাকুর বলেছেন, হাবাতে কাঠ আপনি যো সো করে ভেসে যায়। আর বাহাদুরী কাঠ আরও দশজনকে পার করে নিয়ে যেতে পারে। কে বাহাদুরী কাঠ কী করে বুঝবি?** যে বহু লোককে পার করে অর্থাৎ বহু লোক যাকে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে পায় সেই বাহাদুরী কাঠ।

আর একটা কথা শুনে রাখ্— বাহাদুরী কাঠ জগতে প্রথম এখানেই হয়েছে।

*** কেউ অন্তরঙ্গ কি না ঠাকুর কী করে বুঝতেন?** তারা আসার আগেই তিনি তাদের নিজের ভিতরে দেখতে পেতেন। পরে তারা এলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, এরা তো আমার অন্তরঙ্গ। আর এখানে কি হয়? তোরা আমায় (স্বপ্নে) দেখে এসে বলিস তবে আমি বুঝি।

*** ঠাকুরের সময়ে যা হয়েছে এখানে তার সব বিপরীতভাব।** আমি তো কোথাও যাই না, এই ঘরটির মধ্যেই থাকি। কারো বাড়ি যাই না, কারো কিছু খাই না, কারো কাছ থেকে কিছু নিই না, কেন? হয়ত এমনও হতে পারে যে আমি যখন থাকবো না তখন তোদের এত দর্শন অনুভূতি সব উবে যাবে। যদি তোদের কাছ থেকে কিছু নিতুম তোরা ভাবতিস যে, আমাদের ঠকিয়ে গেছে। কিন্তু তোদের কাছ থেকে কিছুই নিই নি বলে সে কথা কি মনে হবে?

*** একজন আগুন করে আর দশজন পোহায় (কথামৃত)।**

এ কী আগুন রে বাবা! কাঠে যেমন আগুন জ্বলে এও ঠিক তাই। দেহেতেও ঠিক সেইভাবে আগুন জ্বলে। সেই উত্তাপ আর সকলে পায়। যারা কাছে আসে তারাই কি শুধু পায়? না, সেই আগুন সর্বব্যাপী হয়ে আছে, যেখানে আধার পায় সেখানেই ফোটে।

*** আমি নীতিকথা কখনও বলি না।** নীতি কখনও টেকে

না। তিনি তো রয়েছেন তোর ভেতরে। যদি দরকার হয় তিনিই সব করিয়ে নেবেন।

* **আমার অমুক দর্শন হয়েছে, আমার তমুক দর্শন হয়েছে— কী হবে ওসব কথা শুনে। ওরে, আবার নামতে কতক্ষণ!** সারাজীবন ভগবান, ভগবান করে কাটানোই হচ্ছে বড় কথা।

* **সৎপথে থেকে খেটে খাবি আর ভগবান, ভগবান করবি।** কতদিন বল দেখি? যতদিন ইচ্ছা হয় বা যতদিন পারবি? ওরে নারে বাবা, না। জীবন ভোর, সারা জীবন শুধু ভগবান, ভগবান করে যাওয়াও বড় শক্তরে বাবা, বড় শক্ত।

* **ওরে, ভগবান আমাদের যে অবস্থায় রেখেছেন তাতে কি সাধন ভজন হয়?** তবে রেখেছেন কেন? কৃপা করবেন বলে, তা না হলে কৃপা কি জিনিস আমরা বুঝবো কেমন করে?

* **ভবরোগের শ্রেষ্ঠ বৈদ্য যে তোর ভেতর,** তাঁকে ডাক, যা করবার তিনিই সব করে দেবেন।

* বার বছর চার মাস যদি কেউ ভগবান, ভগবান করে যেতে পারে তবে তার দেহে যতটুকু হওয়ার আপনা থেকে হয়।

* **আমরা এই জগতকে ভালবাসি কেন?** সব কিছুর মধ্যেই রয়েছেন ভগবান। তিনি যে প্রিয়। তাই জগৎও আমাদের কাছে এত প্রিয়। আবার আর এক দিক দিয়ে দেখ্। মরা মানুষকে বলে ছুঁতে নেই। কেন? ভগবান যে তার দেহ ছেড়ে চলে গেছেন তাই।

* **ওই যে গানটা পড়া হল— 'মুখে অট্ট অট্ট হাসি'— অট্টহাসি কেন?** ওরে, চারিদিকে আনন্দ পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে যে, আনন্দের অবিরাম ঢেউ চলেছে। প্রশ্ন উঠবে, কেন? হারুর মায়ের হারু মরে গেছে, সে যে কাঁদছে। সে কাঁদছে, সেও সেই আনন্দ পাবার জন্যে, কেঁদেই যে তার আনন্দ। ঠাকুরও বলছেন, তিনি আনন্দে সৃজন করেন, আনন্দে পালন করেন, আবার নিধন তাও আনন্দে করেন।

* **আত্মা সাক্ষাৎকারের আগে শরীরে দেবভাব হয়।** সে সময় খাবার দেখলেই খাওয়া হয়ে যায়, খাওয়ার আর প্রয়োজন হয় না। আমি তখন Young man খুব Robust health, তবু খাবার দরকার হোত না, খাবার দেখলেই খাওয়া হয়ে যেত। এ ভাবটা অবশ্য বেশি দিন থাকে না, অবস্থা বদলে যায়। লোকে ভুল করে ভাবে যে এই দেবভাব বুঝি eternal, কিন্তু তা নয়।

* **শুদ্ধ আধার হলে গ্রহণের সময় দেহে এক রকম ভাব হয়, দেহ যেন ফুটতে থাকে।** একবার অর্দ্ধোদয় যোগের সময় আমার কেমন ভাব হয়েছিল। আমি ছট্‌ফট্ করছিলুম, দেখছি চারদিকে কেমন সব ছায়ামূর্তি। আর একবার অর্দ্ধোদয় যোগের সময় দেখেছিলুম— মাথার পর্দা গুড়িয়ে গেল, আর বাক্সের ডালা খুলে গেল। এবার সূর্য গ্রহণের সময় দেখিসনি— যতক্ষণ গ্রহণ ছিল ততক্ষণ ধ্যান করছিলুম। কে যেন চোখ বুজিয়ে দিলে, কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে দেবে না।

* **সাধনের এক এক অবস্থা শেষ হয় আর ব'লে ব'লে যায় কৃপাসিন্ধ-কৃপাসিন্ধ!** সে সব অতি অদ্ভুত দর্শন। আমি ওসব গ্রাহ্যও করতুম না। কৃপাসিন্ধ— ও আবার কি। অনেকদিন পরে বুঝেছিলুম যে ওরে, কৃপা মানে তো আপনা থেকে হওয়া। নারকেল গাছে যেমন ডাব হয়, আমগাছে যেমন আম হয়, এই দেহবৃক্ষে আত্মা যদি আপনা থেকে ফুটে ওঠে তবে হয়। তা না হলে কোন উপায় নেই।

* **নিত্য থেকে লীলা, আর লীলা থেকে নিত্য, এ কথা শুনে শুনে তো কান পচে গেছে। বল দেখি এই নিত্যলীলা মানে কী?** নিত্য মানে ব্রাহ্মীস্থিতি অবস্থায় থাকা। তোরা যে বহুলোক আমায় (স্বপ্নে) দেখছিস, সেই আমি আসছে কোথা থেকে? নিত্য থেকে। আর লীলা কী? ওই যে দেহেতে ফুটে উঠছি — ওই হচ্ছে লীলা। তোদের একজনের স্বপ্নের সঙ্গে আর একজনের স্বপ্নের মিল নেই, তার মানে হচ্ছে যে বিচিত্রভাবে সেই লীলা চলেছে। এই হচ্ছে নিত্য থেকে লীলা।

* **ওতঃপ্রোত কথাটা তো অনেকদিন ধরে শুনে আসছিস, মানে কি বল দেখি?** আজ দুপুরে হঠাৎ মনে হল— আরে, যে ভাবে চলে এসেছে এ কথার মানে তো তা নয়। ওতঃপ্রোত মানে ভিতরে বাইরে। যদি এখন কেউ বুদ্ধ বা চৈতন্যকে দেখে, সে ওতঃপ্রোত হোল না; সে যে কেবল তার ভেতরে দেখছে। এই যে তোরা এখানে আমায় বাইরেও দেখছিস, আবার ভেতরেও দেখিস, ওই হল ঠিক ওতঃপ্রোত— ভেতরে আবার বাইরে।

পঞ্চম প্রবাহ

(আলোচনাকাল— তেশরা মার্চ, রবিবার হইতে
তেশরা এপ্রিল, ১৯৫৭ পর্যন্ত)

* **আমি তোদেরকে প্রণাম করি বাবা! তোরা আমায় আশীর্বাদ কর— যেন ঠাকুর, ঠাকুর বলে যেতে পারি।** আমি সব সময় বেতস পাতার মত কাঁপতে থাকি। মহামায়ার রাজ্য, কখন কোন পাকে ফেলে দেয় কে জানে, তাইতো কথায় বলে, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।

সব সময় হাত দুটি জোড় করে বলবি, ঠাকুর! শরণাগত, শরণাগত!

এখানে নতুন লোক এলে আমি বলি, ভগবান তোর ভেতরে, বাবা। সাধারণভাবে দেখা যায়, যে তার পরেই তার সচ্চিদানন্দ গুরু লাভ হয়। গুরু কি করেন? না, সেথো, হাত ধরে ভগবানের কাছে নিয়ে যান, অর্থাৎ তার দেহে আপনা হতে সাধনভজন হয়। সেকথা ছেড়ে দিলেও ওই সচ্চিদানন্দ গুরুলাভ মানেই তার ভগবান লাভ হ'ল।

মুখের ওই একটু কথাতেই তার যতটুকুন হবার হয়।

* **এখানে একদিনও যে এসেছে তার কিছু না কিছু অনুভূতি হয়েছে।** হয়ত এখানে আসার ছ'মাস পরে হয়েছে, কিন্তু চোট্ না খেয়ে কেউ যেতে পারে নি, ওরে, এখানে যা হয়ে গেল তা তোরা কেউ বুঝতে পারিস নি। তোরা যদি ঠিকভাবে থাকতে পারিস তবে দেখবি

কি জিনিষ হয়। তোদের শুদ্ধ দেহ হয়েছে? ও তো এতটুকু। ঠাকুর কৃপা করে তোদের বুঝতে দেন নি, তাই। পরে বুঝবি।

* কবিরাজ রামবাবু অনেকদিন পরে শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে এসেছেন। সংসারের নানা রকম ঝামেলা থাকায় এতদিন তিনি আসতে পারেন নি, সব শুনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন—

সংসারের ঝামেলা তো থাকবেই। একজন সমুদ্রে নাইতে গেছে। ভাবছে যে, ঢেউ থেমে গেলে সে নাইতে নামবে। কিন্তু একটার পর একটা আসছে, ঢেউ আর থামে না। তার নাওয়াও আর হোল না। ঢেউ তো থাকবেই বাবা। যেমন করে হোক নেয়ে নিতে হয়। কালীঘাটে গিয়ে আগে কালী দর্শন, দান-ধ্যান তার পরে।

* **সংসার তো ধাক্কাই দেবে।** শান্তি দেবার একমাত্র মালিক ভগবান। তাই যখনই পারবি কেবল ভগবান, ভগবান করবি।

* **কেউ কারও ভাল করতে পারে না। কেউ কারও মন্দও করতে পারে না।** মানুষের ভেতরে রয়েছেন ভগবান। যার যা করার, তিনি তার ভেতরে থেকে তাই করেন।

* **ঈশ্বর লাভের শক্তি কী?** ঈশ্বর দেহেতে স্ফুরিত হবেন, সেই তেজ ধারণের শক্তি।

ঈশ্বর কি রকম তা তোরা কেউ বলতে পারিস? কালী বল, দুর্গা বল, শিব বল— সব তো মানুষেরই কল্পিত এক একটি রূপ। তবে সেও ঈশ্বর, কেননা কল্পনাও যে তিনি। ঈশ্বর ছাড়া তো কিছু নেই।

ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলেছেন গাছের পাতাটি নড়ে সেও ঈশ্বরের ইচ্ছা। কেন? তিনি যে সমস্ত বিশ্বে ওতঃপ্রোত হয়ে আছেন। গাছের পাতাটি নড়ছে না, তিনিই নড়ছেন।

* **আত্মপ্রবঞ্চনা করেই তো মানুষ বেঁচে থাকে।** আত্মপ্রবঞ্চনা কেন? সে ভাবে সে আত্মা নয়, সে দেহ।

* **গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল। একের দয়া বিনা জীব ছারে খারে গেল। এই ‘এক’টি কী?** এ পর্যন্ত সকলেই বলেছে যে ওই ‘এক’টি হল মন। আমি বলি দূর্, মন কি রে? দেহ! ঠাকুরও সেই কথা বলে গেছেন, আত্মা যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন তবে মুক্তি। তাই আমি আগে আগে বলতাম যে— দেখ, দেহের পুজো আগে করা উচিত।

এসব জিনিষ হতে গেলে ভগবানের কৃপা তো চাই-ই, আর চাই সুগঠিত দেহ আর সংস্কারহীন মন। যীশু বলে কেউ ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর জীবনী যেভাবে লেখা হয়েছে তাতে দেখতে পাই যে তাঁর বার জন শিষ্য ছিল। তারা খুব বলিষ্ঠ ছিল, আর তারা সকলে ছিল নিরক্ষর। কেউ জেলে, কেউ ছুতোর, এই রকম।

* **সারপ্লাস বডির কথা জানিস তোরা?** এমন দেহ থাকে যার যোল আনা ছেড়ে বত্রিশ আনা হয়। যোল আনা দিয়ে সে নিজের জিনিষটি বজায় রাখে, আর যোল আনা সে অপরকে দান করে।

* **ওই যে রহস্যময়ী মায়ার কথা আমি লিখেছি (ধর্ম ও অনুভূতি, ১ম ভাগ) ও নাচে কেন বলত?** ওই নাচটি কি? দেহের গতি এবং জগতের গতি বোঝাবার জন্যেই ওই নাচ। ওই নাচের সঙ্গে একটা শব্দ হয়। ওই হচ্ছে অনাহত শব্দ— যা পৃথিবীর গতি থেকে ওঠে।

* **শুদ্ধমন হলে জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়**— কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটি পড়া হলে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলে উঠলেন— ওরে থাম, থাম। ভারী অদ্ভুত তো! শুদ্ধ মন হওয়ার কথা চল্লিশ বছর পরে আজ আমি বুঝতে পারলুম। দেখ, চব্বিশ বছর বয়সের সময় আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছিল। একটার পর একটা অনুভূতি হয়ে যায়! ভেবেছিলাম যে ও বুঝি আর একটা! আজ এই এখন বুঝছি যে আরে, তা তো নয়। চব্বিশ বছর বয়সের সময়েই শুদ্ধ মন হয়েছিল। তাই জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছিল। দেখেছিস, অনুভূতি হয়ে যাবার কত দীর্ঘ দিন পরে তার অর্থ বুঝতে পারা যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, ঠাকুর ওই কথা বললেন সেটা কি ওঁর নিজের Personal experience থেকে বললেন, না some other agency spoke through him? এ প্রশ্নের ভিত কোথায় পাচ্ছি? ওই যে ঠাকুর প্রায়ই বলতেন— মা আমার কথার রাশ ঠেলে দেন। যেন তাঁর মুখ দিয়ে আর কেউ বলাচ্ছেন। যদি Personal experience থেকেই হত তবে ধরতে পারি নি কেন? কেন অনুভূতি হয়ে যাবার চল্লিশ বছর পরে আজ বুঝতে পারলুম যে শুদ্ধ মন হয়েছিল বলে জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছিল।

* **চৈতন্য সাক্ষাৎকারের পর সমস্ত সংস্কার পুড়ে যায়, ‘আমি’ জ্বলে যায়।** আমার আমি বলতে যা কিছু সব চলে যায়। তখন তার মনে হতে থাকে ‘আমি না’। চৈতন্য সাক্ষাৎকারের পর থেকে সব ‘তুমি’। ঠাকুর বলেছেন, অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ। আগে অদ্বৈত, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান, তারপর চৈতন্য সাক্ষাৎকার, তারপরে নিত্যানন্দ অবস্থা। এ আনন্দ নিত্য কেন? এ আনন্দের আর বিচ্ছেদ নেই। আগমে দর্শনের সময়েও আনন্দ হয় কিন্তু সে আনন্দ সাময়িক। এই নিত্যানন্দ অবস্থাকে পরমহংস অবস্থা বলে।

চৈতন্য সাক্ষাৎকারের সময় যে আলো দপ্ করে জ্বলে ওঠে তার রং লাল কেন? সব রজোগুণ নাশ করে বলে সেই আলো লাল দেখায়।

* **জপসিদ্ধ হলে ধ্যানসিদ্ধ হয় কি না, এ সব জেনে কী হবে?** এ কি অঙ্ক? ওরে ভগবানকে সারা জীবন ডাকা তো দূরের কথা, ভক্তিটুকু বজায় রাখাও খুব শক্ত।

* **জ্ঞানভক্তি লাভ হলো, কি হলো না, মা আমায় কোথায় রাখলেন— এসব জেনে কী হবে?** মনুষ্য জন্ম পেয়েছিস— ভগবান, ভগবান করে যা। ভগবান ছাড়া আর যা কিছু ভাববি তাই তোর সহস্রারে আঘাত করবে। বউ হোল, সে একটু জায়গা নিলে। ছেলেমেয়ে হোল, তারা একটু জায়গা নিলে। পরে নাতি নাতনি হোল, তারাও আবার খানিকটা জায়গা নিলে। এমনি করে সহস্রারটাই বিষয় চিন্তায় ভরে যায়, তখন ভগবানকে রাখবি কোথায়? আর ও এমনি জিনিষ যে যতটুকু ভোগ ততটুকু যোগ কমে যায়। তাই বলছি— ভগবান, ভগবান কর রে, ভগবান, ভগবান কর।

✻ মানুষের দেহটাই হচ্ছে একটা complete unit, কোন জিনিষের জন্য তাকে পরের দিকে চেয়ে থাকতে হবে না। মানুষের সাধারণ জীবনের কথাই ভাব না। যে আর্টিস্ট হবে ছেলেবেলা থেকেই তার আঁকার দিকে ঝোঁক থাকে। যে চোর হবে তার মন থাকে চুরির দিকে।তাই ঠাকুর বলছেন,— তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে। আবার ঠাকুরের ওই যে কথা— মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন, সেও ওই complete unit বলে। এ কথা বোঝা ভারী শক্ত।

✻ ঠাকুর বলেছেন, 'আমাকে কঠোর সাধন করতে হয়েছিল, নিত্যসিদ্ধের সাধন করতে হয় না।' তিনি নিত্যসিদ্ধ ছিলেন না, একথা তিনি নিজেই বলে যাচ্ছেন। তাহলে প্রশ্ন উঠছে যে তিনি যদি নিত্যসিদ্ধ না হন, তাহলে তিনি জানলেন কেমন করে যে নিত্যসিদ্ধের সাধন করতে হয় না? এই রকম বহু কথা ঠাকুরের আছে যা শুনে মনে হয় যে অপর কেউ তাঁর ভেতর থেকে কথা কইত। Some other agency spoke through him. আমারও একবার এইরকম অবস্থা হয়েছিল, তখন আমার বয়স বাইশ বছর। কে যেন আমাকে চেপে রেখে উপরে উঠে কথা কইত। সে কী কথা কইত আমার সেই চাপা অবস্থায় আমি শুনতে পেতুম।

যত বড় intelligent লোকই হোক না কেন, এসব কথা ধরতে পারবে না। সব পড়েই যাবে— এতটুকু ধরতে পারবে না। কী করে পারবে— একটা খুঁটো তো চাই! তোরা খুঁটো পেয়েছিস কোথায়? সচ্চিদানন্দগুরু তোদের দেহ ফুঁড়ে উদয় হয়েছে তাই তোরা এসব কথা বুঝতে পারিস। দেখ্ না, ঠাকুর বললেন, মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না, সচ্চিদানন্দই গুরু। অথচ surface reading-এ দেখছি ঠাকুর নিজে যাকে পাচ্ছেন তাকেই গুরু করছেন। কেনারাম ভট্টাচার্য্যি তাঁর গুরু, পুরী মহারাজ তাঁর গুরু, ব্রাহ্মণী তাঁর গুরু, গোবিন্দ রায় তাঁর গুরু— আরও কত কে। ঠাকুর আমার মুখ দিয়ে বার করবেন বলেই বুঝি বলে গিয়েছিলেন— মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। সব তাঁর দেহ থেকে বেরিয়েছিল। **পুরী মহারাজ তাঁর দেহ থেকে বেরিয়েছিল, ব্রাহ্মণী তাঁর দেহ থেকে বেরিয়েছিল— এই রকম প্রায় সবাই।** ঠাকুরও তার

reference রেখে যাচ্ছেন। বলছেন, দেহ থেকে সচ্চিদানন্দ বেরোল, বললে, 'আমি যুগে যুগে অবতার।' পাছে লোকে মনে করে যে, ঠাকুর তাঁর নিজের কথাই বলে যাচ্ছেন তাই তিনি বলছেন, 'সে আবার বললে, চৈতন্যও শক্তির আরাধনা করেছিল।'

(শ্রীজীবনকৃষ্ণ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবনের এই অশ্রুতপূর্ব রহস্য উদঘাটন করছিলেন, তখন ঘরে যারা নিয়মিত আসেন, তাদের মধ্যে অনেকে এসে পৌঁছান নি। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাই আক্ষেপ করে বললেন— আহা এরা এ সব কথা শুনতে পেল না। এযে কী কথা হয়ে গেল তা কী বলব।) (৩১.৩.১৯৫৭, রবিবার, বেলা প্রায় ৩টা)

ষষ্ঠ প্রবাহ

✻ ঈশ্বরের স্বরূপ কী? প্রথমতঃ বলা যায় যে যা কিছু আমরা দেখছি তাই হচ্ছে ঈশ্বরের স্বরূপ। অবশ্য এ হচ্ছে পুরানো মামুলি ব্যাখ্যা। আর এক ব্যাখ্যা আছে ব্যষ্টিতে। মানুষ নিজেই ঈশ্বরের স্বরূপ। তার ভাল মন্দ বিদ্যা অবিদ্যা সব কিছু নিয়েই সে হচ্ছে ঈশ্বরের স্বরূপ। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু!

✻ ঠাকুর বলেছেন, ব্রহ্ম কী তা মুখে বলা যায় না। আবার আছে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', কোনটা সত্য? দুই-ই সত্য। 'ব্রহ্ম কি তা মুখে বলা যায় না'— এ হচ্ছে নির্গুণের অনুভূতি। আবার সগুণে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। যার অনুভূতি হয়েছে সে দেখে দুই-ই সত্য, সগুণ নির্গুণ ওতঃপ্রোত। এই কথাই ঠাকুর অপর জায়গায় বলেছেন— ছাদে উঠে দেখে, যে জিনিষে ছাদ তৈরী ইঁট চুণ সুরকী, সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈরী।

✻ গানে আছে— সদানন্দে সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়। শ্যামা কোথায়? দেহে। শ্যামা যদি ফিরে চায়, অর্থাৎ বর্হিমুখী মন যদি অর্ন্তমুখী হয়ে ষষ্ঠভূমি থেকে সহস্রারে যায় তবে সে আনন্দসাগরে ভাসে।

✻ তিনি যে আপনার মা, আপনার বাপ (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)।

আপনার মা কি না নিজের দেহ, আর আপনার বাপ অর্থাৎ আত্মা। মহাকালী আর মহাকাল। কিন্তু মহাকালী আর মহাকাল বললে আরও Vague (অস্পষ্ট) হয়ে যায়, লোকে বুঝতে পারে না। তাই আরও ভাল করে বলা উচিত দেহ আর আত্মা।

* **প্রেম রজ্জু স্বরূপ। প্রেম হলে ভগবানকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায় (কথামৃত)**। ঠাকুর যে ওই কথা বললেন, ওর মানে কে বুঝবে? দড়ি দিয়ে টান্‌লে যেমন আসে। তেমনি ভগবানকে দেখার ইচ্ছা সহস্রারে ফোটে। এর action হয় উল্টো দিক থেকে। সহস্রার টানে, আর মূলাধার থেকে কুণ্ডলিনী উঠতে থাকে (কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দড়ির টান শুরু হয়ে গেল জীবনকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে। তাঁর বরতনু আলোড়িত করে মহাবায়ু উর্দ্ধমুখী হল, তিনি সমাধিস্থ হলেন। সমাধিভঙ্গের পর—)

তোরা দেখলি তাই বুঝলি (প্রেম রজ্জু স্বরূপ) এর মানে কি। অপর লোকে কি বুঝবে?

ঠাকুর এখানে Kindergarten System চালাচ্ছেন। সন্দেশ কি তা বুঝিয়ে দিলে হয় না, সন্দেশ খাইয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। এমন কি সন্দেশ কি করে হয় তাও দেখিয়ে দিচ্ছেন।

* **ঠাকুর বললেন, একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়েছিল। এক দানা চিনি খেয়ে সে আইঢাই হয়ে গেল। বাসায় ফিরে সে ভাবলে এবার চিনির পাহাড়টা সঙ্গে নিয়ে আসব**। ঠাকুরের উপমা তো শুনলি। এবার এর যৌগিক ব্যাখ্যা কর। চিনির পাহাড় হচ্ছে সহস্রার, পিঁপড়ে হচ্ছে মহাবায়ু। চিনির একটি দানা হচ্ছে সহস্রারের একটি Cell (কোষ)। বাসায় ফিরে অর্থাৎ নিগমে নেমে অবতার হওয়া।

* **ঝিনুক স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্যে হাঁ করে থাকে**। স্বাতী নক্ষত্রের জল যখন পড়ল তখন সে গোপনে গভীর জলের মধ্যে চলে যায় যতদিন না তার মধ্যে মুক্তো হয়, এই দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর বলছেন যে যত গোপনে নির্জনে সাধন ভজন করা যায় ততই ভাল। লোক জানাজানি না করে, যে যত সাধন ভজন করবে সে ততই এগুবে।

আত্মগুপ্তিই হল সাধুর প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ। তাই তো ঠাকুর অমন মোজা, ধুতি, বনাতের কোট, কমফর্টার, কানঢাকা টুপি ইত্যাদি পরে দেখিয়ে গেছেন।

* **Swamiji had great success in America.** শিকাগো লেকচারে তাঁর যা success হয়েছিল এ রকম খুব কমই দেখা যায়। তা যদি না হত তবে স্বামীজী ঠাকুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন। ঠাকুরও এ কথা বলে গেছেন। 'বড় মাছ জোর ধরেছে, সুতো ছেড়ে দিতে হয়, তা না হলে আমাকেই জলে ফেলে দেবে।' এ কথার support কোথায় পাচ্ছি? ওই যে স্বামীজী মাস্টারমশাইকে বলছেন, মাস্টারমশাই, এত তিনি বললেন, কই আমার কি হলো? খালি, কি হলো আর কি হলো! কামনা বাসনা নিয়েই সব বিচার, একটা কিছু হওয়া চাই। তাই বলছি, আমেরিকায় লেকচারে স্বামীজী অত successful না হলে ঠাকুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন।

* **স্বামীজী ঠাকুরের মধ্যে অতীতের জিনিসটাই বুঝেছিলেন**। He recognised the classical man in Thakur. কিন্তু ঠাকুর যে ভবিষ্যতের কথা বলে যাচ্ছেন স্বামীজী তা ধরতে পারেন নি। কেশব সেন কিন্তু ঠিক বুঝেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ওরে, এ যে এক নতুন জিনিষ। ঠাকুর জুতো, মোজা, কাপড় পরেন। গায়ে বনাতের জামা, পায়ে চটিজুতো। বিছানায় শোন, মাছ পান খান। সঙ্গে আছে মা, বৌ, ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নে। এ যে এক নূতন পরমহংস। কেশব সেন বুঝেছিলেন যে ধর্ম্মজগতে ঠাকুর নতুন জিনিষ দান করতে এসেছেন। তাই তিনি নিজের দলের নাম দিয়েছিলেন— নববিধান— new dispensation.

* **কেশব সেন যে ঠাকুরকে মানতেন এটা সত্যিই বড় আশ্চর্য ঠেকে**। কেশব সেন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, আর ঠাকুর কালীপূজা করেন, দেবদেবী মানেন। অথচ first appreciation of Thakur came from the oppositionist। কেশব সেন লিখেছিলেন, এঁর মতন এমন মহানপুরুষ এক্ষণে পৃথিবীতে কোথাও নাই। দয়ানন্দ সরস্বতীও অবশ্য

বলেছিলেন, ইনি দুধের মাখনটুকু খেয়েছেন। কিন্তু তিনি বুঝলেনই যদি, ঠাকুরের সঙ্গ করলেন না কেন? কেশব সেন কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গ করেছিলেন। আর শুধু তাই নয়, কমল কুটীরে নিয়ে গিয়ে তার নিজের ঘরে ঠাকুরকে কত সেবা যত্ন করতেন।

* শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া উপমা পড়া হচ্ছিল— **কতকগুলি কানা একটা হাতির কাছে এসেছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করায় তারা হাতির গা স্পর্শ করে কেউ বললে হাতি একটা কুলোর মত, কেউ বললে হাতি একটা থামের মত ইত্যাদি**। এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন—

হ্যাঁ রে, কানা কাকে বলে? কে কানা বলত। একটি চোখ যার নেই তাকেই কানা বলে, কেমন না? তা হলে একটি চোখ দিয়েই তো গোটা হাতিটাকে দেখতে পারে। একটি চোখ অন্ধ, অর্থাৎ যার জ্ঞানচক্ষু খোলেনি। জ্ঞানচক্ষু খুলে গেলে মন ষষ্ঠভূমি থেকে সহস্রারে যায়। তাই যাদের জ্ঞানচক্ষু খোলে না অথচ ষষ্ঠভূমিতে ইষ্ট সাক্ষাৎকার হয়ে উন্মনা সমাধি পর্যন্ত হচ্ছে তারাই কানা। ওই জ্ঞাননেত্র না খোলার জন্য ষষ্ঠভূমিতে যে কালী বা শিব বা গোপাল মূর্তি দেখছে তাকেই সংস্কার বশতঃ ভগবান বলছে। কিন্তু ওই কালী বা শিব বা গোপাল মূর্তি যে ভগবান তা কে বলল? কানা যেমন হাতিকে দেখে কুলোর মত, বা থামের মত বলছে, যাদের জ্ঞানচক্ষু খোলেনি ভগবান সম্বন্ধে তাদের ধারণাও ঠিক ওই রকম।

* **মেয়েরা সাধনভজনের দিকে যত এগুক না, একটি সন্তান হলেই তার সব নষ্ট হয়ে যায়। তখন আবার গোড়া থেকে শুরু**। আবার যদি ছেলে হয় ত'আবার সেই। যদি কারো ছেলেপুলে না হয়? সেখানেও উল্‌টো দিক দিয়ে কাটছে— the curse of a barren woman— যীশু বলেছেন। আর যদি কুমারী হয়? সেখানে উদাহরণ হচ্ছে, গোপালের মা। আট ন'বছর বয়সে বিধবা হলেন, তাকে কুমারীই ধরতে হবে। তারপর থেকে দেখছি, কারো হাতের রান্না খায় না, সৈন্ধক নুনটি জলে ধুয়ে নেয়। গঙ্গার ধারে কুটীরে বাস, আর সব সময়েই নাম জপ। তবু ঠাকুরের কাছে আসার আগে পর্যন্ত তার বিশেষ কিছু হয়নি।

তারপর ঠাকুরের কাছে এলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি ঠাকুরের কাছে আসছেন— গোপাল কোলে। সেখানেও দেখছি— fulfilment of the desired object— গোপাল পাওয়া! একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন গোপাল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, মাই খাচ্ছে ইত্যাদি। সেই ষষ্ঠভূমিতে ইষ্ট সাক্ষাৎকার।

তারপর, তাঁর কতদূর হয়েছিল তারও রেফারেন্স রয়েছে কথামৃতে। ঠাকুর বলরাম বাবুর বাড়ীতে এসেছেন রথের দিনে। গোপালের মাকে আনতে বললেন। বলরামবাবু গাড়ী পাঠিয়ে গোপালের মাকে আনালেন। ঠাকুর তখন গোপালভাবে রয়েছেন। পরে ভাবটাব তো কমলো। গোপালের মা বাড়ীর ভেতরে যাচ্ছেন। বারান্দায় নরেনকে (স্বামীজীকে) দেখে জিজ্ঞাসা করছেন, হ্যাঁ বাবা, আমার কি সব হয়েছে, না বাকি আছে? এ প্রশ্ন কেন? ঠাকুরের সেই কথা— আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সব সংশয় যায় না। হ্যাঁ, আবার এমনও আছে যারা জন্ম থেকেই সাধিকা, তাদেরও ওই পর্যন্তই, তার বেশী নয়। তাই ওই সাধিকাই হোক আর যাই হোক— দূর থেকে প্রণাম। ব্যাস্।

পুরাণকারের কথাই ধর না। তার তো অত latitude, longitude। মৎস্য অবতার, কূর্ম অবতার, বরাহ অবতার— অবতারের ছড়াছড়ি। কিন্তু বাবা একটি মেয়েছেলে অবতার তো করেন নি। (সকলের উচ্চহাস্য)

* **ঠাকুর বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের পর মেয়েছেলেকে আর মেয়েছেলে বলে বোধ হয় না**। তখন দেখে যে মেয়েরা মা আনন্দময়ীর এক একটি রূপ। বেশ কথা! কিন্তু তখনও তাদের মা বলে দেখছেন, তারা যে মেয়েছেলে এ বোধ তো রয়েছে। ঠাকুর মেয়েদের মা বলে দেখছেন, কিন্তু মা যদি সন্তানের দেহ স্পর্শ করে তবে সন্তানের দেহ সিঙি মাছের কাঁটা ফোঁটার মত ঝন্‌ঝন্ কন্‌কন্ করে উঠত কেন? তাহলে মেয়েদের মা আনন্দময়ীর রূপ বলে মনে হোত সেটা কি রকম্? আমি তোদেরকে বলেছি আমার এখন সে ভেদ বোধ নেই। মেয়েছেলে বেটাছেলে নেই। আমি দেখছি আমিই সব হয়েছি। এতদিনে আমার সেই দর্শনের fulfilment (পূর্ণতা) বুঝতে পারলুম। সেই যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখেছিলুম— আমি আধখানা

বেটাছেলে আধখানা মেয়েছেলে হয়ে গেছি— আজ তার fulfilment বুঝতে পারছি।

ঠাকুর বললেন বটে ঈশ্বর দর্শনের পর মেয়েদের দেখবে মা আনন্দময়ীর এক একটি রূপ বলে, কিন্তু সেখানেও সেই আনন্দময়ী, মেয়েছেলে। সেই ছোট করে দেখা! আর আমি বলছি যে এখন দেখছি কোন ভেদাভেদ তো নেই, সব এক! গত নভেম্বর মাসে দৈববাণী হয়েছিল— পাশ্চাত্য বসে বসে কাঁদছে। সেখানে গিয়ে দয়া করে তাদের উদ্ধার করুন। তখন বলেছিলুম— ওখানে যাব না। ওখানে স্ত্রী স্বাধীনতা বেশী। ওদের সঙ্গে থাকলে যা কিছু হয়েছে সব উবে যেতে পারে। আর সেদিন সকালে বঙ্কিমবাবুকে বলেছিলুম— দেখুন, এখন আমি বিলেতে যেতে পারি। এখন বুঝেছি যে আরে, সবই যে আমি। আমার যেতে বাধা কী? বাড়ির মেয়েরা আমাকে এই শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছেন যে they are I and I am they! মেয়েছেলে বলে জগৎ এতদিন তাদেরকে ছোট করে এসেছে। Equality of rights নয়, male or female নয়, ধর্মজগতে eradication of sexes! সব এক!

বুঝেছিস আমি কী বলছি? তোদের হিন্দুরা মেয়েদের নারায়ণ পুজো করতে দেয় না। কেন? না, তাদের বিশ্বরূপের ধারণা হয় না। এখন কেউ তর্কের খাতিরে বলতে পারে, মশাই, তখন আর্যেরা অনেক অনার্যকুলোদ্ভব মেয়েকে বিয়ে করেছিল, তাই এই বিধিনিষেধ। বেশ, ছেড়ে দে তোদের হিন্দুদের কথা। রোমানরা তো অপর সকলকে বলত barbarians (বর্বর)। সেখানেও তো সেই একই জিনিস। বুদ্ধ কাকে বিয়ে করেছিল জানিস? যশোধরা ছিল তার মাসতুতো বোন। Purity of Blood (রক্তের বিশুদ্ধতা) বজায় রাখার জন্য তখন এই রকম করতো। তাদের বেলাতেও তো দেখি সেই একই জিনিস। সেই মেয়েদের ছোট করে দেখা আর দূরে সরিয়ে দেওয়া!

* **ওরে বসে কথামৃত শোন। দেহটা শীতল হবে।** কেন দেহ শীতল হবে? কুণ্ডলিনী ক্রিয়াশীল হবে, মন মূলাধার ছেড়ে উঠে আসবে আর দেহ শীতল হবে। তাই ঠাকুর কেশব সেনকে বলেছেন, তুমি

মেয়েদের মধ্যে অত থেকো না। ভাগবত কথায় দিন কাটাবে, তা হলে আরও ভাল থাকবে।

* **বুদ্ধদেবের খুব দয়া ছিল।** হাসপাতাল, ডিসপেনসারী করা নয়। মানুষকে জরা ব্যাধি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা— এই হল তাঁর দয়া। এই ভাবেই অন্তত তাঁর জীবনী depict (বর্ণনা) করা হয়েছে। কিন্তু কী জিনিষ দিয়ে মানুষকে দয়া করতে হয় বাবা? মানুষের যে শাশ্বত জিনিষটির অভাব সেটি দান করাই হল প্রকৃত দয়া করা।

আর **সাধুর সেবা কী করে করতে হয়?** এক সের রাবড়ি এনে তাকে খাওয়ান? না রে বাবা, না। হরিকথা শোনানই হচ্ছে সাধুর সেবা করা। আর নাম সংকীর্তন? খালি খোল পিটে কি কিছু হয়? আজ পাঁচশো বছর ধরে আমাদের দেশে খুব খোল পেটা হয়েছে; তাতে হল কি? নাম সংকীর্তনই বা কি? এই যে এখানে বসে খালি ভগবান ভগবান করছিস— এই হ'ল নাম সংকীর্তন।

অবশ্য এ সব হচ্ছে বিবিদিষার পথ। এ ছাড়া আর এক রকম আছে। সেটি হল তাঁর কৃপা— যা আপনা থেকে দেহেতে ফোটে।

* **ঠাকুর বলছেন, তিন পুরুষে আমির জানলে তবে তো লোকে মানবে।** তিন পুরুষে আমির কি রকম? বলরামবাবুর বাড়িতে মাস্টারমশাই ঠাকুরকে বলছেন, যিনি যিশু, তিনিই চৈতন্য, তিনিই আপনি। আবার কাশীপুর বাগানবাড়িতে ঠাকুর নিজে বলছেন, যেই রাম, সেই কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ। তিন পুরুষে আমিরের এ হচ্ছে এক রকম ব্যাখ্যা।

আবার ঠাকুরের কৃপায় আমরা এখানে আর একরকম ব্যাখ্যা পেয়েছি। ঠাকুরদা আমায় (স্বপ্নে) দেখছে, বাপ আমায় দেখছে, আবার নাতি আমায় দেখছে। একি অদ্ভুত বল দেখি!

একটা mystic কথা বলি, শুনে রাখ— সে কেবল এক জীবনকেষ্ট ঘোষ। (সকলে নির্বাক, অভিভূত, ঘর নিঃশব্দ। তখন বেলা প্রায় সাড়ে চারটা। সেদিন ছিল শুক্রবার ২৬শে এপ্রিল, ১৯৫৭)

সপ্তম প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ২৮শে এপ্রিল ১৯৫৭ হইতে ১৯শে মে ১৯৫৭)

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত হইতে গান পড়া হইতেছিল **'সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী ....'**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, কালী কি? এই দেহ! এই দেহে এমন জিনিস আছে যে মানুষটা সর্বক্ষণ আনন্দে থাকতে পারে। তার দেহে আনন্দের স্রোত বয়, সে আনন্দের আর বিচ্ছেদ নেই। তাই দেহ হ'ল সদানন্দময়ী কালী! এই হচ্ছে নিত্যানন্দ বা পরমহংস অবস্থা। আর, মহাকালের মনোমোহিনী কেন? মহাকাল কি? কাল হচ্ছে সময়। সেই আনন্দের স্রোত যখন দেহে বয় তখন সময়ের জ্ঞান তার আর থাকে না। তাই সে মহাকালের মনোমোহিনী।

* **কালীর এক দিকের হাতে বর আর অভয়, অপর দিকে খড়্গ ও মুণ্ডমালা কেন?** এই দেহের দুটি অবস্থা— শান্ত আর রুদ্র। শান্ত যখন তখন হচ্ছে বর ও অভয়। আর যখন রুদ্ররূপ তখন হচ্ছে খড়্গ আর মুণ্ড। তাই তো ওই প্রার্থনা, তোমার রুদ্ররূপ সংবরণ কর, শান্ত হও। 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্!'

* কথামৃত ৫ম ভাগের ষষ্ঠ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পড়া হচ্ছিল, '**স্নানান্তর তিনি ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর তাক হইতে একটি আম্র লইয়া তাঁহাকে দিলেন। বলিতেছেন, এই আমটি একে দিই, তিনটে পাশ করা।**' শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, ঠাকুর আধিকারিক পুরুষ ছিলেন। কাউকে কিছু দেবার অধিকার এঁদের থাকে। কারো কিছু হোক— এ ইচ্ছা যদি তাঁরা করেন তবে তাদের হয়। মণি তিনটে পাশ করা, এখানে পরীক্ষায় পাশ করা নয়। মাস্টার মশাই ছিলেন শাক্ত। ওঁদের অনুভূতি ওই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ অর্থাৎ ষষ্ঠভূমি পর্যন্ত। তাই ঠাকুর তাকে পাকা আম দিচ্ছেন, অর্থাৎ প্রতীকে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার দিচ্ছেন। দেখ না ঠাকুর লিখেছিলেন, নরেন্দির লোকশিক্ষা দিবেক। হলোও তো তাই।

* (দেব কুমার চৌধুরীকে) **তুই আমাকে স্বপ্নে দেখিস, কেমন না?** আগে তো আমাকে দেখিস নি, এখন দেখিস কেমন করে? আমি নিজেকে তোর ভিতরে বিলিয়ে দিলুম, তুই আমাকে তোর ভেতরে দেখ্— এই অধিকার দিলুম, তাই হ'ল।

* **কবিরাজ রামবাবু— আচ্ছা, মানুষ যখন ঘুমে অচেতন হয়ে থাকে, তখন তার মন থাকে কোথায়?**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— অনেক দিন আগে একজন আমাকে ঠিক এই রকম প্রশ্ন করেছিল। আমি তাকে বলেছিলুম— এসব খবরে কাজ কি? আম খেতে এসেছেন আম খেয়ে যান। আমাকে দেখিয়েছে মন কোথায় থাকে। ষষ্ঠভূমিতে একটা জায়গা আছে, সেখানে থাকে। Western Philosophy তে এসব কথা নেই, তারা এসব জানে না। দেখছি— দেহের নীচে থেকে একটা হাতি উঠছে ওপর দিকে। আমি এতটুকু হয়ে গেছি, অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরে দেখা। ষষ্ঠভূমিতে যখন হাতিটা উঠল তখন আমি একটা খাঁজ মত জায়গায় ঘুপ্‌টি মেরে বসে রইলুম। কেননা, মনে হ'ল যে ও শালা আবার নামবে। যদি ঠিক ঠিক জায়গায় না থাকি তবে ওর পায়ের চাপে পিষে যাব। হাতিটা ষষ্ঠ ভূমিতে একটা ব্রাকেটের মত জায়গায় কিছুক্ষণ রইল। পরে সেটা হুড়মুড় করে নেমে গেল। তখন বুঝলুম যে ওরে, ঘুমের সময় মানুষের মন তো ষষ্ঠভূমিতে থাকে।

* **ঠাকুর বলেছেন, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। ধর্মজগতের ইতিহাসে ঠিক এই রকম কথা আর কেউ বলে নি। উপনিষদে আছে— 'আত্মা অরে দ্রষ্টব্য' ইত্যাদি।**

ঠাকুর তো বলেই খালাস। কিন্তু হ'ল কৈ? তাঁর সময়ে ক'জন তাঁকে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে পেয়েছিল? আর এখানে? এখানে যারা এসেছে তাদের মধ্যে অল্পগুটিকতক ছাড়া আর সকলে oppositionist। 'আমি' বলেই এবার বলি। উত্তম বৈদ্যের কথা আছে, সে রোগীকে জোর করে ওষুধ খাওয়ায়। আমি জোর করে তাদের ভেতরে ঢুকি। I per-force enter into them!

এখানে একটা ফাঁক আছে। কেউ বলতে পারে,— মশাই, ভগবানই আপনার রূপ ধরে ফুটে ওঠেন। বেশ, তাই যদি হয় তবে আগে হয় নি কেন, আর আমাকে নিয়েই বা হচ্ছে কেন?

* **ঠাকুর এগার বছর বয়সের সময় জ্যোতি দর্শন করেছিলেন। আর, বার বছর চার মাস বয়সে আমার সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়েছিল। দুটোর মধ্যে তফাৎ কী?** ঠাকুরের জ্যোতি দর্শন হ'ল বটে কিন্তু পরে তাঁকে কঠোর সাধন করতে হয়েছিল। একথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। আর আমার বেলায়? ঠাকুরের ওই যে কথা— সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হলো তো তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসার জায়গা পাওয়া গেল। আমার সাধন ভজন? চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা। তোদেরকে তো বলেছি— আমি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতুম আর দেখতুম সব আপনা হতে হচ্ছে।

দেখ্না, ঠাকুরের বেলায় কত কি করতে হল! রাসমণিকে স্বপ্ন দিতে হ'ল, মথুরবাবুকে আনতে হ'ল, তাছাড়া জমি কেনা, মন্দির তৈরী ইত্যাদি ব্যাপারে সাত লক্ষ টাকা খরচ করতে হ'ল, তারপর আরো কত কি! তা হলে জিনিসটা সর্বসাধারণের হ'ল কৈ?

ওরে, সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হ'ল তো আর কোন কিছুরই দরকার নেই। দক্ষিণেশ্বর বাগানেরও কোন দরকার নেই বাবা! শুয়ে থাকবার একটা চাটাই হলেই হ'ল।

* **উপনিষদে আছে— আত্মা যাকে বরণ করে তারই হয়। কিন্তু আত্মা বরণ কী ক'রে করে?** আমরা বলি বটে যে এগার বছর বয়সে ঠাকুরের যে জ্যোতি দর্শন হয় ওই হ'ল আত্মার বরণ করা। কিন্তু ও তো বিচারাত্মক। ও আত্মা নয়, ও হ'ল আত্মিক জ্যোতি। আমি বলেছি যে ঠিক চব্বিশ বছর আট মাস বয়সে আত্মা পূর্ণরূপ ধরে দেহেতে প্রকাশ পায়। ওর এক চুল এদিক ওদিক নেই।

ঠাকুরের বেলায় কি দেখছি? তিনি বলছেন— ছেলে যদি খুব জোর করে তবে মা-বাপ পরামর্শ করে দু-তিন বছর আগেই তার হিস্যে

ফেলে দেয়। তা'হলে চব্বিশ বছর আট মাস বয়সের আগেই ঠাকুরের আত্মা সাক্ষাৎকার হয়েছিল, কেমন না? তা হলে কি হল বাবা?

ক্ষিতীশ— ঠাকুরের বেলায় জিনিসটা Premature হয়েছিল।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— Thank you ! ঠিক বলেছিস। হ্যাঁ। ঠিক তাই।

* হীরুবাবু শ্রীজীবনকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরে দৈববাণী শুনেছেন— শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলছেন— **কথামৃতের কথা চাপা পড়ে গিয়েছিল, আমি সেই কথা তোদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে গেলুম।**

এই দৈববাণীর কথা শুনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, বাঃ, বেশ দৈববাণী শুনেছিস তো। কথামৃতের কথা কে বুঝতে পারে? অমন স্বামীজী, তিনিই বুঝতে পারেন নি; অন্য লোকের আর কথা কি? হ্যাঁ বাবা, যখনই তোদের সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়েছে তখনই কথামৃত তোদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কথাটা লিখে রাখিস রে।

* **ঠাকুর সাধারণ মানুষের বেলায় বলেছেন যে তোমরা বিষ ঢালবে না, ফোঁস করবে। আবার ত্যাগীর বেলায় বলেছেন যে ত্যাগীর ফোঁস করারও দরকার নেই।** তাই ব'লে ঠাকুর কী বলছেন যে ত্যাগীর কেউ কোন ক্ষতি করতে আসবে না? ওরে বাবা, এমন লোক আছে যারা কেউটে সাপের জাত। সেখানে ত্যাগী কিছু করবে না, ভগবানই তার ব্যবস্থা করবেন। মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদিতে এই জিনিসটাকেই 'অভিশাপ' বলে খাড়া করা হয়েছে। ওই যে রে দুর্বাসা মুনি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খালি অভিশাপ দিয়ে বেড়াচ্ছে।

* **এই দেহ এমনই জিনিস যে মানুষ কিছুতেই মরতে চায় না। মরার পরেও সে ভোগ করতে চায়।** পিরামিডের যুগে মিশরের ফ্যারোয়াদের কথা ভাব না। একজন ফ্যারোয়া মরলে কত জিনিস ওই পিরামিডের মধ্যে দেওয়া হত। কত রকমের খাবার, ভোগের জিনিস, দাস দাসী, মায় রানী পর্যন্ত। একজন ফ্যারোয়া মরলে তার সঙ্গে আরও কিছু লোক মারা পড়ত। এ সব কেন? মরে গিয়েও মানুষ ভোগ করতে চায় তাই।

* **মহাপ্রভুর ওই যে উপদেশ— তৃণাদপি সুনীচেন— ওকি চেষ্টা করে হওয়া যায় বাবা?** কখন মানুষটা তৃণাদপি সুনীচেন হবে? আত্মা সাক্ষাৎকারের পর লোকটার যখন তত্ত্বজ্ঞান হবে, হাম্বা হাম্বা নয়, যখন সে তুঁহু তুঁহু করবে তখনই সে হবে তৃণাদপি সুনীচেন।

* **Nothing comes from outside. Everything is within a man.** বামনাবতার, তিন পায়ে সব ঢেকে ফেললেন কী বল্ দেখি? লিঙ্গ গুহ্য নাভি হল পাতাল। নাভি থেকে ষষ্ঠভূমি পর্যন্ত হল মর্ত্য, আর সহস্রার হ'ল স্বর্গ। পাতাল-মর্ত্য-স্বর্গ বললে আগম বোঝায়, আর স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বললে বোঝায় নিগম।

* **অভিসার কী?** কুণ্ডলিনী মূলাধার থেকে জাগ্রতা হয়ে এক একটা গাঁট ছেড়ে চল্‌ল সহস্রারের দিকে— ওই হল অভিসার! কুণ্ডলিনীর আর এক নাম প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সহস্রারে উঠে পুরুষের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন, অর্থাৎ পুরুষে পরিবর্তিত হচ্ছেন। ভাগবতের যে রাধাকৃষ্ণ তা সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষের ওপর base করা।

* **বেদ মানে দেহ— যেখানে সত্য প্রকাশ পায়।**

* **ঠাকুর বলছেন (কথামৃতে), ষড়-চক্রের এক একটি পদ্মে জিহ্বা দিয়ে রমণ করে আর অধোমুখ পদ্ম উর্দ্ধমুখ হয়ে ওঠে। শেষে সহস্রার পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'ল।** এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঠাকুর কি পদ্ম দেখেছিলেন, না চক্র দেখেছিলেন? যদি পদ্ম দেখে থাকেন তবে প্রতীকে দেখেছিলেন। আর, যদি চক্র দেখে থাকেন তবে বস্তুতত্ত্বে হয়েছিল। চক্র বলতে ঠিক চাকা নয় ওপরটা covered। এ জিনিসটা বুঝতে গেলে figure of speech বুঝতে হবে। অলঙ্কার বুঝতে হবে।

* **ঠাকুর ওই যে বলছেন— আদেশ পেলে তবে প্রচার— তা সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ পাওয়া আর চাপরাশ পাওয়া দুটো কিন্তু আলাদা।** শুধু আদেশ পেলে ভুল হতে পারে। ঠাকুরের জীবনেই তার দৃষ্টান্ত

রয়েছে। ওই যে রে অধর সেনের চাকরী। ঠাকুর তো মাকে বললেন চাকরীর কথা, মা বললেন— হয়ে যাবে। মা তো সাক্ষাৎকার হয়েই বললেন, তা হলো না কেন? তখন ঠাকুর বলছেন, ওরে এ মহামায়ার রাজ্য, বড্ড হিজিবিজি! তাই ঠাকুর চাপরাশের কথা বলে গেছেন। চাপরাশ পেলে তবে জানবি ঠিক ঠিক হয়েছে।

* **ঠাকুর ওই যে তাঁতীর গল্প বলে গেছেন— রামের ইচ্ছায় ডাকাতে ধরল ইত্যাদি— ওই তাঁতী মানে কী?** ব্রহ্মবিদ পুরুষ। তাঁতী কি করে? সুতা নিয়ে টানা পোড়েন করে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ পুরুষ জানে যে সে বিশ্বে ওতঃপ্রোত হয়ে আছে। তাই সবই রামের ইচ্ছা। সাহেব, অর্থাৎ ভগবান, তাকে ছেড়ে দেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত করে দেন।

* কেউ হয়ত সত্তর বছর পার হয়ে এসেছে, একদিন তার হঠাৎ মনে হতে পারে— এতদিন ধরে আমি তো একটা স্বপ্ন দেখে এসেছি।

অষ্টম প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ১৯শে মে, রবিবার, সকাল হইতে
২৬শে মে, রবিবার, ১৯৫৭)

* **ঠাকুর বলেছেন, যে সমন্বয় করেছে সেই ধন্য।** মাস্টার মশাই (শ্রীম) সেই কথারই বেশ সুন্দর ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন— হিন্দুর যদি ভক্তি দ্যাখো অমনি সে তোমার আত্মীয়,— মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার আপনার লোক,— খৃষ্টানের যদি যীশুর উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার পরম আত্মীয় (কথামৃত ১/১৩/৯)।

আর আমি এই সমন্বয়ের কথা কি বলেছি? ভাগবতী তনুই কখন কৃষ্ণ হচ্ছে, কালী হচ্ছে, কখনও বা রাধা হচ্ছে, আবার কখনও বা যীশু হচ্ছে, চৈতন্য হচ্ছে, যে যেভাবে দেখে।

* কথামৃত পড়া হচ্ছে ১ম ভাগ, ১৩শ খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। **শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল 'অ'কার 'উ'কার**

‘ম’কার। আমি উপমা দিই— ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম। লীলা থেকে নিত্যে লয়,— স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়।— আমি ঠিক এই সব দেখেছি। তোমাদের বইয়ে কি আছে অত আমি জানি না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, এখানে কী হ’ল? **ঠাকুর বললেন— ‘ওঁ’কার নয়, টং। অর্থাৎ ‘ওঁ’কারকে উচ্ছেদ করে দিয়ে গেলেন।** শুধু তাই নয়, এই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু লেখা আছে তাও উচ্ছেদ করে গেলেন। ঠাকুর টুক্ করে একটা কথা বলে গেলেন— তার কত গভীর অর্থ সাধারণ লোক কি ধরতে পারে? সাধারণ লোক কেন, খুব intelligent লোকও এসব কিছু ধরতে পারবে না, শুধু পড়েই যাবে।

* **ঠাকুর দত্তাত্রেয়, জড়ভরতের কথায় বলে গেছেন, দত্তাত্রেয় কত বড় বাপ মায়ের ছেলে। আবার দেখ, ঠাকুর অন্য জায়গায় বলেছেন, ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লেও ছোলাগাছই হয়।** অর্থাৎ কে বাপ, কে মা, সে হিসাবের দরকার নেই। ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লেও সে ছোলাগাছই হবে।

ঠাকুর অবশ্য প্রচলিত মত উলটে দিলেন না, কিন্তু বলে গেলেন যে— এও হতে পারে।

* **রাজার বেটা কী জানিস?** ভগবানের অনন্ত শক্তি। তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু শক্তি কোন দেহেতে প্রকাশ পায়। তাকেই বলে fathership আর sonship। ভগবান হলেন father আর সেই দেহ হল son,— রাজার বেটা। যেমন, অগ্নি আর তার স্ফুলিঙ্গ। যতটা বড় ভাবতে পারিস ততবড় একটা অগ্নিপিণ্ড ভাব, আর সেই অগ্নিপিণ্ড থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ ভাব। সেই স্ফুলিঙ্গ হ’ল রাজার বেটা।

ঠাকুর ওই যে বলেছেন রাজার বেটা মাসোহারা পায়— ওর মানে কী? সে খাবার পায়? না। আর পেলেও সে নেবে কেন? যখনই সে অপরের কাছ থেকে কিছু নেবে তখনই যে তার গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে, তাই

সে কারো কিছু নেবে না। ‘মাসোহারা পায়’ মানে— তার সাধন ভজন আপনা থেকে হয়। তাকে কোনোরকম চেষ্টা করতে হয় না।

রাজার বেটা কেন রে— রাজাই আছে,— বুঝলি?

* **যোগক্ষেমং বহাম্যহং**— মানে যোগীর জন্যে ভারা ভারা সন্দেশ রসগোল্লা আসে তা নয়। এর মানে হ’ল— দেহকে যোগযুক্ত ক’রে তিনি দেহীর ভার গ্রহণ করেন।

* (সন্ধ্যার পর শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরখানি সাধারণতঃ কর্মক্লান্ত মানুষের সমাগমে ভরে উঠত। অনেকেই জামা গেঞ্জী খুলে খালি গায়ে ঘরে বসে থাকতেন। পাঠ শেষ হলে সেগুলি পরে আবার ঘরে ফেরার পালা। **একদিন একজন বাড়ী ফিরে বুঝতে পারেন তাঁর জামাটি বদল হয়ে গেছে।** জামার পকেটে ফাউন্টেন পেন, চশমা, নস্যির কৌটো কিছুই নেই। অপর একজনের জামা তাঁর গায়ে। পরের দিন পাঠশেষে হাসি ঠাট্টার মধ্যে জামা বদল পর্ব সম্পন্ন হচ্ছে; কিন্তু আনন্দ মধুর পরিবেশেই শ্রীজীবনকৃষ্ণের এক ভাবগম্ভীর রূপ ফুটে উঠল।) তিনি বললেন—

ওই এখানকার মূলকথা। মানুষটা বদলে যায়। জীব শিবে পরিবর্তিত হয়। (শ্রীজীবনকৃষ্ণ সমাধিস্থ, সমাধি ভঙ্গের পর) মানুষটা ভগবানে পরিবর্তিত হয়ে যায়।— ওই যে বলে ভক্তিযোগে ভগবানকে পাওয়া যায় — এ কথার মানে কী? দেহেতে ভক্তির উদয় হলে সেই ভক্তিই ভগবানে পরিবর্তিত হয়।

* **তত্ত্বজ্ঞান কী?** তোরা কেউ এসে যখন বলিস যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছিস তখন আমি কি বলি? বলি বাবা, সে আমি নই, সে ভগবান। ওই হল তত্ত্বজ্ঞান, আমি নই, সব তিনি।

* **কখনও কখনও হয়ত খুব অনুভূতি হয়েছে।** এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা অবশ হয়ে শুয়ে পড়ে আছি। তারপর আর কি! ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে বেরিয়ে পড়েছি। অনুভূতি হয়েছে তো হয়েছে, কোন্ শালার কী? হ্যাঃ।

* বলে,— সখি গো সখি, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। আমার ৬৫ বছর বয়স হল এখনও শেষ নেই। ..... কাল একাদশী ছিল। খুব জোর ধরেছে। রাতের প্রথম দিকেই দেখলুম — শিরদাঁড়ার দুটো তিনটে পাব কি রকম ছিল। তার ভেতরগুলো কেমন খুলে গেল। তোদের কাছে আর সবটা খুলে বললুম না।

* এখানকার দুজন স্বপ্ন দেখে বলেছিল— আমার জন্মতিথি পুজোর কথা। আমি শুনে বলেছিলুম, জন্মতিথি পুজো তো অনেক হয়েছে। তাতে জগতের কী কল্যাণ হয়েছে? হরেন স্বপ্ন দেখেছিল— আমাকে পুজো করতে বলছে। আমি যদি সেই সব কথা শুনতুম তাহলে গতি রুদ্ধ হয়ে যেত। আজ ৬৫ বছর বয়সেও যে নতুন জিনিস হচ্ছে তা কবে থেমে যেত। এ সব হচ্ছে তাঁর পরীক্ষা।

* ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, আমার আমিকে খুঁজতে যাই পাই না, দেখি তিনিই রয়েছেন। আর আমার কি হয় জানিস? আমি কিছুই পাই না। আমি কিছু পাই না, তাই তোরা আমাকে পাস, তা নাহলে তোরা কিছুই পেতিস না। হেঁয়ালী করে এই কথাটি বলে গেলাম। যা বুঝিস বুঝবি।

* পুরাণকারদের এত অদ্ভুত মেধা, তাদের **Balance** করার বুদ্ধি এত বেশী যে তা আর বলা যায় না। একলব্য শূদ্র। সে মাটির দ্রোণাচার্যের মূর্তি করে বাণ শিক্ষা করতে লাগল। অর্থাৎ বোঝাতে চাইছে যে একলব্যের সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়েছিল। কিন্তু শূদ্রকে সচ্চিদানন্দগুরু লাভের অধিকার দেবে কি করে? তাই সচ্চিদানন্দগুরু তাকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগল। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা না শিখে একলব্য এমনই এক বিদ্যা শিখতে লাগল যা থেকে নাম-মান-যশ-অর্থ সব হয়। দেখছিস কী অদ্ভুত বুদ্ধি পুরাণকারদের।

* ঠাকুর বলেছেন, মনুমেন্টের নীচে সাহেব, মেম, ঘোড়া, গাড়ী লোকজন কত বড় আর স্পষ্ট দেখায়। মনুমেন্টের উপরে উঠলে সব এতটুকু এতটুকু।

মনুমেন্ট অর্থাৎ মেরুদণ্ড। মনুমেন্টের নীচে যখন থাকে, অর্থাৎ মন যখন মূলাধারে থাকে, তখন ঘোড়া গাড়ী অর্থাৎ ভোগের বস্তু সব বড় বলে মনে হয়। মন যখন উপরে ওঠে তখন এতটুকু। অর্থাৎ একেবারে যায় না, কিন্তু আকারে ছোট হয়ে যায়।

আহা, কি উপমা রে!

* যীশুর **Parables** (নীতিগর্ভ কাহিনী) আর ঠাকুরের **metaphor** (রূপক অলঙ্কার) আকাশ জমীন তফাৎ। যীশুর Parables-এর যোগে (দেহতত্ত্বে) ব্যাখ্যা হবে না। Parable of the ten virgins-এ দেখ্। যীশু বললেন বাতি জ্বেলে বসে থাকতে হবে, তা নাহ'লে বরকে দেখতে পাবে না। আরে, বর যে ঢাক ঢোল বাজিয়ে আসে। এ যে যোগের উলটো কথা। কিন্তু ঠাকুরের ওই যে সব metaphor ওর প্রত্যেকটির যোগে অর্থাৎ দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা আছে। শুধু তাই নয় কথামৃতের প্রতিটি লাইন দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা করা চলে। কথামৃত ভগবানের দেওয়া এমনই একখানা বই।

এখানে আর একটা কথা আছে, ঠাকুর ওই metaphorগুলো বলে পরিষ্কারভাবে তার দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা করে গেলেন না কেন? আমরা এখন এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে ঠাকুর নিজে পরিষ্কার ভাবে বুঝে সব কথা বলতেন না। তাঁর মুখ দিয়ে অপর কোন শক্তি কথা বলত। তাই ঠাকুর বলতেন, মা আমার কথার রাশ ঠেলে দেন।

দেখ্ না, ঠাকুর বলছেন, বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠায় থাকতে ভালবাসে। ভাতের হাঁড়িতে রাখলে হেদিয়ে হেদিয়ে মরে যাবে। বিষ্ঠার পোকা, ভাতের হাঁড়ি— সবই বাইরের জিনিস। আর, আমি এর কী ব্যাখ্যা দিই? বিষ্ঠা কী? লিঙ্গ গুহ্য নাভি। ভাতের হাঁড়ি কী? সহস্রার। যাদের মন লিঙ্গ গুহ্য নাভিতে আবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ যারা জীবকটি লোক, কোন মহাপুরুষ যদি তাদের মনকে সহস্রারে টেনে তোলেন তবে তারা হেদিয়ে হেদিয়ে মরে যাবে। ক্ষিদে থাকবে না, ঘুম হবে না। সব কেমন এলান ভাব হয়ে যাবে, শেষে মারা যাবে। ঠাকুর বললেন বাইরের কথা, আর এখানকার ব্যাখ্যা হল দেহের ভেতরের।

যীশুর Parables ঠাকুরের metaphor আর এখানকার দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যার কথা বুঝলি কিছু, না কেবল শুনেই গেলি?

নবম প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ৫ই জুন বুধবার, ১৯৫৭ হইতে
১০ই জুলাই, বুধবার, ১৯৬৭ পর্যন্ত)

* ভগবান সর্বশক্তিমান— **in His own way.** ভক্তের কামনা বাসনা পূর্ণ করবার জন্য নয়। আবার এর উলটো দিকও আছে। যে ঠিক ভক্ত তার কোন কামনা বাসনা থাকে না।

* বিবেক কী? ঈশ্বরের পথে যা কিছু বাধা স্বরূপ বলে মনে হবে তাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ— এই হচ্ছে বিবেক কথাটির এক মানে।

* ধর্মে আবার জাত কী? মানুষের ভেতরে ভগবান। এ যে শারীর বিদ্যা। দিন চারেক আগে বিকেল বেলায় একজন হিন্দুস্থানী মেথর এসে হাজির। তখন খুব গরম। একটু হাওয়া পাব বলে জানলার কাছে গিয়ে বসেছি। সে আসতে তাকে সামনে বসিয়ে বললুম— একটু ধ্যান কর। সে ধ্যানে ঠাকুরকে দেখলে, কালীকে দেখলে আর আমাকেও দেখলে। ধর্মে আবার জাত কি রে? একজন হোটেন্টোর কি হবে না? ফিনল্যাণ্ড দেশের লোকের কি হবে না?

* স্বামী-স্ত্রীকে ইহকাল পরকালের সঙ্গী বলে। ইহকালের সঙ্গী তো বুঝলুম। কিন্তু পরকালের সঙ্গী কেন? কারণ, স্বামীর কর্মফল স্ত্রীকে নিতে হয়, আবার স্ত্রীর কর্মফল স্বামীকে নিতে হয়। তাই কী করা উচিত জানিস? স্ত্রীকে ঠিক নিজের শিষ্যার মত দেখা উচিত।

* 'গীতগোবিন্দ' পড়ার ফল হচ্ছে এই যে, যদি কেউ কোন স্ত্রী আর পুরুষকে একসঙ্গে যেতে দেখে সে তাদেরকে রাধাকৃষ্ণরূপে দেখবে। গীতগোবিন্দ যখন আমার আধখানা পড়া হয়েছে তখন মুখ তুলে বাইরে দেখি রাধাকৃষ্ণ যাচ্ছে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে

গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছিল। তাদেরকেই ওই ভাবে দেখলুম। এ যে গীতগোবিন্দ পড়ার ফল তা কি তখন জানি? যখন পড়া শেষ হ'ল তখন দেখলুম গীতগোবিন্দ পড়ার ওই রকম ফল পাওয়ার কথা লেখা আছে।

* আমি পুরো গীতাটা কখনও পড়িনি। একটু আধটু পড়েছি। এক সময়ে একটা করে অধ্যায় রোজ পড়তুম। কিছুদিন পরে তাও আবার ছেড়ে দিয়েছিলুম।

গীতার চেয়ে চণ্ডী বরং আমার ভাল লাগত। তখন আমি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। ঠাকুরের জন্মতিথির আগের দিন ভাবলুম যে কাল আমি কাঁকুড়গাছি যাব। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে তখন ঠাকুরের জন্মতিথিতে বেশ বড় বড় বেগুনি খাওয়াত। পরের দিন সকালে উঠে দেখি জ্বর। তখন এইরকম জ্বর মাসে একবার করে হোত। আর যাওয়া হল না। বই খুঁজতে গেলুম। দেখলুম চণ্ডী রয়েছে। খুলে পড়তে শুরু করলুম। সব বইটা পড়ে ফেলেছিলুম। পড়তে পড়তেই সব বুঝতে পেরেছিলুম। ওই যে মায়াতে টক্ টক্ করে সব মারছেন— ওর মানে আমি বুঝে ফেলেছিলুম।

* আমি তখন **Bengal Boarding**-এ থাকি। বেলা ১২টা নাগাদ খাওয়া হয়ে যেত। তারপর একটু ধ্যান করতে বসতুম।

সেদিনও ওইরকম বারটার পর ধ্যান করতে বসেছি। কতক্ষণ ধ্যান হয়েছে জানি না। একটা খুট্ খুট্ শব্দ কানে এল। চেয়ে দেখি ক্ষিতীশ, রাধু আর অভয় খড়খড়ির পাখি তুলে দেখছে। আমার শরীর তখন খুব ভাল। ধ্যানের রেশ রয়েছে। তবু ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দরজা খুলে দিলুম। ওরা ভেতরে আসতে জিজ্ঞাসা করলুম— এখন কটা বাজে? ওরা বললে— চারটে! তোরা কতক্ষণ এসেছিস? বলল, বেলা আড়াইটার সময়। ওদেরকে শুধু বললুম যে বারোটার পর একটু ধ্যানে বসেছিলুম। বয় তখন চায়ের যোগাড় করছিল। কথাটা চাপা দেবার জন্যে তাকে বললুম যে, ওরে চার কাপ চা নিয়ে আয়।

বেলা বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ধ্যান! আর মহাপুরুষ মহারাজের জীবনীতে আছে— তিনি বলছেন যে দু'ঘণ্টার বেশি কি

ধ্যান করা যায়? স্বামীজীও বলতেন দু'ঘণ্টার বেশি ধ্যান হয় না, ধ্যান হাল্‌কা হয়ে আসে। অথচ ঠাকুর তাঁকে ধ্যানসিদ্ধ বলেছেন।

* কেয়া মূলায়েক কেয়া ইনসান কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান।
যৈসা চাহা তুনে বানায়া যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।

এক সময় এই গানটিকে ভয়ানক **Criticise** করতুম, যৈসা চাহা তু নে বানায়া? এ কোন চাওয়া রে? জগৎ এই রকম হোক এ চাইল কে? এক ভদ্রলোক? — এ সব Old Testament এর idea. ওরে সবই তাই। একটা কথা শুনে রাখ— জগতে ধর্মের নামে এ পর্যন্ত যা চলে এসেছে তা হচ্ছে FORMAL RELIGION, খালি ওই ফুল, বেলপাতা আর নৈবিদ্যি। আমি তাই তো এক এক সময় বলি যে ঠিক আত্মা সাক্ষাৎকার ঠাকুরের আগে আর কারো হয় নি।

* ভোগ কাকে বলে শুনে রাখ। ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর যা কিছু তাই ভোগ। এর minimum হচ্ছে ভগবান ভগবান করে দিন কাটান, আর maximum হচ্ছে যার আধারে যতটুকু হয়। তাই কী করতে হয় জানিস? একটা খুঁটি ধরে থাকতে হয়। আমি আর কিছু জানি না শুধু তাঁর নামটি নিয়ে থাকব।

জানি না তোর গাঁই গুঁই। বীরভূমের বামুন মুই।

এ অবশ্য ব্যাকুলতাও নয়, বৈরাগ্যও নয়। ঠাকুর এই ভাবকেই বলেছেন— বিড়াল ছানার মত মিউ মিউ করা।

মানুষটা জন্ম থেকেই এই রকম। ওই যে অম্বর বসে আছে। এখানে আসার সাড়ে চার বছর আগে আমাকে দেখেছে। সেই থেকে ওর সাধুসঙ্গ শুরু হয়েছে। ও জানুক আর নাই জানুক, ওর ক্রিয়া শুরু হয়েছে সেই সময় থেকে। কিন্তু এ জিনিসটা কি শুধু ওই সাড়ে চার বছর আগে আমাকে দেখেই হ'ল? না! এ হ'ল জন্ম থেকে, তোদের সকলের বেলাতেই তাই।

এর একটা অদ্ভুত Physical explanation আছে। পিতার বীজ যখন মাতৃগর্ভে পড়ল তখন সেই বীজ বাইরে এসে যে ভাবে ফুটবে সেইভাবে তার খাদ্য সংগ্রহ করে। যা পায় তাই কি খায়? না। প্রত্যেকে মাতৃগর্ভ থেকে

নিজের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ কোরে জগতকে বিক্ষেপ করে বেরোয়। এখন কেউ বলতে পারে— মশাই, এর প্রমাণ কী? প্রথম প্রমাণ হ'ল— একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের মিল দেখতে পাওয়া যায় না কেন? আর দ্বিতীয় হ'ল— জগতটা এক এক জন লোকের কাছে এক এক রকম। জন্মের সময় মানুষটা যে ভাবে জগতকে বিক্ষেপ করে জগতটা তার কাছে সেই রকম। দেখ না— লাট সাহেবের বাড়ী! ঠাকুর বললেন, এতে আর কি আছে মা? পোড়া মাটি থাক্ থাক্ করে সাজান বই তো না।

এইখানে Predestination কথার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 'নিত্য' যে আছে একথা লোককে বোঝান যায় না। ক্বচিৎ কখনও দু'একটা লোকের নিত্যের অনুভূতি হয়। কিন্তু মাতৃগর্ভে অবস্থানের সময় মানুষ যেভাবে ফুটবে সেইভাবে নিজেকে তৈরী করে আনে— একথা বরং বোঝান যায়। দেখনা, এগার বছর বয়সের সময় ঠাকুরের জ্যোতি দর্শন হ'ল। আত্মা জ্যোতিরূপে তাঁকে বরণ করলেন। একি ঠাকুর জানতেন, না আর কেউ জানতেন? না, জন্ম থেকেই এই রকম হয়ে এসেছে। সময় হলে সেটি ফুটে উঠবে।

* ঠাকুর বলেছেন, আগে ঈশ্বর দর্শন, তারপর আদেশপ্রাপ্তি, তারপর লোক শিক্ষা। ঈশ্বর দর্শন যে কী জগতের লোক তা জানে না। আমি বলি ঈশ্বর দর্শনের ক্রম আছে—

ষষ্ঠভূমিতে ইষ্ট সাক্ষাৎকার, বাসুদেব্ দর্শন হ'ল, কি কালী দর্শন হ'ল, কি শিব দর্শন এ একরকম ঈশ্বর দর্শন। এ হ'ল খুব নীচু স্তরের ঈশ্বর দর্শন। এখন পর্যন্ত লোকে ওকেই ঠিক ঈশ্বর দর্শন বলে জানে।

ঠাকুর এক মধ্যমার সৃষ্টি করে গেলেন, বললেন— অবতারকে দেখাও যা, ভগবানকে দেখাও তা। এ হ'ল আর এক রকম ঈশ্বর দর্শন।

আত্মা-সাক্ষাৎকার— এও ঈশ্বর দর্শন। আমি অবশ্য লিখেছি যে সচ্চিদানন্দগুরু এসে দেখিয়ে দেন। আবার ঠাকুরের কথা— কেউ এসে বলবে— এই! এই!— তবে জানবি ঠিক হয়েছে। অজানা লোক এসেও আত্মা সাক্ষাৎকারের কথা বলে দেয় — সেও ঈশ্বর দর্শন। আমাদের

এখানে তিনজনের ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। নিমাই, কেষ্টদা আর শিবপুরের সেই মুখুজ্যে,— কী নাম তার জানি না। (পরে আরও কয়েকজন ভাগ্যবান লোক শ্রীজীবনকৃষ্ণের কৃপায় ঈশ্বর দর্শনের অনুভূতি লাভ করেছেন)।

আবার, সেই আত্মার মধ্যে যখন জগৎ দেখা যায়, অর্থাৎ যখন বিশ্বরূপ দর্শন হয় তখন সেও ঈশ্বর দর্শন। আরো আছে।

আদেশ প্রাপ্তি এর অনেক—অনেক পরে। ঠাকুর অবশ্য শুক আর নারদের কথা বলে গেছেন। কিন্তু তারা কি রকম আদেশ পেয়েছিল কে জানে। আর এক রকম আদেশের কথা শুনে রাখ। যা প্রচার হবে তাই-ই বাণীরূপে সহস্রারে ফুটে ওঠে। ওই হ'ল চাপরাশ, ওই বাণীই জগতে ফুটবে।

বুদ্ধের সময় থেকে আমরা ধর্মজগতের একটা Rational Date পাই। সেই বুদ্ধের সময় থেকে এক রকম ধরতে গেলে ঠাকুরের সময় পর্যন্ত Missionary Work চলে এসেছে। খালি প্রচার। প্রচার-প্রচার আর প্রচার। ওপর ওপর দেখতে গেলে ঠাকুর প্রচার করেন নি, প্রায় ৩২ বছর দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন। কিন্তু under current-এ কী দেখছি? প্রায়ই আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা খরচ করে ভক্তদের বাড়ী যাওয়া আসা হচ্ছে। সেও এক রকম প্রচার নয় কি?

আর এখানে ঠাকুর ধর্মজগতের মোড় একেবারে ঘুরিয়ে দিলেন। ধর্মের জন্যে আর কাউকেও প্রচার করতে বেরোতে হবে না। যদি কারো হয় লোকে তাকে ঘরে বসে দেখবে।

* এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন,— অনুভূতি প্রতীকে হয় কেন?

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— ঠাকুর এই প্রতীক সৃষ্টি করে যাচ্ছেন যখন তিনি বলছেন আমাকে দেখাও যা ভগবানকে দেখাও তা। মিশরীয় চিত্রলিপি Hieroglyphics এর সময় থেকে এই প্রতীকতত্ত্ব চলে এসেছে। Hierogly-phics শুরু হয়েছে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে। মানুষের দেহের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য যখন কমে এল দেহ যখন খারাপ হয়ে গেল, তখন থেকেই প্রতীক শুরু হ'ল।

* ঠাকুরের অনুভূতি হয়েছিল— চারিদিকে নৃ-মুণ্ডস্তূপ। তার ওপর

ঠাকুর একলা বসে আছেন। এ হচ্ছে বেদান্তের অনুভূতি— অহমস্মি। জগতের সমস্ত লোক মৃত একমাত্র আমিই আছি। আর এই জিনিসটাই তন্ত্রে করল কি? পঞ্চমুণ্ডির আসন করে তার ওপর চেপে বসল। পঞ্চমুণ্ডির আসন দু'রকম হয়। (১) একটাই মানুষের মাথা থাকে আর চারটে অন্য জীবজন্তুর মাথা, অথবা (২) পাঁচটাই মানুষের মাথা। অর্থাৎ সমস্ত জীবজন্তু মৃত এই কথা বোঝাতে চাইছে। দেখ্ না, মূলাধারে আছে সুষুম্না-ঈড়া-পিঙ্গলা-চিত্রা-বজ্রানী এই পাঁচটা নাড়ী। এই জিনিসটাই পরে প্রতীকে হল কী? হল— পঞ্চবটী। পাঁচটা গাছ এনে পুঁতে দিলে, সব হয়ে গেল।

* ঠাকুর বললেন— অবতার বেদ বিধির পার। কেননা ভগবান মানুষের দেহে ফুটে ওঠেন ধর্মজগতে নতুন জিনিস দেবার জন্য। বেদের পার কেন? বেদে কেবল আত্মা সাক্ষাৎকারের কথাই আছে, অবতারত্বের কথা নেই। আর বিধি কি? বিধি মানে হচ্ছে নিয়ম, অর্থাৎ যা চলে এসেছে। এর মধ্যে Past Sense রয়েছে। তিনি এসে সে সব উল্টে দিয়ে যান। তাই অবতার বেদ বিধির পার।

* ঠাকুরের সঙ্গে একজন না একজন কেউ ছিল। ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী, জটাধারী, এ ছাড়া কত বেদান্তবাদী, তান্ত্রিক। কেউ না কেউ ছিলই।

আর আমার সঙ্গে কেউ ছিল না। এ কথা কেন বলছি? ওরে আমি শুয়ে শুয়ে দেখেছি— সব হচ্ছে। সাধুসঙ্গ? আমার বেলায় বরং ঠিক উলটো। আমি বুঝেছিলুম যে ও সব কিছু না। তারপর রঙের পর রঙ চড়ালেন ঠাকুর। স্বপ্ন দেখলুম— একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সঙ্গে অনেক গেরুয়াধারী আবার সাদা কাপড় পরা লোক। কিছুক্ষণ পরে দেখি— ও মা। কেউ কোথাও নেই।

দশম প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ২৩শে জুলাই, ১৯৫৭ হইতে ২৭শে এপ্রিল, ১৯৫৮ পর্যন্ত)

* ঠাকুর বলেছেন, 'বাপ প্রথম জন্ম দেন; তারপরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়।' উপনয়ন মানে তৃতীয় নয়ন, অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু উদ্ভাসিত হওয়া। ওই জ্ঞানচক্ষু খুলে

গেলে আর এক জন্ম কি করে হল? তার কারণ হ'ল জ্ঞানচক্ষু না খুললে আত্মাসাক্ষাৎকার হয় না। আত্মাসাক্ষাৎকার হলে তখন মানুষটি বোঝে— আমি দেহ নই, আমি আত্মা! তাই আর এক জন্ম।

এরপর সন্ন্যাস হলে তখন আর এক জন্ম। সন্ন্যাসী কে? যার দেহ আত্মা পৃথক হয়ে গেছে; যেমন খাপ আর তরোয়াল। দেহ আত্মা পৃথক হয়ে গেলে সেই আত্মা জগৎব্যাপী হয়ে পড়ে। আত্মা তো বহু নয়, আত্মা এক, লোকে তখন তাকে নিজেদের ভেতরে দেখতে থাকে। সন্ন্যাসী— ন্যাসী-ন্যাসী— জগৎগুরু। তখন তার তৃতীয় জন্ম।

* উপনয়নের সময় যে পৈতে পরানো হয়, তার সঙ্গে জ্ঞানচক্ষু খুলে যাওয়ার কোন সম্বন্ধ নেই। এক বলা যেতে পারে যে পৈতে কুণ্ডলিনীর প্রতীক। আর দেহে যে current pass করে তাকে কি রকম যেন control করে। এই ভাবে দেহের ভেতরের জিনিসকে বাইরে টেনে প্রতীক সৃষ্টি করা হয়েছে।

কুণ্ডলিনী হচ্ছে একটা current। ওর কোন physical existence নেই। 'বায়ু' যাকে বলা হয়, তার Physical existence আছে। ওই current-ই বায়ুকে ঠেলে সহস্রারে তোলে।

* ঠাকুর ওই যে উপমা দিয়েছেন— 'ওদেশের মেয়েদের দেখেছি— ছেলেকে মাই দিচ্ছে। এক হাতে খদ্দেরকে মাল দিচ্ছে, আর এক হাতে কাঁড়া ধান তুলছে। আবার ঢেঁকির পাটের সঙ্গে সঙ্গে ধান ঠেলে দিচ্ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথাও বলছে— তোমার বাকী পয়সা দিয়ে যেও'— এখানে ঠাকুর বলছেন যে, সব কাজের মধ্যে দিয়েও ভগবানকে ডাকা যায়। সব কাজের মধ্যে দিয়েও যে ভগবানকে ডাকা যায় এ কথা আর কেউ বলেনি রে, আর কেউ বলেনি।

* ঠাকুরের কথা আছে— কেরাণী জেলে গেল, বেড়ী পরলে, জেল খাটলে, জেল খাটা শেষ হলে সে কি ধেই ধেই করে নাচবে, না কেরাণীগিরিই করবে? ঠাকুরের এই 'কেরাণীর' আর এক ব্যাখ্যা দিই,

তোরা শুনে রাখ। যাদেরই সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়েছে তারাই কেরাণী। কেরাণী কী করে? লেখে। এখানে লোকটির দেহস্থ চৈতন্য লিখছে, তাই সে কেরাণী।

* 'মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না, সচ্চিদানন্দই গুরু'— ঠাকুরের এই কথার এক অর্থ এই যে ভগবান এ যাবৎ ধর্মের ভার মানুষের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন তাতে কারবার সৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ রে বাবা! অনেক বড় বড় কারবার হয়েছে। তাই ধর্মজগতের ভার তিনি মানুষের হাত থেকে নিজে গ্রহণ করলেন। এর পরের কথা হ'ল— 'সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই'। অর্থাৎ যদি কারো হবার হয়, তবে আপনা থেকে হবে, তা না হলে কোন উপায় নেই।

* 'মনুষ্যত্বং মুমুক্ষত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়'। এই 'মহাপুরুষসংশ্রয়' বলতে মানুষ এতদিন বাইরের জিনিস ধরে এসেছে। কিন্তু এখানেই ঠাকুর দেখালেন যে মহাপুরুষ সংশ্রয় ভেতরে হয়, বাইরে নয়। এই থেকে একটা জিনিস ধরে নিতে পারা যায় যে ধর্মজগতে এ পর্যন্ত বাহ্য জিনিস চলে এসেছে। এই বাহ্য জিনিস পরে জোচ্চুরী হয়ে দাঁড়ায়।

এই সচ্চিদানন্দগুরুর আবির্ভাবে ধর্মজগতে যা কিছু বাহ্য জিনিস সব উঠে যাবে— এই আমার একটা ভবিষ্যৎবাণী রইল।

* সুদর্শন চক্র মানে কী? সুদর্শন মানে দেখতে সুন্দর। আর চক্র মানে ভূমি। তন্ত্রমতে ষট্‌চক্র আর বেদমতে সপ্তভূমি। এক একটি চক্র বা ভূমির অনুভূতি কী অপূর্ব। অন্নময় কোষে প্রথম তিন ভূমিতে, স্বচ্ছ নীলাভ জল কল্‌কল্ করছে। চতুর্থভূমিতে জ্যোতি দর্শন। পঞ্চমে অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি, ষষ্ঠে রহস্যময়ী মায়ামূর্তি দর্শন, পর্দার আড়ালে সূর্য দর্শন। সপ্তমে শ্রীভগবান দর্শন। এক একটি চক্রের অনুভূতি কি চমৎকার! তাই সুদর্শন।

সুদর্শন চক্র ভগবানের হাতে। কেন? তার মানে হচ্ছে এই যে ভগবানের কৃপায় যদি কারো কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয় তবে দেহের মধ্যেই তার তন্ত্রমতে ষট্‌চক্র বা বেদমতে সপ্তভূমির অনুভূতি হতে পারে। তাই সুদর্শন চক্র ভগবানের হাতে।

যে স্বপ্নের পর কথামৃতের যৌগিকরূপ ফুটে ওঠে, সেই স্বপ্নে দেখেছিলুম আমার হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে দণ্ড সমেত চক্র। ছবিতে দেখা যায়— শ্রীকৃষ্ণের আঙ্গুলে সুদর্শন চক্র। আর এখানে দেখাল সেটা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। কোনটাতে বেশী জোর পাওয়া যায় রে?

* ঠাকুর বলছেন— ঈশ্বরকটি অবতারাদির অপরাধ হয় না। কেন? চৈতন্য তাঁদের আধারে অবতরণ করেছে জগতকে নতুন জিনিস দান করবে বলে। নতুন জিনিস দান করতে গেলেই পুরানো জিনিসকে উচ্ছেদ করতে হবে। অবশ্য সে সবও যুগের প্রয়োজনে হয়েছে। দেখনা ঠাকুর বললেন— মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। আমরা ধরে নিচ্ছি যে আড়াই হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে গুরুগিরি চলে এসেছে। এই আড়াই হাজার বছর ধ'রে প্রচলিত গুরুগিরি তিনি উচ্ছেদ করলেন। তাতে কি তাঁর অপরাধ হোল? না। তিনি কী শুধু গুরুগিরি উচ্ছেদ করলেন? না, সেই সঙ্গে জগতকে নতুন জিনিস দান করলেন যে সচ্চিদানন্দই গুরু।

* প্রেমাভক্তি বেশীদিন থাকে না। ওসব জিনিস স্থায়ী হয় না। দেখ না— গোপীদের তো অত প্রেমাভক্তি। কিন্তু তা টিকল কই। এপাশে বৃন্দাবন, ওপাশে মথুরা, মাঝখানে যমুনা। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে মথুরায় গেলেন, আর তাদের সব পাট চুকে গেল? যমুনা পার হতে না হয় ধরে নিচ্ছি তখন পাঁচ কড়া কড়ি লাগত। কড়ি যদি যোগাড় না হয় তারা ত' সাঁতরে মথুরা যেতে পারত। বিদ্যাসাগর বিয়ে বাড়ি যাবে বলে হেঁটে, দামোদর নদ সাঁতরে বিয়ে বাড়ি যেতে পারলেন, আর গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে যমুনা পার হয়ে মথুরায় যেতে পারলো না?

তা নয় রে! প্রেমাভক্তি বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

* এই দেহ হচ্ছে বৃন্দার— বন। আমার আমি যখন নারদ ঋষির মত হবে, অর্থাৎ যখন নারদ ঋষির মত সর্বত্যাগী হতে পারব তখন শ্রীকৃষ্ণ আসবেন— শ্যামলী, ধবলী মধুমঙ্গল ইত্যাদিকে সংগে নিয়ে। অর্থাৎ শ্রীভগবান দেহেতে উদয় হলে বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি আপনা হতে আসবে।

* আজ জন্মাষ্টমী। এই জন্মাষ্টমীর মানে কী জানিস? এই তিথি নক্ষত্রে মানুষের আত্মা-সাক্ষাৎকার হয়।

* 'দাস আমি', 'ভক্তির আমি'— এসব ছাড়াও আছে। 'ভগবান আমি' আছে।

একজন ভক্ত— সে আমি কি আমির মধ্যে পড়ে?

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— হ্যাঁ, তা পড়ে বই কি। তার জীবত্ব তখনও তো রয়েছে। তাকে তো খেতে হয়। সকলে খেলে তো তার খাওয়া হয়ে যায় না। তবে সে আমিটুকু কল্যাণপ্রদ। মানুষের কল্যাণ করার জন্যেই সেই আমিটুকুর অস্তিত্ব।

* শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা, করলে কী হয় জানিস? ব্রহ্মদত্যি হতে হয়। আমাকে দেখিয়েছিল— পৃথিবীর মত এক বিরাট খাঁচা, তার মধ্যে ওরা সব রয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা তারস্বরে চিৎকার করে ডাকছে— 'আমাদের কাছে আসুন, আমাদের কাছে আসুন। আমাদের বেদ বেদান্ত তন্ত্রের কথা শোনান'। আমি বললুম— 'আমি বেদ বেদান্ত জানি না। তবে কথামৃত পড়ি। কথামৃত পড়লেই বেদ বেদান্ত তন্ত্র সব পড়া হয়।' ওরা বলল, তবে তাই শোনান।

* গত নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে অনেক দৈববাণী হয়েছিল। একদিন শুনছি— ''পাশ্চাত্য কাঁদছে। আপনি দয়া করে তাদের বাঁচান।''

দৈববাণী শেষ হল। বসে বসে ভাবতে লাগলুম তাইতো, আমার পরীক্ষার এখনও শেষ নেই! পাশ্চাত্য কেন কাঁদছে? ভগবান, তুমি কাঁদাচ্ছো তাই তারা কাঁদছে। আমার এই দেহটা সেখানে নিয়ে গিয়ে কি হবে? তুমি তো পাহাড়, সমুদ্র, মাটি ফুঁড়ে ওঠো। তুমিই এই রূপ ধরে সেখানে ফুটে ওঠো না। না হয়, পাশ্চাত্যকেই এখানে নিয়ে এসো না!

ওরে, কী হলো জানিস? আমার পরীক্ষা হোল। দেখছে, আমি নাম মান যশ চাই কি না। যদি নাম যশ চাইতুম, আমি সেখানে চলে যেতুম। এই দেহটা সেখানে গেলে তাদেরও দর্শন অনুভূতি শুরু হোত। তারা জিনিসটা

ধরতে চেষ্টা করত, আমায় মাথায় তুলে রাখত। খুব নাম যশ প্রতিষ্ঠা হোত। দেখ্ দেখি—আমার পরীক্ষার এখনও শেষ নেই রে!

* আচার্য কে রে? আচার্য এক ভগবান! তিনিই যে সব। তিনিই বাপ, তিনিই মা, তিনিই বেদ, তিনিই বেদান্ত, তিনিই মন্ত্র, তিনিই সব।

* শিশুকালের এক দর্শনের কথা (পরাবিদ্যা দর্শন) মনে পড়ছে। আমার মাতামহ থাকতেন খিদিরপুরে। পিতামহও থাকতেন খিদিরপুরে। মাতামহ শ্বশুর বাড়ির অনেক সম্পত্তি পেয়েছিলেন, তার মধ্যে একটা খুব বড় পুরানো বাড়ি। তা সে বাড়ি তাঁর পছন্দ হোল না। ধর্মদাস আড্ডির বাড়ির কাছে একটা ফাঁকা জমি পড়ে ছিল। তার একধারে পুরানো একটা রান্নাঘর মতন ছিল। সেইখানে তিনি একটা নতুন বাড়ি করিয়ে নিয়েছিলেন।

আমার তখন বছর চারেক বয়েস। ল্যাংটো হয়ে বেড়াই। ঠিক দুপুর বেলা ..... কট্‌কট্ করছে রোদ্দুর। আমি দেখছি একটি বিধবা স্ত্রীলোক— পিঠে চুলগুলি ফেলা— রান্নাঘরের দিকে ঢুকে গেল। তারপর আমি বাড়ির ভেতর গেলুম। মেয়েরা সব গল্প গুজব করছিল। আমাকে মনক্কা খেতে দিয়েছিল তাও বেশ মনে আছে। ..... তারপর যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি একদিন মেনোর দিদিকে সেই দেখার কথা বলেছিলুম। মেনোর দিদি বললে— 'সে কি রে?' আমার মাতামহের এক মামীশাশুড়ি ওই বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়েছিল। আমি নাকি তাকেই দেখেছিলুম অর্থাৎ ভূত দেখেছিলুম। মেনোর দিদি হচ্ছে ওই বৃহৎ পরিবারের শেষ লোক যে ওই পরিবারের সব ঘটনার কথা জানত। দেখনা, মূর্তিমতী পরাবিদ্যা দেখলুম বছর চারেক বয়েসে। সে কথা মেনোর দিদিকে বললুম যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। কেন? না, আজ ৬৫ বছর বয়সে দর্শনটির প্রকৃত স্বরূপ তোদের বলব বলে।

* ১৯২৬ সালে যখন কাশী যাই তখন একদিন মাত্র বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়েছিলুম। কচুরী গলির ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। খুব ভিড় ছিল। তাই আর কখনও মন্দিরের দিকে পা বাড়াই নি। তবু দেখতুম যখনই বাইরে বেরোতাম তখন আপনা হতেই জপ হোত। অহল্যাবাই

ঘাটে ধ্যান করতে বসতুম, মন আপনা থেকে হুহু করে উঠে যেত। খুব ধ্যান হোত। তখনই বুঝেছিলুম যে স্থানমাহাত্ম্য আছে।

* তোদের হিন্দুধর্মে তো খালি প্রেতকর্ম। অন্নপ্রাশন— তাতে প্রেতকর্ম। উপনয়ন— তাতে প্রেতকর্ম। বিবাহ— তাতে প্রেতকর্ম। শ্রাদ্ধতে তো প্রেতকর্ম আছেই। হিন্দু ধর্মের সব কথা যদি খুলে বলি তবে হিন্দুরা আমায় রাখবে না। এবার আমার ঠাকুরের কথা বলি। ঠাকুর বললেন, শ্রাদ্ধান্ন খেও না। কি হোল? তিনি শ্রাদ্ধ ওঠালেন। বললেন, মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। কি হোলো? এতদিনের গুরুগিরি প্রথা তিনি উচ্ছেদ করলেন। বললেন, সচ্চিদানন্দই গুরু। কি হোলো? ভগবানকে তিনি মানুষের দেহমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন। হিন্দুধর্মের মধ্যে থাকলে জিনিসটা সর্বজনীন হবে কেমন করে? সর্বজনীন না হলে মানুষ একীভূত হবে কেমন করে?

* পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করে দেখ। অবতাররা কী করছেন? না, সকলকে একীভূত করার চেষ্টা করছেন। বুদ্ধ কি করছেন? সকলকে এক করার চেষ্টা করছেন। যীশু কি করছেন? সেও সকলকে এক করার চেষ্টা। মহম্মদ? তাঁরও সকলকে এক করার চেষ্টা। মহাপ্রভু— তিনিও সকলকে এক করার চেষ্টা করছেন। ঠাকুরের বেলায় দেখি— তিনি একটু ঠেক্ খেয়েছেন। তিনি বললেন— মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবান লাভ। বলেই তিনি এক মধ্যমার সৃষ্টি করলেন, বললেন— 'যত মত, তত পথ।'

এবার ইতিহাসের কথা ধরা যাক্। French Revolution-এ কি হোলো? ওদের Slogan হোলো LIBERTY-EQUALITY-FRATERNITY। সকলকে এক করার চেষ্টা। Karl Marx— অর্থনীতির দিক থেকে সকলকে এক করার নতুন কথা লিখলেন। তার পরোক্ষ প্রভাব— ১৯১৭ তে Russian Revolution. এতেও সেই সকলকে এক করার চেষ্টা। কিন্তু কেউ পেরেছে কি?

এতদিনে সেই একীভূত হবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বেদে বলছে— একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। এবার বহু এক হবে। কতদিনে

হবে তা বলা বড় শক্ত। তবে জিনিসটা শুরু হয়েছে— একথা বলা যেতে পারে। .....

* ঠাকুর বললেন,— যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্র কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই? এই ক'টি কথায় অথর্ব বেদ থেকে ঠাকুরের সময় পর্যন্ত যা কিছু কর্মকাণ্ড চলে এসেছে সব তিনি উচ্ছেদ করে দিয়ে গেলেন। কত বড় Revolutionary বল দেখি। কিন্তু শুধু Revolutionary-- নয়। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকে কত সহজ সরল করে দিয়ে যাচ্ছেন। ধর্মকে সাধারণ মানুষের করায়ত্ত করে দিয়ে যাচ্ছেন। কেন? যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্র যদি গেল, তবে রইল কী? ভগবানের নাম। তা সে যে নামেই ডাক না কেন— কালী বল, কৃষ্ণ বল, শিব বল— ঠাকুরের কথায়— সেই তাঁকেই ডাকা হচ্ছে। চোদ্দপুরুষের সংস্কার বশতঃই কেউ কালী বলছে, কেউ কৃষ্ণ বলছে, কেউ শিব বলছে। তা সে যে নামেই ডাকুক না কেন তাঁকে ডাকলেই হ'ল। আহাঃ!

* আমি একদিন পিকাডিলি সার্কাসে (লণ্ডনে) বসে খাচ্ছি। সঙ্গে আছে সেই সিংহ (বিলাতে অবস্থানকালে শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গী শ্রী এস্. বি. সিংহ। তিনি পরবর্তীকালে কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।)। খেতে খেতে নাম করছিলুম আর ভাব হচ্ছিল। তখন সিংহকে বলেছিলুম, দেখো গা, এখানে এই পরিবেশ, এখানেও সাত্ত্বিক লক্ষণ হচ্ছে!

তাই বলছি, ঠাকুর ধর্ম জগতে কী নতুন জিনিস দিয়ে গেছেন দেখ দেখি। ধর্মকে মানুষের মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে গেছেন। সবই দৈব করায়। দেখ্ না, রামপ্রসাদ গান লিখেছিলেন কবে, আর ঠাকুর ধর্মজগতে নতুন জিনিস দিয়ে এঘরে তার ব্যাখ্যা করিয়ে দিলেন। সবই দৈব করায়। রামপ্রসাদ লিখেছেন ঃ—

খাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব
হৃদি পদ্মে বসাইয়ে, মন মানসে পূজিব।

অর্থাৎ জিহ্বায় নাম উচ্চারণ করব, কিন্তু খাব না। 'হৃদি পদ্মে বসাইয়ে' অর্থাৎ মনকে সহস্রারে তুলে মনে মনে তাঁর পূজা করব।

* ধর্মকথা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ কখনও উপমা বা রূপক ব্যবহার করেন নি। তিনি বলতেন ধর্ম কবির কাব্য নয়, সাহিত্যও নয়, ধর্ম অনুভূতিমূলক এবং প্রমাণ সাপেক্ষ। ধর্মের প্রধান উপজীব্য হ'ল মনুষ্যদেহ— জগতের অন্য কোন কিছুর সঙ্গে যার উপমা চলে না। তাই উপমা প্রয়োগ করে তিনি কখনও তাঁর বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেন নি। কিন্তু জনাকীর্ণ ঘরের আবহাওয়া সরস করে তুলতে শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাঝে মাঝে হাসির গল্প বলতেন। এখানে সেইরূপ দুটি গল্প নিবেদন করা যাক।

(১)

কে কার ওস্তাদ?

এক ওস্তাদ ছাত্রকে গান শেখাচ্ছেন। শেখাতে শেখাতে ছাত্রকে বললেন, ''আমি ঠাকুমার কাছে শুনেছি যে আমার যখন কথা ফুটল তখন থেকেই আমি তুম-তা-না-না-তুম-তা-না-না করতে আরম্ভ করেছিলুম''। ছাত্রটিও ছাড়বার পাত্র নয়। সে অমনি বলে উঠল, ''জানেন গুরুজি, আমিও ধাই মার কাছ থেকে শুনেছি যে আমি মায়ের পেট থেকে পড়েই সা রে গা মা পা ধা নি— বলে কেঁদে উঠেছিলুম।

এখন কে কার ওস্তাদ ? .....

(২)

অবতার ভক্ষণ

এক স্কুল বোর্ডিংয়ে থাকতেন স্কুলের এক পণ্ডিত আর এক মৌলবী। দুজনের মধ্যে তো খুব ভাব। একদিন পণ্ডিত মশাই মৌলবী সাহেবের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। মৌলবী সাহেব তখন খেতে বসেছেন। পণ্ডিত মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাচ্ছেন মৌলবী সাহেব?' মৌলবী সাহেব মাছ দিয়ে ভাত খাচ্ছিলেন। মনে মনে ভাবলেন— এবার পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে একটু রহস্য করা যাক। মৎস্যাবতার দশ অবতারের এক অবতার। মৌলবী উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে, অবতার ভক্ষণ হচ্ছে।'

পণ্ডিত মনে মনে ভাবলেন— আচ্ছা, দাঁড়াও দেখাচ্ছি! বরাহ (শূকর) দশ অবতারের তৃতীয় অবতার। পণ্ডিত মশাই রহস্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি? তৃতীয় অবতার খাওয়া হচ্ছে নাকি?' মুসলমানের পক্ষে শূকর মাংস নিষিদ্ধ। পণ্ডিত মশাইয়ের কথা শুনে মৌলবী সাহেব লাফিয়ে উঠে বললেন — আরে, তোবা তোবা তোবা! ...

একাদশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— রবিবার, ১১ই আগস্ট, ১৯৫৭ হইতে ৭ই জুন, ১৯৫৮)

স্থ যীশু বললেন, **Father, thou art in heaven**। মানুষকে আকাশ দেখিয়ে দিলেন। আর ঠাকুর মার্কা দিয়ে বলছেন— অধম ভক্ত বলে— হাই ঈশ্বর, ঈশ্বর ওই দূর আকাশে।

যীশু ভগবান কি না— তোরা জিজ্ঞাসা করছিস্? ভগবান কি করে বলি? তিনি কি এসেছিলেন কতকগুলো ম্যাজিক দেখাতে? এদিকে ঠাকুর বলছেন— অষ্টসিদ্ধির একটিও সিদ্ধি থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

যীশু মানুষকে কী দান করেছেন? এক জায়গায় শুধু দেখি তিনি বলছেন— Be perfect as thy Father in Heaven is perfect, এ একটা vague কথা। যোগের কথা তো নয়।

অবতারদের কার কতদূর সাধন হয়েছে ঠাকুর সব বলে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বলেছেন— কৃষ্ণ রাধাযন্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে সাধন করেছিলেন। রাধাযন্ত্র অর্থাৎ ব্রহ্মযোনী— ষষ্ঠভূমিতে আছে। কুড়িয়ে পাওয়া অর্থাৎ আপনা হতে হওয়া। শ্রীকৃষ্ণের আপনা হতে ষষ্ঠভূমি থেকে সাধন হয়েছিল।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলেছেন, বুদ্ধ— কিনা বোধস্বরূপকে চিন্তা করতে করতে বোধস্বরূপ হয়ে যাওয়া। বোধাতীত অবস্থায় বুদ্ধদেব যেতে পারেননি, অর্থাৎ মহামায়ার এলাকা ছাড়িয়ে যেতে পারেননি— সে কথা বলা হ'ল।

যীশু সম্বন্ধে আমার কেমন একটু খট্‌কা ছিল। ঠাকুর দেখেছিলেন— যীশুর শরীর তাঁর দেহে মিশে গিয়েছিল, আমি দেখেছিলুম যীশুর গলা থেকে মাথা পর্যন্ত। তারপর কথামৃতে পেলুম এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন ঋষি-খৃষ্ট! তখন মনে হ'ল— আরে, ঠাকুর তো যীশুকে ঋষি বলছেন — অর্থাৎ নিগমে চেতন সমাধি হয়েছিল তাঁর।

মহম্মদ সম্বন্ধে বলেছেন— আমি দেখলুম একজন দেড়ে মুসলমান (মহম্মদ) সান্‌কি করে ভাত নিয়ে যাচ্ছে ..... ইত্যাদি। ভাত হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতীক; অর্থাৎ মহম্মদের প্রতীকে ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল।

মহাপ্রভু সম্বন্ধে যখনই কথা উঠেছে সেখানেই ঠাকুর বলেছেন তাঁর প্রেম হয়েছিল। প্রেমের পর বস্তুলাভ। মহাপ্রভুর বস্তুলাভ হয়নি সে কথা বলা হল।

* ঠাকুর বলছেন, বস্তুত ব্রহ্ম বৈ আর কিছু নাই। কিন্তু মায়াতে, অহঙ্কারেতে নানা বস্তু দেখাচ্ছে .....। তার মানে কী? এখানে অহঙ্কার কী? না দেহ। আমি দেহ দিয়ে জগৎকে দেখছি। তাই তার নানা রূপ। কিন্তু আমার স্বরূপ কী? আমি নেতি— নেতি— শুদ্ধাত্মা। আমি দেহ নই, আমি আত্মা, তাই ঠাকুর বলছেন, আগে 'ম' তারপর 'রা'। আগে আত্মা সাক্ষাৎকার, তারপর জগৎ অর্থাৎ সেই আত্মার মধ্যে জগৎ দর্শন। Western Philosopher-রা, এমনকি আমাদের দেশেরও অনেকে বলেন— এই জগৎ অসীম। আত্মার মধ্যেই যে জগৎ— এ নিজের না হলে বোঝা যায় না। তারপর বীজবৎ। যাকে আমি এত বিরাট দেখেছিলুম, তাকে আবার দেখলুম একটা বীজের মত। তারপর সৃষ্টি নাশ। 'মা' সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন'। তারপর নির্গুণ।

আত্মার বরণ, অর্থাৎ ঠাকুরের বেলায় যেমন জ্যোতিদর্শন, এই থেকে আত্মা সাক্ষাৎকার পর্যন্ত সময় লাগে বারো বছর। অর্থাৎ ২৪ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে আত্মা সাক্ষাৎকার। তারপর বেদান্তের সাধন আরও বার বছর। ৩৭ বছর বয়সের সময় বেদান্তের সাধন শেষ হয়। তারপর আরও আছে, এর ইতি নেই।

ঠাকুরের বেলায় জিনিসটা খুব তাড়াতাড়ি হয়েছিল। ৩২/৩৩ বছরের মধ্যে সব শেষ হয়েছিল তাই তাঁর অত কষ্টও হয়েছিল। আর এখন আমরা বুঝতে পারছি যে জিনিসটা full fledged (পূর্ণমাত্রায়) হয়নি।

*** ঠাকুর বলছেন, আমি মালা জপবো? হ্যাক্ থুঃ।** ঠাকুর বললেন বটে, কিন্তু কাজে কী দেখছি? মালা জপা কিনা বৈধী কর্ম। ঠাকুর নিজে কী না করেছেন! গোকুল পুজো থেকে শুরু করে মায় যাবতীয় যা কিছু।

কথামৃতের একটা aspect হলো— all along forecast (বরাবর ভবিষ্যদ্ বাণী) করছে। ঠাকুরকে দেখছি তিনি নিজে সব করেছেন। কিন্তু এখানে? দেখ্, আমি ঠাকুর ছাড়া জীবনে আর কিছু জানি না। কিন্তু সেই ঠাকুরকে আমি কখনও একটা ফুল দিই নি।

*** স্বপ্নে আমাকে এত দেখিস কেন?** আমরা পড়ি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, আলোচনা করি তাঁরই জীবনী, তাঁরই কথার যৌগিক ব্যাখ্যা করি। আর সবার মধ্যে রয়েছে একটা Basic unity— আমরা সকলে তাঁর ভক্ত। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। না, না, ভক্ত বলব না। ওতে অহঙ্কার হয়। আমরা সকলে তাঁর দাসানুদাস। কিন্তু— স্বপ্নের বেলায় তাঁকে না দেখে আমাকে এত দেখিস কেন?

ঠাকুর এখানে যদি কোন নতুন জিনিস সৃষ্টি করে থাকেন তা হচ্ছে— এত লোকের আমাকে দেখা। এ যে কী জিনিস সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারি না। জগতে একেবারে নতুন। এর আগে এমন কখনও হয় নি যে এত লোক একজনকে দেখছে। এ যে কী হচ্ছে তা আমরা কিছু বুঝি না। ব্যাখ্যা দেবার সময় বলছি বটে— বিভুরূপে তিনি সর্বভূতে এক হয়ে আছেন— কিন্তু ওই বলেই সব কথা বোঝান যায় না। গতকাল একজন এসেছিল (হাওড়া মোটর কোম্পানীর শ্রীখগেন চন্দ্রের বন্ধু)। সে তার একটা স্বপ্নের কথা বললে—

'আমি খাটে শুয়ে আছি, আপনি আমার পাশে বসে আছেন। গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, কত আদর করছেন। মাও বুঝি এত আদর করে না।' তারপর বললে, 'আচ্ছা, আমি তো আগে আপনাকে জানতুম না, চিনতুম না,— আপনাকে কী করে দেখলুম?'

আমি আর কি বলবো। বললুম, আমারও তো সেই প্রশ্ন বাবা।

*** একটা প্রবাদ তোরা শুনে এসেছিস— 'কলিতে সব একাকার হয়ে যাবে।'** এই একাকার কথার মানে কী? এক আকার! অর্থাৎ এই সচ্চিদানন্দগুরু সকলের দেহেতে উদয় হবে, অন্তরে সব এক আকার হয়ে যাবে।

আমি এই যে চারদিকে ঘুরে বেড়াই এর একটা উদ্দেশ্য আছে। তোদের কাছে আর বলতে কি? ওতে যার হবার, তার আত্মিক স্ফুরণ হয়ে যাবে। ..... ওরে, এই ঘরের চৌকাঠ যে মাড়িয়েছে তার হবেই হবে।

* কথামৃতে বৈষ্ণবদের গান পড়া হচ্ছিল—

"কে হরিবোল হরিবোল বলিয়ে যায় .....

..... যাদের ন্যাড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা রে।"

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন—

হ্যাঁ রে, তোরা যে আমাকে (স্বপ্নে) দেখিস সে কি আমি? সে ভগবান। তার কি নেড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা? ওরে ভগবান কী কড়ার করেছে যে নেড়া মাথা করা চাই আর বগলে থাকা চাই ছেঁড়া কাঁথা? নিজেরাই নিজেদের contradict করছে। এদিকে মহাপ্রভু বলছেন, কৃষ্ণ কৃপা বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি পায়, আবার ওদিকে নেড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা! এ যে কী anti-vedic (বেদ বিরোধী) কথা তা বলতে পারি না।

কৃষ্ণ কৃপা বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি পায়— মহাপ্রভুর এই কথাই যদি সত্য হয় তবে অত নাচ-গান খোলের দরকার কী? জ্ঞানীর কথা আলাদা। কিন্তু যার জ্ঞান হয় নি? অত নাচা-কোঁদা খোল পেটা, ওতে তো যোগের ব্যাঘাত ঘটে।

*** আমি বলেছিলুম তোদের বোধ হয় মনে আছে যে Paris Conference-এ স্বামীজী impress করতে পারেন নি।** শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে হয়েছিল যে আমি পরাধীন দেশের লোক বলে এরা আমার কথা নিলে না। চৈতন্যদেব কেন পুরীতে ছিলেন তাও তোদেরকে বলেছি। কেন তিনি বৃন্দাবন বা কাশীতে রইলেন না? ওসব জায়গা তখন মুসলমানদের দখলে। তাই তিনি পুরীতে রইলেন।

পরাধীন জাতির brain-এ একটা pressure থাকে। যার যতটুকুই হোক সেখানে একটু minus থাকে (brain-এর একটা portion dormant থাকে)। ওই যে অষ্টাবক্র সংহিতা পড়া হোল— পূর্ণ স্বাধীন অবস্থায় স্ব-স্বরূপ দর্শন হয়। স্বাধীনতায় পরম ব্রহ্ম লাভ হয়। স্বাধীনতায় শান্তি হয়। ওতে সেই কথাই বলা হয়েছে। ওরে ভারতবর্ষ কেন স্বাধীন হয়েছে জানিস্? তা না হলে আমার এই পরমব্রহ্ম অবস্থা হোত না। আমার এই অবস্থা হবার জন্যেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। তার তিন দিন আগে থেকে আমি যে কী ছট্‌ফট্ করেছি কী বলবো। এই তিনটে দিন যেন আমার দেহটা থাকে। নিজেকে বাঁচিয়ে সাবধানে চলি যেন accident না হয়, এমন কিছু না খাই যাতে অসুখ করে। আমি যেন ওই তিনটে দিন বেঁচে থাকি। স্বাধীনতার দিন সকালেও যদি মরি তাতেও শান্তি। কেন যে আমার এত ব্যাকুলতা হয়েছিল তখন বুঝতে পারিনি।

* **ত্যাগ মানে কী?** এই দেহ ত্যাগ। দেহ আত্মা পৃথক হবে তবে ত্যাগ! নুন ত্যাগ করলুম, কি তেল ত্যাগ করলুম, কি পান মাছ ত্যাগ করলুম— ওকি ত্যাগ নাকি?

ধর্ম মানে কি তাই কেউ জানে না। ব্যষ্টির সাধন— ও কি ধর্ম নাকি? ও তো আপ্তসার সাধু।

* ২০০০ বছরের Christian world জানে না ভগবান দর্শন কাকে বলে।

* **There is no compromise in Religion.** আমি চোরও হব— সাধুও হব— এ কখনও হয় না। ধর্মে কখনও রফা চলে না।

* কারো মায়া ত্যাগ হয়েছে কিনা কী করে বুঝবি?

সে কাউকে সঙ্গে রাখবে না, কাউকে না।

* আজকাল কথামৃত পাঠ হয়ে যাবার পর একটা কথা মনে হয়—

করিতে ছেলে খেলা
অবসান হোল বেলা।

দ্বাদশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— রবিবার, ৮ই জুন হইতে
১৯শে জুন, বৃহস্পতিবার, ১৯৫৮ পর্যন্ত)

* ওরে নেত্য, তুই বললি, **স্বপ্নে তুই মন্ত্র পেয়েছিস। সেই মন্ত্র জপ করতে করতে কখন যে 'জীবনকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ' করতে শুরু করেছিস তা তোর খেয়াল নেই।** ওরে দেখ, এক এক সময় আমার কী মনে হয় জানিস? মনে হয়— আমি 'জীবনকেষ্ট, জীবনকেষ্ট,' জপ করি। কিন্তু ঠাকুর এমনই মুখ দিয়েছেন যে সেখানে রামকেষ্ট ছাড়া আর কিছু বেরোবে না।

এখানে আমরা রামকেষ্ট রামকেষ্ট করি, কিন্তু তোরা স্বপ্ন দেখিস জীবনকেষ্টকে। কেন এই রকম হচ্ছে তার সঠিক কোন উত্তর নেই। কেউ বলতে পারে, challenge করতে পারে— you want to thrive at the cost of Ramakrishna। না, আমি তো চাই তারা রামকেষ্টকেই দেখুক, কেন তারা জীবনকেষ্টকে দেখে তা বলতে পারি না।

দেখ, আমি জীবনে এক রামকৃষ্ণকেই জানি। যারা আমার সঙ্গে আগে মিশেছে তারা জানে আমি অন্য কোন মন্দিরে, ঠাকুর প্রতিষ্ঠান, ছবি বা পটের দিকে মাথা নোয়াতুম না, ঘরে অন্য কোন ছবি রাখতুম না, রাখলেই তাদের কাছে মাথা নোয়াতে হবে। আমার ঠাকুরের উপর নিষ্ঠা কমে যাবে। আর, এখন সেই ঠাকুরের কথা, কথামৃতের প্রত্যেকটি লাইন উচ্ছেদ করতে হচ্ছে। আমি করছি না, আমাকে দিয়ে কে যেন করিয়ে নিচ্ছে।

* **ঠাকুর বলছেন, তিনিই (মা-ই) সব হয়েছেন,** একথা যখনই কানে ঢোকে, ছিনিক্ দিয়ে রক্ত মাথায় উঠে যায়। আমি বলি কি? আমিই সব হয়েছি। সবই যে আমি। সু-ও আমি, কু-ও আমি। আমি কু কেন? কু-এর মধ্যেও আনন্দ আছে। সেই আনন্দ উপভোগ করার জন্যে

আমি কু-ও হয়েছি। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের এক স্বরূপ হচ্ছে আনন্দ। তাই কু-ও ব্রহ্মের এক রূপ।

ঠাকুর বলছেন, মা-ই সব হয়েছেন। কিন্তু তিনি মাকে দেখছেন, নিজেকে দেখছেন, সকলকে দেখছেন, তা হলে এক, অভিন্ন অবস্থা তাঁর হয় নি।

ঠাকুরের কাছে যারা যেত তাদেরকে তিনি বলতেন ভক্ত। আমার কি কোন ভক্ত আছে? আমি কী বলি? বলি, আমিই সব হয়েছি। ওই যে তোরা আমাকে দেখিস ও আমিই আমার সঙ্গে রমণ করি। বেদে একেই বলেছে আত্মারাম, তারা অবশ্য ব্যষ্টিতে আত্মারামের কথাই বলেছে, সমষ্টিতে আত্মারাম অবস্থা জগতে এই প্রথম হোল।

একজন নিত্যযাত্রী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, ওরে, কি দরকার ওসব! মিছিমিছি জামাকাপড়গুলো ময়লা করা! তোরা কি আমাকে প্রণাম করছিস? না, আমি আমাকে প্রণাম করছি।

* **কারো সেবা আমার দেহ সহ্য করতে পারে না,** কেউ বলতে পারে, মশাই, আপনাকে দেহের মধ্যে দেখেছি, আপনার সঙ্গে আমরা এক হয়েছি, তবে সেবা করতে দোষ কি? সে কথা ঠিক বটে, কিন্তু তোরা খেলে যখন আমার পেট ভরে না, আমি খেলে যখন তোদের পেট ভরে না, তখন আর কাজ নেই। চণ্ডীদাস, রহ দূরে।

* **ঠাকুর বলছেন, ব্যাকুলতা হলে অরুণ উদয় হয়।** ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে পারলে তাঁর দর্শন হয়। হ্যাঁরে, গোপাল, তুই কি আগে ব্যাকুল হয়েছিলি, তারপর এখানে এসেছিলি? ঠাকুর মুখ ঘসড়াচ্ছেন, কাঁদছেন আর বলছেন, মা, রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলি, আমায় দেখা দিবি না মা? আর দেখ, ভগবানকে দেখার জন্যে যে কাঁদতে হয় তাই আমি জানতুম না।

* কথামৃতে ঠাকুরের কথা পড়া হচ্ছে, **'নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয় তাই চিনতে পারা কঠিন, মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখনও বা ভয় ঠিক মানুষের মত।'** (৪র্থ ভাগ, ৮—৩)

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, দেখছিস, ঠাকুর বলছেন যে অবতারেরও ভয় থাকে, তাহলে তিনি ভয়শূন্য হ'তে পারেন নি। আর এখানে? চার মাস তো ঘর বন্ধ হোল। (১৯৫৭, অক্টোবর থেকে ১৯৫৮, জানুয়ারী কথামৃত পাঠ ও ভক্তসঙ্গ বন্ধ ছিল) তখন খালি অভয়কে (অভয় নামে এক সঙ্গকারীকে) দেখতে লাগলুম। তারপর মাষ্টার মশাইয়ের একটা বইয়ে দেখলুম লেখা রয়েছে, 'অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তো'সি', অর্থাৎ জনক তুমি অভয় লাভ করেছ। মাষ্টার মশাই ওইটুকু কেবল লিখে গেছেন, ব্যাখ্যা কিছু করেন নি। তারপর একদিন সুধীন এলো, উদ্বোধনে কার একটা লেখা বেরিয়েছে সেটা নিয়ে, সে কোথা থেকে Quote করেছে তা অবশ্য দেওয়া ছিল না। সে লিখেছে, মানুষ যখন একা হয়, যখন ভূতে ভূতে নিজেকে দেখতে থাকে, তখন তার ভয় থাকে না। সে 'অভীঃ' হয়। আমি পড়েই বুঝে নিয়েছিলুম।

* **ঠাকুর বলছেন, 'আমি সকলকে নিজের নিজের ভাব নিয়ে থাকতে বলি',** অর্থাৎ খৃষ্টানকে খৃষ্টের ভাবে, বৌদ্ধকে বুদ্ধের ভাবে, মুসলমানকে মহম্মদের ভাবে, শৈবকে শিবের ভাব নিয়ে থাকতে বলছেন। আর আমি কী করি? আমি সকলকে আমার ভাবে টেনে নিই। হিন্দু হোক্, মুসলমান হোক্, খৃষ্টান হোক্, পার্শী হোক্, সকলে আমাকে দেখে অর্থাৎ তাদের আমি আমার মধ্যে টেনে নিই। ঠাকুর ছেড়ে দিলেন। আর আমি টেনে ধরলুম কেন? জিনিসটা খোলাখুলিই বলি— তাঁর শক্তির অভাব।

* **ঠাকুরের ওই যে বাঘের গল্প— একটা বাঘের বাচ্চা ছাগলের পালে ছাগলেরই মত দিন কাটাচ্ছিল, একটা বুনো বাঘ এসে স্বস্বরূপ দেখালে—** ও গল্প সাংখ্য থেকে নেওয়া। ওখানে দুটো আত্মার কথা রয়েছে— একটা ঘাসখেকো বাঘের আর একটা বুনো বাঘের, ওসব টেকে না।

আত্মা এক, তাই আত্মা একযুগে একটি আধারেই সংকলিত হয়। এই জিনিসটাকেই তোদের পুরাণে বলেছে, কৃষ্ণ ব্রজের মাখন চুরি করে খেয়েছিল।

ঠাকুর বলছেন, ভগবান গুরুরূপে এসে স্বস্বরূপকে জানিয়ে দেন।

তোরা যে আমাকে দেখিস ওতে কী হচ্ছে? তোদের স্বস্বরূপ দর্শন হচ্ছে। ভগবান, গুরু, স্বস্বরূপ তোদের সব একসঙ্গে হচ্ছে।

* **তোদের এখন উত্তম আধার হয়েছে, তোরা উত্তম অধিকারী হয়েছিস, শুনলেই তোদের হয়ে যাবে**। বশিষ্ঠমুনি পড়তেন আর রামচন্দ্র শুনতেন। শুনে শুনেই রামচন্দ্রের জ্ঞান হয়েছিল, এখানে তোদের ওই শুনে শুনেই সাধন হচ্ছে।

তোদের সকলের অদ্ভুত শক্তি হয়েছে, তোরা সকলে ব্রহ্ম হয়েছিস। এখন প্রশ্ন উঠবে, মশাই, আমরা তো দিব্বি খাচ্ছি দাচ্ছি, কাজ কর্ম করছি তবে আবার ব্রহ্ম কি? দেখ, খাওয়া দাওয়া, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নেই, আত্মিক জীবনে তোরা ব্রহ্ম হয়েছিস।

* **বেদান্তের অদ্বৈতজ্ঞানের যে কথা এ পর্যন্ত বলা হয়েছে তা হচ্ছে কল্পনা**। অদ্বৈতজ্ঞানের কথা এক এখানেই ফুটেছে, জগতকে নিয়ে যে সত্য তাই সত্য, তা না হলে তার কোন মূল্য নেই।

* **স্বামীজির লেখা কেন অত পড়ি জানিস?** তিনি খুব সংস্কৃত জানতেন। He was an intellectual digest. তাঁর লেখার মধ্যে বেদের যুগ থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত ধর্মজগতের বেশ একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। তাই তাঁর লেখা অত পড়ি।

* **মেয়েদের গতি ওই ষষ্ঠভূমি পর্যন্ত**। ষষ্ঠভূমি পর্যন্তও বড় একটা যায় না। পঞ্চমভূমিতেই শেষ, তবে ঠাকুরের সময়ের গোপালের মায়ের গোপাল আর পুরাণকারের কৃষ্ণকোলে মা যশোমতী, এই থেকে বুঝতে পারা যায় ওদের maximum ওই ষষ্ঠভূমি পর্যন্ত।

শিববাবু— কেন, গৌরী মা?

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— কেন তোলেন গৌরী মার কথা! ওরা সব ঠাকুরের আশ্রিত। দেখুন মেয়েছেলেদের ভক্তির maximum ধরে নিয়েই তিনি (ঠাকুর) বলছেন, 'হাজার ভক্ত হলেও মেয়েমানুষকে বেশীক্ষণ কাছে বসতে দিই না, একটু পরে বলি— ঠাকুর দেখগে যাও, তাতেও যদি না ওঠে তামাক খাবার

নাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি।' কোথায় গেল আপনার গোলাপ মা, গোপালের মা, লক্ষ্মীদিদি আর মা ঠাকরুণ।

* **খুব নীচুতে এক রকম পরমহংস অবস্থা আছে**। কথা বলছে, তার মধ্যেই হয়ত হো হো করে হেসে ফেললে, আবার কিছুক্ষণ পরে হয়ত কেঁদে ফেললে, হাসা, কাঁদা দুই তার কাছে সমান বলে বোধ হয়। আমার এক সময় এই রকম অবস্থা হয়েছিল। কথা বলতে বলতে অনেক সময় ওইরকম হোত।

* **যদি আপনা থেকে হয় তবেই হোল তা নইলে নয়**, গুরুকে দশ হাজার টাকা দক্ষিণা দিলেও হবে না, আর মঠে একলাখ টাকা দান করলেও কিছু হবে না। যদি হবার হয়, আপনা থেকে হবে, তা নইলে নয়।

* **ঠাকুর বলছেন, মহামায়ার মায়া কি দেখালে, একটা ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু বাড়তে বাড়তে জগতটাকে ঢেকে ফেললে**। এসব কথা কেউ বুঝতে পারে না। দুঃখ কী জান? ঠাকুর বিশ্বরূপের কথাও বলেছেন, কিন্তু সব টুকু টুকু। তাইতো আগে বলতুম— আমায় কি কালাপাহাড় করবে?— সব ভেঙে চুর-মার করাবে? এখন দেখছি আমি actually তাই, but not in that sense. এক এক সময় মনে হয় দরকার নেই আমার পরমব্রহ্মে, দরকার নেই অন্য কোন কিছুতে, আমি আমার ঠাকুরকে নিয়ে থাকি।

* **এতদিন বলেছি সচ্চিদানন্দগুরু, এখন দেখছি এ সচ্চিদানন্দ গুরুটুরু তো নয়, এ হচ্ছে পরমব্রহ্ম**। এর জন্যে সংস্কার, প্রারব্ধ, প্রাক্তন এ সবের কোন দরকার হচ্ছে না। ঠাকুর বলছেন, কাঁচে কালি লাগান থাকলে তবে ছবি ওঠে, তা হলে ছবি তোলার জন্যে একজন লোকের দরকার হচ্ছে, কিন্তু যারা আমায় না দেখে দেখছে (স্বপ্নে)? কেউ আমায় দেখছে পঞ্চাশ বছর আগে, কেউ পঁচিশ বছর আগে, কেউ দশ বছর আগে, তাদের বেলায়?

কী বোঝাচ্ছে জান?— আমি জন্ম থেকেই বিশ্বব্যাপী।

ত্রয়োদশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— শনিবার ২১শে জুন হইতে
শুক্রবার, ১০ই জুলাই, ১৯৫৮ পর্যন্ত)

* গত বৃহস্পতিবার, ১৯শে জুন রেল অফিসের কালীবাবুর দাদা **শৈলবাবু স্বপ্নে দর্শন করেছেন— সূর্যমণ্ডলের মধ্যে শ্রীজীবনকৃষ্ণ**। সুধীনবাবু ঈশোপনিষদ থেকে আলোচ্য অংশটি পড়ে শোনালেন, পরে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন—

কী অদ্ভুত স্বপ্ন তুই দেখেছিস শৈল! ঈশোপনিষদে কী লেখা রয়েছে শুনলি তো! সূর্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ হচ্ছেন ব্রহ্ম। আর তুই তাকে দেখেছিস, অর্থাৎ তুইও ব্রহ্মে পরিবর্তিত হয়েছিস। একথা তো আমি ক'দিন ধরেই বলছি। ঈশোপনিষদ লেখার কত হাজার বছর আগে তাদের এই দর্শন হয়েছিল, তারপর তাদের এই দর্শনের কথা শ্রুতি হিসাবে চলে এসেছে। আবার এই উপনিষদ যখন লেখা হয়েছে তারও কত হাজার বছর পরে আমাদের এখানে সেই কথা পড়া হচ্ছে। তবে তারা সূর্যমণ্ডলের মধ্যে কী দেখেছিল তা তো কিছু বলে যেতে পারেনি। এখানে যেমন তোরা আমার রূপ দেখেছিস, তারা কি দেখেছে তা তো তারা বলতে পারেনি।

বঙ্কিমবাবু— তারা আপনার এই রূপই দেখেছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— দৈব আপনার মুখ দিয়ে এই কথা বলিয়ে নিয়েছে। আমি জানতুম— তারা এই রূপই দেখেছে।..... (সকলে স্তম্ভিত)

আমি জানতুম— সূর্যমণ্ডলের মধ্যে আমার এই রূপ, আমার মূর্তি আছে। সে রূপ তো বদলাবার নয়, অপরিবর্তনীয়। বঙ্কিমবাবু ঠিক ধরেছেন যে এই রূপই তারা দেখেছে। কিন্তু বেদে যা লেখা হয়েছে তা হচ্ছে বাইরের জিনিষের কথা, মানুষ ভাববে আকাশের সূর্যের মধ্যে ওই রূপ বুঝি দেখা যায়, তাই তো তারা ত্রাটক করে। সূর্যমণ্ডলের ওই পুরুষকে দেখার জন্য সারাদিন, সূর্য ওঠার সময় থেকে সূর্যের দিকে চেয়ে বসে থাকে যদি কোন ফাঁকে সেই পুরুষ পালিয়ে যায়। কিন্তু ওইভাবে ত্রাটক করতে গিয়ে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, fixed eye হয়ে

যায়। ঠাকুরও ওই রকম ত্রাটক করেছিলেন। তাঁর প্রায় মাস ছ'য়েকের জন্য ওই রকম fixed eye হয়ে গিয়েছিল।

জিনিসটার তফাৎ দেখ, শৈল দেখেছে স্বপ্নে— জ্ঞানসূর্যের মধ্যে আমার রূপ। আর ঈশোপনিষদ বলছে বাইরের সূর্যের মধ্যে মূর্তির কথা যা দেখা যায় না।

দেখ, আমি তো এসব বই (উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থ) পড়তুম না, এসব বই কেন এখানে এসেছে বলি শোন। প্রমাণ হচ্ছে তিন রকম— আনুমানিক, আগম আর প্রত্যক্ষ। আগম প্রমাণ হচ্ছে ঋষি বা মহাপুরুষরা যা বলে গেছেন তাকেই প্রমাণ বলে মেনে নেওয়া, আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে অনুভূতিমূলক। তোদের প্রমাণ হোল প্রত্যক্ষ। তোরা নিজেরা অনুভূতি করলি সূর্যমণ্ডলের মধ্যে আমার রূপ। এখন শুনছি যে ১২/১৩ জনের এই রকম দর্শন হয়েছে, বেদের আগম প্রমাণের সঙ্গে তোদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলিয়ে নেবার জন্যেই এইসব বই এসেছে।

যেদিন তোরা সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে দর্শন করেছিস সেদিন থেকে তোদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, তারপরে তোদের নিম্নাঙ্গের অনুভূতি হয়েছে। ঠাকুরও সে কথা বলে যাচ্ছেন— লাউ কুমড়োর আগে ফল, তারপর ফুল। বেদ বেদান্ত তন্ত্রের সাধনে আগে ফুল। ফুল কিসের? ব্রহ্মজ্ঞানের ফল ফলাবার জন্য। সেই ফল তোদের ফলেছে যেদিন তোরা আমাকে দেখেছিস!

মানুষের স্বস্বরূপ কী বল দেখি? সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের রূপই হচ্ছে মানুষের স্বস্বরূপ। আত্মাকে অনেক সময় স্বস্বরূপ বলা হয়। কিন্তু আত্মাসাক্ষাৎকারের সময় কেউ বলে দেয় না যে ওই আত্মাই মানুষের স্বস্বরূপ। তাই ও হচ্ছে বিচারাত্মক। এই সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের ছাঁচ নিয়েই মানুষটা জন্মায়, প্রমাণ? প্রমাণ ওই যে বৌমা (জিতেন বাবুর স্ত্রী) আট বছর বয়সে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, তখন তো আমাকে দেখেওনি আর আমার কথা শোনেওনি। আমার যখন পনেরো বছর বয়স তখন থেকে লোকে আমায় দেখছে। কেন এই রকম দেখে? সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের রূপই মানুষের স্বস্বরূপ, আর ওই রূপের ছাঁচ নিয়েই মানুষটা জন্মায়, তাই।

পরকাল কী বল দেখি? তোরা সবাই জানিস, বল না। যে দিন থেকে তোরা সূর্যমণ্ডলের আদি পুরুষকে দেখেছিস, যে দিন তোরা তার সঙ্গে এক হয়েছিস— সে দিন থেকে তোরা পরকালের লোক। ইহলোকে থেকে, বেঁচে থেকে তোরা পরকালের আনন্দ ভোগ করছিস। জীবন্মুক্ত অবস্থায় তোরা পরকালের অনুভূতি বল, আশীর্বাদ বল লাভ করেছিস। জীবদ্দশাতেই সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের সঙ্গে এক হয়ে তোরা পরকালের আনন্দ ভোগ করছিস।

* **ঠাকুরের ধর্ম কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। ঠাকুর বলছেন, 'কামিনী কাঞ্চনই সংসার, এরই নাম মায়া! ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে দেয় না।'** কাঞ্চন— তোদের সকলেরই আছে আর কামিনীও তোদের বেশীর ভাগ লোকেরই রয়েছে। আচ্ছা, তোরাই বল— কামিনী-কাঞ্চন থাকলে ধর্ম হয় কি না? হ্যাঁ, হয়। প্রমাণ? প্রমাণ তোদের জীবন। তোদের জীবনই প্রমাণ যে কামিনী-কাঞ্চন থাকলেও ধর্ম হয়। যে দিন তোরা সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে দর্শন করেছিস, সে দিন থেকেই তোদের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হয়ে গিয়েছে। তবে বলবি সংসার যে রয়েছে? সে 'মায়ার' খেলায় আপনা হতে চলেছে।

খগেনবাবু—আমাদের সংসার থেকেও নেই।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— বাঃ, কি চমৎকার কথা তুই বললি। তোদের সংসার থেকেও নেই। ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে কিনা তাই এমন কথা মুখ দিয়ে বের হল। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হয়ে ঈশ্বরলাভ— এ তোদের হয়নি। তোদের হয়েছে— পরমব্রহ্ম লাভ হয়ে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। কথামৃতের ধর্ম তোদের হয়নি। ভারতবর্ষের পুরাতন যা কিছু ধর্ম, ভারতবর্ষের ধর্ম কেন জগতের ধর্ম এক দিকে আর তোদের ধর্ম আর এক দিকে। এ এমন এক নূতন জিনিস হয়েছে যার অর্থ আমরা এখনও কিছু বুঝিনি।

* **তোদের ধর্ম কী বল দেখি?** তোদের ধর্ম হোল একজনকে দেখা। শুধু আমাকে দেখা— ব্যস, আর কিছু না। এ কি বল দেখি? বৃদ্ধ দেখছে, প্রৌঢ় দেখছে, তোরা দেখছিস, ঘরে বৌমারা দেখছে, মেয়েরা দেখছে, মায় শিশুরা পর্যন্ত। আমাকে দেখে দেখছে, না দেখে দেখছে। এ কথা কোন শাস্ত্রে, কোন ধর্মগ্রন্থে পেয়েছিস কি? পৃথিবীর কোথাও এমন

একজনকে দেখার কথা পড়েছিস কি? তোরা তো সব অনেক লেখাপড়া করেছিস, বল না কিছু, শুনি।

তোদের continually hammer করছি— যদি তোদের কাছ থেকে কোন কিছু পাই। সেই ৪ঠা জুন তোদের কাছে যে প্রশ্ন করেছি যে জীবনকেষ্টকে কেন দেখিস— সেই প্রশ্ন আজও রয়েছে, কোন মীমাংসা হয়নি। ১৭ বছর ধরে চুপ করে বসে বসে সব দেখেছি। আমার চোখের ওপর সব হয়ে চলেছে— আমি দূর দূর করে সব উড়িয়ে দিয়েছি। দূর্ দূর্ করা মানে কি জানিস? নেতি-নেতি! আমি নেতি নেতি করে সব উড়িয়ে দিয়েছি কিন্তু এখন এই জিনিষটা ধরা পড়েছে।

* **ব্রহ্মজ্ঞানের মানে কী?** সকলে এক হয়ে যাওয়া। ব্রহ্মজ্ঞানের এই মানে আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। জগতে এত বিভিন্নতা, বিভেদ কেন? এই একত্বের অভাব বলে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী— এত বিভাগ কেন? সেও ওই একত্ব ছিল না বলে। ওসব কিছু থাকবে না বাবা। মন্দির মসজিদ ওসব কিছু থাকবে না। মানুষ দেহ মন্দিরে যখন ভগবানকে পাবে তখন আপনা থেকে ওসব উঠে যাবে।

বেদের 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' ও হচ্ছে fathership and sonship-এর কথা, ওতে ওজনে কম পড়ে, ওর চেয়ে 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' অনেক উঁচু কথা, আবার তার চেয়েও উঁচু কথা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'।

* **ধর্মজগতের কথা বোঝাতে গিয়ে কেউ যখন আর এগিয়ে যেতে পারছে না তখন সে নিয়মের দোহাই পাড়ে।** Literature-এও নাট্যকার ও সাহিত্যিকরা ঠিক এই রকম technique এর আশ্রয় নেয়। Russian writer টুর্গেনিভের একটা বই পড়েছিলুম, দুটি বন্ধুর একজন খুব intelligent। ব্যাঙ্ কেটে পরীক্ষা করে দেখে। অর্থাৎ লেখক বোঝাতে চাইছেন যে তার scientific brain। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখলুম লেখক শেষ পর্যন্ত তাকে মেরে ফেললে, অর্থাৎ সেই ছেলেটির brain-এ এত progressive change দেখান হয়েছে যে তার আর adjustment করা গেল না; তাই তাকে মেরে ফেলা হলো। Practical world-এ এসেও আমরা একই জিনিস

দেখতে পাই। Afgan king আমানুল্লা তো ভালই করছিলেন, তবু প্রজারা তাকে মানতে চাইল না। কেন? অর্থাৎ তার brain-এর অত change তারা সহ্য করতে পারল না। ধর্মতত্ত্বের কথা বোঝাতে গিয়েও ঠিক এইরকম art-এর আশ্রয় নেয়। যখনই আর বোঝাতে পারছে না তখনই নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলে কাটাতে চেষ্টা করে। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের কোন কথাই যে বলা চলে না, নির্গুণের সঙ্গে আলাপ চলে না।

* **ঠাকুর বলছেন, মনই কখনও কখনও গুরু হয়,** কিন্তু ওতে গোলমাল থাকতে পারে। ঠাকুরের মন তো গুরু হোল, মায়ের কাছে চললেন অধর সেনের চাকরীর কথা বলতে, মা বললেন, হয়ে যাবে। কিন্তু অধর সেনের সে চাকরী হোল না, তখন ঠাকুর বললেন— মহামায়ার রাজ্যে বড় হিজিবিজি। ঠাকুরের শুদ্ধ মনে গোলমাল কেন?

আর আমার গুরু কে বাবা? আগমে আমার গুরু ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ)। সে কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তিনিই আমাকে ভগবান দর্শন করিয়ে দিয়েছেন। তারপর অবশ্য তাঁকে কখনও কখনও দেখেছি, কিন্তু দেহের একটা না একটা খুঁত নিয়ে তিনি দেখা দিয়েছেন। নিগমে আমার গুরু কে বল দেখি? আমার গুরু তোরা, হ্যাঁরে তোরা। তোরা যদি না আসতিস আমি তো আমার আনন্দ নিয়ে ব্যোম্ হয়ে থাকতুম। তোরা এলি, বললি যে তোরা আমাকে দেখিস, তবেই তো জিনিসটা জোর ধরল। আমার তো অভাবমুখ চৈতন্য নিয়েই জন্ম। আমি তো কিছু ধরতে পারতুম না। তোরাই আমাকে জ্ঞান দান করেছিস, তাই তোরাই আমার গুরু।

* **পঞ্চভূত আশ্রয় করার আগে তোরা আমাতেই ছিলি, তোরা জন্মাস নি, আমিই জন্মেছি।**

চর্তুদশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— শনিবার, ১১ই জুলাই হইতে
মঙ্গলবার, ১৫ই জুলাই, ১৯৫৮ পর্যন্ত)

* **ঠাকুর বলছেন, সুবুদ্ধি তিনিই দেন, কুবুদ্ধিও তিনিই দেন।** এ কথা শুনলে মনে হয় যেন ভগবান বসে বসে একদিকে কাউকে সুবুদ্ধি দিচ্ছেন, আর এক দিকে কাউকে আবার কুবুদ্ধি দিচ্ছেন। না, জিনিষটা automatically হয়। সুবুদ্ধিও আপনা থেকে হয়, কুবুদ্ধিও আপনা থেকেই হয়।

* **ঠাকুর বললেন, ঈশ্বরবস্তু কি সব আধারে ধারণা হয়?** তা হলে তিনি করলেন কি? তাঁর কাছে যে মানুষ করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল, তাদেরকে তিনি কী দিলেন? নারায়ণ শাস্ত্রী তিন বছর ঠাকুরের কাছে ছিলেন। তখন তখন ব্যাখ্যা দিয়েছি যে ঠাকুর অপেক্ষা করেছিলেন, দেখছিলেন যে তার দেহেতে সচ্চিদানন্দগুরু উদয় হয় কি না। কিন্তু নারায়ণ শাস্ত্রীর যে কিছু হোল না, দোষ তো নারায়ণ শাস্ত্রীর নয়। ঠাকুর তার জন্য কী করলেন? তার দেহেতে যে কিছু ফুটলো না তার কারণ আচার্যের শক্তির অভাব, নয় কী? আর এখানে কি হয়েছে দেখ, সৎ অসৎ চোর জোচ্চোর যে আসছে তারই হচ্ছে। এখানে তোদের ঈশ্বর বস্তু নয়, পরমব্রহ্ম লাভ হয়েছে।

* **ঠাকুর বলছেন, বস্তু এক নাম আলাদা।** সকলেই এক জিনিষকে চাইছে, তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। সকলে এক বস্তুকে চাইছে কোথায়? খৃষ্টানরা চাইছে যীশুকে, বৌদ্ধরা চাইছে বুদ্ধকে, মুসলমানরা চাইছে মহম্মদকে, এতো এক জিনিস চাওয়া নয়। দেখছিস এসব কথার মধ্যে ভয়ানক গোলমাল।

* **ঠাকুর বললেন, প্রেম ভক্তিই সার।** সাধারণ লোক প্রেমভক্তি কি বুঝবে? তারা কিছুই বুঝবে না। এদিকে ঠাকুরই বলে যাচ্ছেন, যাকে দেখবিনি তাকে ভালবাসবি কী করে? প্রেম-ভক্তি কখন? মানুষটার যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় তখন। তখন তার সত্যিকারের দাস ভাব আসে। সে তখন কাঁচা গোল্লা নিয়ে ঠাকুরকে খাওয়াতে যাবে না। সে ভাববে— আরে, ঠাকুরই যে আমাকে খাওয়াচ্ছেন, আমি আবার ঠাকুরকে খাওয়াব কি?

* **কথামৃত পাঠ চলছিল। এই অধ্যায়ে ক্রমাগত কামিনী সংসর্গ**

ত্যাগের কথা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মেয়েদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিচ্ছেন, মেয়েদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে বলছেন, তা না হলে কিছু হবে না। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলে উঠলেন, ওরে থাম তো। বামুন বড় বাড়াবাড়ি করছে, বামুনের কথা একটু বিচার করি। বেশী কিছু বলবো না, বলতে নাই। তোদের বাড়িতে তো বৌমারা রয়েছে, তোদের হচ্ছে কী করে? কামিনী যদি ত্যাগই করতে হয় তবে তোদের হচ্ছে কী করে! কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে 'জয় গুরু! জয় গুরু!' বলে বললেন—

'এ বড় কঠিন ঠাঁই
গুরু শিষ্যে দেখা নাই।'— এ ঠিক তাই!

কথামৃত পাঠ আর ভাল লাগে না। কথামৃত নিয়েই জীবন কাটালুম, আর এখন এর প্রত্যেকটি কথা উচ্ছেদ করতে হচ্ছে। আমি করছি না, আমাকে দিয়ে কে যেন করাচ্ছে।

এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে .....

এখন কী নিয়ে দিন কাটাই? অবস্থা বদলাচ্ছে। কিছু বলতে ইচ্ছে আর হয় না। তোদের আর কিছু না বললেও হবে, আপনা থেকে হবে। এক এক সময় একটা experiment করতে ইচ্ছা হয়। তোদের সব ছাড়িয়ে এখানে বসিয়ে রেখে দিতে পারি। কী দরকার? আপনা হতে হচ্ছে হোক না। আর তা হলে কী হবে জানিস? প্রথমতঃ— তোদের সংস্পর্শে এসে অনেকের হচ্ছে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। আর খানিকটা Old School-এর মঠ মিশন হয়ে দাঁড়াবে। কী দরকার? আপনা হতে হচ্ছে হোক না।

*** ধর্মজগতের পুরানো যা কিছু, ঠাকুর তাকে একটি বেষ্টনী দিয়ে নিজে দাঁড়িয়েছেন তার দরজায়, আর আমাদের ঠেলে দিয়েছেন তার বাইরে।** আমরা পুরানো ধর্মজগতকে দেখছি ঠাকুরের মধ্যে দিয়ে। কেন তিনি আমাদের বাইরে ঠেলে দিয়েছেন? পুরানো জিনিসের আর দরকার নেই তাই। তিনি নিজেই সে কথা বলে যাচ্ছেন। নবাবী আমলের টাকা বাদশাহী আমলে চলে

না;— তোমাদের 'আপো ধন্যন্যাঃ' ওসব অত বলতে হবে না,— তোমরা লেজামুড়ো বাদ দিয়ে বলবে ইত্যাদি। পুরানো জিনিষকে বেষ্টনী দিয়ে তিনি করলেন কী? বললেন— মানুষ কখনও গুরু হতে পারেনা। এই কথা বলে বুদ্ধের সময় থেকে অর্থাৎ আড়াই হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে যে গুরুগিরি চলে এসেছে তাকে উচ্ছেদ করলেন। তিনি বললেন— সচ্চিদানন্দই গুরু। সচ্চিদানন্দ কথার এক মানে ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সকলের মধ্যে গুরু হয়ে আছেন। কেবল কাল প্রতীক্ষা করছে, সময় পেলেই ফুটে উঠবে। উপনিষদে আছে স্বপ্নে যে পুরুষ কথা কয় সে হোল ব্রহ্ম। স্বপ্নে তোরা আমার অনেক কথাই তো শুনিস। সে তা হলে কী? ব্রহ্ম!

সুধীন (শ্রীসুধীন্দ্র নাথ সিংহ) যখন প্রথম এলো তাকে একদিন বলেছিলুম যে শঙ্কর মালাবার পাহাড়ের গুহায় সাধনা করতেন। সেখানে গৌড়পাদ তাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। গৌড়পাদ ছিলেন শঙ্করের সচ্চিদানন্দগুরু। কিন্তু শঙ্কর জানতেন না যে গৌড়পাদের মূর্তি তাঁরই দেহ থেকে বের হ'ত।

*** এ রথে যাব না ভাই, উল্টো রথে যাব।**
ভাই বোনেতে যুক্তি করে কাঁঠাল কিনে খাব।

তোরা বলবি এসব কথা এখানে উঠল কেমন করে? হ্যাঁরে বাবা। আমরা যে কাঁঠাল খাচ্ছি। দেহস্থ চৈতন্যকে নিংড়ে তার রস খাচ্ছি।

*** নাথবাবু (শ্রীপরিতোষ নাথ) Life of St. Paul বইখানি এনে দিয়েছেন। জেরুজালেমের মন্দিরের বর্ণনা শ্রীজীবনকৃষ্ণ নিজে পড়ে শোনালেন।** মন্দিরে প্রবেশ দ্বারের প্রাচীরের গায়ে একখানি ঘর। তারপর কিছুটা উন্মুক্ত প্রান্তরের পর মূল মন্দির। অতি ভক্তিমতী মেয়েদেরও মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না। তারা বড় জোর প্রাচীরের গায়ে ওই ঘরখানিতে প্রবেশ করতে পারতো। মন্দিরের মধ্যে ঢোকবার অধিকার ছিল কেবল পুরুষদের। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, কী আশ্চর্য! তোরা মেয়েদের নারায়ণ পুজো করতে দিস না। ইহুদীদের মধ্যেও দেখছি এইরকম প্রথাই প্রচলিত ছিল। কতদিন ধরে এই প্রথা চলে এসেছে কে জানে।

মেয়েদের সাধন ষষ্ঠভূমি পর্যন্ত। তা বলে সপ্তমভূমির অনুভূতি যে হবে না তা নয়। সপ্তমভূমির অনুভূতি বা সমাধি পর্যন্ত তো বাড়ির মেয়েদের হচ্ছে। কোষ চাপা দিয়ে ওসব হচ্ছে। তা বলে আত্মা সাক্ষাৎকার ওদের হবে না। কোনও দিক দিয়ে যাবার উপায় নেই বাবা। যারা বায়োলজি পড়েছে তারা জানে যে পুরুষদের ব্রেণ-এর ওজন ৭/০ আউন্স আর মেয়েদের ব্রেণ-এর ওজন ৬/০ আউন্স। মেয়ে হলে মায়ের স্তনে যে দুধ আসে ছেলে হলে তার চেয়ে দুধ আসে অনেক বেশী। কোনও দিক দিয়েই যাবার উপায় নেই রে।

* **কথামৃত পাঠ হচ্ছে। বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে মীরাবাইয়ের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ বর্ণনা চলছে।** সনাতন গোস্বামী মীরাবাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে না চাওয়ায় মীরাবাই বলে পাঠালেন— বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। গোস্বামী প্রবরের পুরুষ অভিমান কি ঠিক হয়েছে? শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, আমি হলে কী বলতুম জানিস? বলতুম— দেখ গা, তুমি ঘরের বউ, বাড়ি গিয়ে হাঁড়ি ধরগে। খঞ্জনী বাজিয়ে জীবোদ্ধার করতে বেরোবার তোমার কী দরকার। যদি সাধন ভজনই উদ্দেশ্য হয়, তবে ঘরে বসে গোপনে সাধন ভজন করগে, যেন কাকপক্ষী টের না পায়।

* **শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেণ্ট্ পল্-এর বাল্য জীবন পড়ে শোনালেন।** ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ধর্মের দিকে মন। কিন্তু তখন নিয়ম ছিল যে আচার্যেরা কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে না, নিজেদের জীবিকা নিজেরা উপার্জন করবে। অবসর সময়ে তারা ধর্মশিক্ষা দেবে। তাই সেণ্ট্ পল্ যাতে উপার্জনক্ষম হতে পারেন তার জন্যে তাঁর বাবা তাঁকে তাঁত বোনা শেখাতে লাগলেন। পাঠ শেষে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, তোদের এই কথা শোনবার জন্যেই বোধ হয় Life of St. Paul বইখানা এসেছে। আচার্যেরা যে কারো কাছ থেকে কিছু নেবে না। তারা নিজেরা খেটে খাবে, এ কথা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সে কথা এখানে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই তো তোদের বলি— তোরা সৎ পথে খেটে খেয়ে ধর্ম কর।

* **কথামৃতে ওই ঘটি-বাটির কথা পড়া হতে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল।** আমার ঠাকুরদার এগারো জন চাকর দারোয়ান ছিল।

তারপর সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেল। সেই সব চাকর দারোয়ানদের তো ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। আমি করপোরেশনে যে ওয়ার্ডে কাজ করতুম সেই ওয়ার্ডে ওই দারোয়ানদের একজন আর্দালীর কাজ করতো। সে কেমন দেখে দেখে আমাকে চিনতে পেরে গিয়েছিল। একদিন বলছে, আপনি সেজবাবুর ছেলে না? বাবু, আপনার অনেক জিনিসপত্র ছোট কাকীমার কাছে রয়েছে। আমি বললুম, কি হবে ওসব জিনিস-পত্তর! আমার দরকার নেই ওসবে। কয়েকদিন বাদে সে ছোট কাকীমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এল। রাজেন দেবের কথা শুনেছিস তোরা? বোধ হয় Provincial congress-এর সভাপতি হয়েছিলেন। ওই দেবেদের বাড়ির এক মেয়ের সঙ্গে ছোট কাকার বিয়ে হয়েছিল। চিঠিটা পড়েছিলুম কি পড়িনি তা ঠিক মনে নেই। তবে লোকটা যখন চলে গেল চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলুম, একটা ঘটিও যদি নিতুম ওই মাথায় চেপে বসে থাকতো।

* **আমার গোড়া থেকেই কি এই রকম? জগতটাকে উল্টো দেখি।** আমি আগে বলতুম, আমার ব্রেণ-এর ওপর দিকটা নীচের দিকে আর নীচের দিকটা উপরের দিকে। তাই বোধ হয় জগতটাকে উল্টো দেখি। দেখনা, জ্যোৎস্নাকে লোকে কত সুন্দর বলে। আবহমানকাল ধরে লোকে জ্যোৎস্নার পুজো করে এসেছে। প্রশংসা করা মানেই পুজো করা। কিন্তু আমি দেখি অন্য জিনিস। আগেকার দিনে লোকে সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আর কিছু কাজ কর্ম করতে পারতো না। কিন্তু জ্যোৎস্না হলে তাদের ভারী আনন্দ হোত। তাই তারা জ্যোৎস্নাকে ভালবেসে এসেছে। এখনও দেখবি পাড়াগাঁয়ের লোকেরা বলে— অন্ধকারে আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। আবার যখন জ্যোৎস্না ওঠে তখন তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করতে পারে, অন্যান্য কাজকর্মেরও সুবিধা হয়। জ্যোৎস্না আমাদের কাছে সুন্দর বলে কেন মনে হয়? কারণ— We have been so taught by our predecessors, we have been so tutored by heredity, so spoken of by anybody and everybody we come in contact with. তাই আমরা জ্যোৎস্নার পুজো করি। কিন্তু যোগীদের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। তারা সারা শরীর ভাল করে ঢেকে রাখে, যাতে জ্যোৎস্নার আলো শরীরে পড়লে কামের উদ্রেক না হয়।

*** ছেলেবেলায় পুরাণ পড়ে একটা জিনিস বুঝেছিলুম যে পুরাণকাররা চেষ্টা করেছে যাতে লোকে সহজে নির্ঝঞ্ঝাটে সব বিশ্বাস করে।** কিন্তু তা হয় না। তা টেকে না। ঈশ্বরকে দেহের মধ্যে না দেখলে মানুষ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। না দেখলে তার বিশ্বাস হয় না— এটাই তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কি করে যাবে? পুরাণে লেখা হোল যে অজামিল মরবার সময় পুত্রস্নেহে নারায়ণকে ডাকায় মৃত্যুর পর তার মুক্তি হোল। এখন তার মুক্তি হোল কি না, তা কে বলবে? না, মৃত্যুর পর মুক্তি নয়, জীবদ্দশাতেই মুক্তি। মুক্তি কী? ব্রহ্মত্ব লাভ।

*** ভক্ত কথাটার কোন মানে নেই। It carries no sense. It is a self imposed term.** নিজেকে ঠকাবার জন্যে, নিজের অহঙ্কার প্রকাশ করার জন্যে মানুষ ঐ কথাটা ব্যবহার করে। ভক্তি হচ্ছে একটা process যাতে মানুষটা ধীরে ধীরে পরমব্রহ্মে পরিণত হয়। কেউ একে ভক্তি বলে। কেউ বলে জ্ঞান— এই রকম। এই process আপনা হতে হয়।— ঠাকুর জিনিসটা ঠিক বলে যাচ্ছেন— 'ঈশ্বর যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন তবে মুক্তি।'

*** There is only One Religion for the whole human race – the Religion is to see God. It cannot be seen in temple or in mosque. But simply and solely in one's own body.**

পঞ্চদশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ১২ই জুলাই শনিবার হইতে
১৪ই নভেম্বর শুক্রবার, ১৯৫৮ পর্যন্ত)

*** এখানে আসবার চেষ্টা করবি। যখনই সময় পাবি চলে আসবি, একটা অদ্ভুত অবস্থা চলছে।** কি আর বলবো তোদের। এখন যারা না আসবে তারা কড়ায়ের ডালের খদ্দের; আর যারা আসবে তারা হ'ল ব্রহ্মজ্ঞানের খদ্দের।

*** কাল একটা স্বপ্ন দেখেছি, বলি শোন্।** আমি যেন আলপুকুর থেকে উলুবেড়ে এসেছি। উলুবেড়েতে এসে দেখি সেখানে অনেকগুলো নদী। কেউ কারো সঙ্গে মিশছে না, সব Parallel (সমান্তরালভাবে) চলছে। তার মধ্যে একটা নদীকে দেখিয়ে কে যেন বলছে, **তলবকার, তলবকার!** তলবকার উপনিষদ বলতে কী বোঝাচ্ছে তা পরে বলছি। স্বপ্নের মানেটা আগে শোন। আলপুকুর হচ্ছে স্বধাম। সেই স্বধাম থেকে অনেকটা নেমে এসে তবে উলুবেড়ে। সেইখানে তলবকার উপনিষদ। অর্থাৎ আমি যে এখন বেদ, উপনিষদ এই সব পড়ছি, আমাকে অনেকটা নেমে এসে তবে পড়তে হচ্ছে। তাই ওসব পড়তে বারণ করছে, দরকার নেই বাবা। আজই ওসব বিদায় করব। তলবকার উপনিষদ, কেনোপনিষদের আর এক নাম।

*** বাইবেলে আদম আর ঈভের গল্প আছে। ওই গল্পের মধ্যেও যৌগিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।** বাইবেলে আছে যে আদমের ছেলে ভিন্ন জাতের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। তাহলে তখন আরও বিভিন্ন জাতের লোক ছিল, আর আদম ও ঈভই যে আদি মানুষ সেকথা তাহলে প্রমাণ হয় না। আদম তাহলে কে? আদম হ'ল আদি মানুষ যার মধ্যে ভগবান স্ফুরিত হয়েছিলেন। বাইবেলেই আছে আদমের একটা হাড় নিয়ে ভগবান ঈভকে সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ ঈভ হচ্ছে আদমের কারণশরীর। ঈভের কথা শুনে আদম Fruit of knowledge (জ্ঞানবৃক্ষের ফল) খেল আর তার পতন হল। অর্থাৎ তার মন দেহেতেই আবদ্ধ হয়ে রইল।

*** ঠাকুর চার রকম লীলার কথা বলেছেন— নরলীলা, দেবলীলা, জগৎলীলা আর ঈশ্বরলীলা।** এখানে তোরা যে আমাকে দেখিস এ কি লীলা বল দেখি? না, এখানে কোন লীলা নেই। 'এক' আবার কার সঙ্গে লীলা করবে? এই যে বহু দেখছিস, এ বহু সেই একেরই রূপ। এখানে লীলা নেই, লীলাকে নাশ করতেই একের উদয়।

*** Unity in Diversity. এ কথাটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দে।** এখানকার কথা ধরিস নি, এখানকার কথা বাদ দিয়ে বল। কিরে, কোথাও কিছু খুঁজে পাচ্ছিস না? না, কোন কিছু দিয়ে এ কথা বোঝান

যায় না। ওরা বলতে পারে— সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এ হচ্ছে unity in diversity। ঠাকুর চারিদিক চৈতন্যময় দেখছেন— এও unity in diversity। কিন্তু এসব কথা criticise করা যায়। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এ তো অনুমান, কল্পনা। প্রমাণ কই? আর, ঠাকুরের চতুর্থ ভূমিতে মন উঠেছে। তাই তিনি চারদিক চৈতন্যময় দেখছেন। ও হচ্ছে অনুভূতি। ও দিয়ে unity in diversity প্রমাণ করা যায় না, unity in diversity-র প্রমাণ এক এখানেই হয়েছে, তোদের একজনের সঙ্গে আর একজনের কত তফাৎ। কিন্তু তোরা সকলে একজনকেই অন্তরে দেখিস। Diversity-র মধ্যে unity কোথায়? ওই একজনকে দেখা।

* **আগে লোকে গুরুগৃহে থাকতো**। মাষ্টার মশাই মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে এসে থাকেন। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর গুরুগৃহে বাস হচ্ছে। তোদের বেলায় কী হচ্ছে? তোদের গুরু আছে, অস্বীকার করার উপায় নেই। ওই যে বলছে— শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং বদামি— শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং ভজামি— শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং স্মরামি— শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং নমামি। আহা, কি কথাই বলেছে। ওই পরমব্রহ্মই তোদের গুরু। সেই পরমব্রহ্ম কোথায়? তোদের দেহে। তোদের গুরুগৃহে যেতে হচ্ছে না। গুরুই রয়েছে তোদের গৃহে, অর্থাৎ দেহে। বলে, তোদের কৃষ্ণ কথার কথা, আমার কৃষ্ণ অন্তরের ব্যথা। এ যে আমাদের অন্তরের ব্যথা।

* **ঠাকুর বলছেন, নানান ধর্ম তিনিই করেছেন**। না, একথা ঠিক নয়। ধর্ম যে এক, ধর্ম তো বহু নয়। প্রাণশক্তিরূপে যিনি দেহকে ধারণ করে আছেন তাঁকে জানাই হোল ধর্ম। এই প্রাণশক্তির রূপ কী? সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের বা পরমব্রহ্মের রূপই হোল প্রাণশক্তির রূপ।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম— এই হোল পঞ্চভূত। ক্ষিতি আছে, অপ্ আছে, মরুৎ আছে, ব্যোম আছে। তেজ আসছে কোথা থেকে রে? তেজ আসছে সূর্য থেকে— কেমন না? তোদের বলেছি বোধ হয় মনে আছে— প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই রূপের (নিজেকে দেখিয়ে) ছাঁচ আছে যে রূপ স্বপ্নে সূর্যের মধ্যে দেখা যায়। তারা তেজ

পাচ্ছে সেই সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের কাছ থেকে। ওরে, বুঝতে পারছিস— আমি কি বলছি? তা হ'লে প্রশ্ন উঠবে— সব মানুষের মধ্যে এই রূপ ফুটছে না কেন? না, তা হয় না। আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

* **ঠাকুর বলছেন, সবই নারায়ণ। হাতী নারায়ণ, বাঘ নারায়ণ, খলরূপী নারায়ণ, ছলরূপী নারায়ণ, সাধুরূপী নারায়ণ, লুচ্চরূপী নারায়ণ!** না, তা হয় না। দেহেতে নারায়ণ যদি না ফুটলো তবে সে নারায়ণ হোল কি করে? ঠাকুর বাঘ নারায়ণ, হাতী নারায়ণকে দূর থেকে নমস্কার করতে বলছেন। কেন, দূর থেকে নমস্কার কেন? নারায়ণকে যদি গলা জড়িয়ে ধরতেই না পারলুম তবে সে নারায়ণ হোল কেমন করে?

* **ঠাকুর বলছেন, ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়**। তিনি উপমা দিচ্ছেন— যেমন চুম্বক পাথর আর ছুঁচ। চুম্বক তো ছুঁচের কাছে যাচ্ছে না, চুপ করে বসে আছে। কিন্তু ছুঁচ চুম্বকের আকর্ষণে তার কাছে গিয়ে পড়ছে। তাই ঠাকুর বলছেন, চুম্বক যেমন নিষ্ক্রিয়, ব্রহ্মও তেমনি নিষ্ক্রিয়। কিন্তু এ উপমায় ভুল আছে। চুম্বক নিষ্ক্রিয় কী করে হচ্ছে? এখানে চুম্বক হচ্ছে সগুণ ব্রহ্ম। তার magnetic field-এর মধ্যে তার আকর্ষণ শক্তি ঠিক কাজ করে যাচ্ছে, সে তো নিষ্ক্রিয় নয়! আবার দেখ, ঠাকুরই বলে যাচ্ছেন— যার টল আছে তার অটলও আছে। এবারে ব্রহ্ম যে নিষ্ক্রিয় তা এখানকার কথা দিয়ে বুঝিয়ে দে। আমার কথা ভাব না। আমি কি কারো কাছে গেছি!— না, নিজে কিছু জানতুম? তোরা কেউ পঞ্চাশ বছর আগে দেখেছিস, কেউ পঁচিশ বছর আগে দেখেছিস— আমি কি তা জানতুম? তোরা এসে বললি তবে তো বুঝতে পারলুম। এই জিনিসটাকেই আমি বলি, 'অভাবমুখ চৈতন্য'। এই হোল নিষ্ক্রিয় অবস্থা।

* **আমি দুটো জিনিস সাফ বুঝেছি**। প্রথম হোল যে মানুষেরই এই সব হয়। বই শাস্ত্রে এ কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে— ভগবান দূরে আছে, এসব তারই হয়। কিন্তু তা নয়। মানুষেরই এ সব হয়। দ্বিতীয়, এই যে এরা ভজে রামকেষ্ট, অথচ দেখে জীবনকেষ্ট— এর মানে খুঁজে পেয়েছি পরিষ্কারভাবে। মানুষের মধ্যে আছে সূর্যের তেজ।

সেই জ্ঞানসূর্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা আছে। জ্ঞানসূর্য উদয় হলে তারা তার মধ্যে অধিষ্ঠানকারী সেই দেবতার রূপ দেখতে পায়। সে এই রূপ।

ষোড়শ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ৫ই আগষ্ট হইতে
২৩শে আগষ্ট, শনিবার, ১৯৫৮ পর্যন্ত)

* **কেন আমার ফটো রাখতে দেয় নি তা বুঝতে পেরেছি।** মানুষের মধ্যে রয়েছে এই রূপ। সে আপনা থেকে ফুটে উঠবে। ফটো যদি থাকতো লোকে মনে করতো যে ফটো দেখেছে বলেই এই রূপ স্বপ্নে ভেসে ওঠে।

* **বাবা, ব্যষ্টির সাধনে অহঙ্কার যায় না।** মুখে যে যতই বলুক তার অহং নেই, অহঙ্কার নেই, মানুষের মধ্যে আছে অসংখ্য ছিদ্র। সেই ছিদ্র দিয়ে অহঙ্কার প্রকাশ হয়ে পড়বেই।

আমার মধ্যে অহঙ্কারের স্থান নেই। লখিন্দরের লোহার ঘরে ছেঁদা ছিল, সেই ছেঁদার ভিতর দিয়ে সাপ ঢুকেছিল তাকে কামড়াবে বলে। কিন্তু এ ঘরে কোন ছেঁদা নেই।

বিষ্ণু ভট্চার্যিই প্রথম আমায় বলেছিল— আপনি অবতার। ও কী একটা বুঝেছিল। আমার তো নিরেট মাথা। বলেছিলুম, ও সব আমার মাথায় ঢোকে না।

* **আমি পরমহংস নই। আমি হংস নই, আমি বাজপাখী।** সুধীনের স্বপ্নের কথা ভাব না। সুধীন দেখছে— একটা হাঁস, সে তার ঠোঁটটাকে ভেতর দিকে ঠেলে সোজা হয়ে বসে আছে। এমন সময়ে কোথা থেকে একটা বাজপাখী এসে হাঁসটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে গেল। ..... scene change (দৃশ্যান্তর) হয়ে গেল। ও দেখছে— একটা চৌবাচ্চা। তার পাড়ে বাজপাখীটা বসে আছে। হাঁসটা নীচে পড়ে আছে। ঠোঁটে রক্ত লেগে আছে। সেটা মৃতপ্রায় অথবা মরে গেছে। এখানকার অবস্থাই সুধীন দেখেছে। হ্যাঁ, আমি হাঁস নই, আমি বাজপাখী। পরমহংসকে নাশ করতেই আমার জন্ম।

দক্ষিণেশ্বরে তখন একজন লোক থাকত। সে নিজেকে বলতো পরমহংস। লোকেদের কাছে গিয়ে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতো আর কানে মন্ত্র দিত। সে অনেক দিনের কথা। কুলার্ণব তন্ত্রে আছে যার কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে তার সামনে কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা বললে সে ব্যাঙের মত লাফাতে থাকবে। সেবার আমি গেছি দক্ষিণেশ্বরে। সঙ্গে হেয়ার স্কুলের এক মাষ্টার। বেলতলায় বসেছি ধ্যান করতে, ধ্যানে যেন ডুবে যাচ্ছি। এমন সময় সে এসেছে আর মাষ্টারের সঙ্গে কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা বলছে। আমার কানে যেই না ওসব কথা ঢুকেছে আমি তো ব্যাঙের মত লাফাতে শুরু করেছি। তাই না দেখে সে তো মার ছুট। ..... তোদের কি কিছুর জন্যে আটকাচ্ছে? কিছু না। তোরা জানিস না তোদের সকলেরই কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়েছে। কুণ্ডলিনী জাগরণ হলেই যে ব্যাঙের মত লাফাতে হবে এমন কোন কথা নেই। ও প্রথম প্রথম হয় বটে, পরে ও জিনিসটা দেহের সঙ্গে মিশে যায়। তোদের সকলেরই অদ্ভুতভাবে কুণ্ডলিনী জেগেছে। কুণ্ডলিনী না জাগলে দেবস্বপ্ন দেখা যায় না।

* **সংসারী আর সন্ন্যাসী এই বিভাগ করে জগতের যে কী ক্ষতি করেছে তা বলতে পারি না।** কেবল aristocracy-র সৃষ্টি হয়েছে। তোমরা সংসারী, তোমরা ছোট আর আমরা সন্ন্যাসী, আমরা তোমাদের চেয়ে বড়। সংসারীদের ঈশ্বর আর সন্ন্যাসীর ঈশ্বর কি আলাদা? যদি কেউ সংসারে বদ্ধ হয়েই থাকে সে দোষ কি তার, না, যে তাকে সংসারী করেছে তার? সে দোষ কি ঈশ্বরের উপরেই এসে পড়ে না? হ্যাঁরে অরুণ, (অবিবাহিত তরুণ যুবক) তুই তো সন্ন্যাসী, আর হীরু (বিবাহিত) সংসারী। তোর ঈশ্বর কি হীরুর ঈশ্বরের চেয়ে বড়? তোর ঈশ্বর কি আলাদা? মহাপ্রভুর ওই যে কথা—

'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই
সংসারী জীবের কভু গতি নাই।'

আজ যদি মহাপ্রভুকে সামনে পেতাম তাঁকে প্রশ্ন করতাম— What right have you to curse the whole human race ? They do not know that they are making a parade of their own ignorance.

ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) ঐ যে বদ্ধজীব, মুক্তজীব, মুমুক্ষুজীব ইত্যাদির কথা বলে যাচ্ছেন, এখানেও সেই classification, সেই aristocracy-র সৃষ্টি। কালীবাবু (লোহাব্যবসায়ী)— এখানেও তো সুর আর অসুরের কথা এসে পড়ছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, তা বলতে পারেন, কেননা আমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছে আমি সে কথা বলেছি। দাঁড়ান— I am in my own way. জিনিসটার কী রূপ ধরে তা তো আমরা জানি না। অসুর সুর হতে কতক্ষণ?

* **এতদিন ধর্মজগতে যা কিছু চলে এসেছে তার মানে হ'ল তোমরা সব ছোট আর আমি বড়**। আর এখানে কি হয়েছে? আমি আমার ভাবধারায় তোদেরকে সব টেনে নিয়েছি। এখানে বড় ছোট কেউ আছে? এখানে সব সমান, এই হচ্ছে সত্যিকারের equality।

* **আমি বলছি বটে— সব এক। সে কিন্তু মানুষের বেলায়।** পঞ্চভূতে সব এক তা এখনও বলার সময় আসেনি। গাছ পাথর বাড়ী ঘর সব এক এ কথা আমি বলিনি। তোরা বলছিস, তোরা আমাকে দেখিস। কিন্তু গাছপালা আমাকে দেখে কিনা তার তো কোন প্রমাণ নাই। কোন ঘোড়া তো চিঁ-হিঁ-হিঁ করে বলে গেল না যে আপনাকে দেখেছি।

* **কাল দুপুরে (১৬-৮-৫৮) গোলাপীকে স্বপ্ন দেখেছি**। বলি শোন—

একটা অতি উদ্ভট জায়গা। সেখানে আমি একটু খর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একটা ফাইল আসার কথা আছে। আমি তাতে একটা note লিখে দেব। ফাইলটা আসতে দেরী হচ্ছে। তাই মেজাজটা একটু খর। এমন সময়ে সেখানে একজন লোক গজিয়ে উঠল, অজানা, অচেনা। তার পেছনে গোলাপী। তারই কাছে ছিল ফাইল। সেই যেন দেরী করছিল। আমি তো তাকে ছোঁব না। তাই গোলাপী ফাইলটা দিলে সেই লোকটাকে। সেই লোকটা আবার ফাইলটা দিলে আমাকে। আমি যে note লিখে দেব সেটাই যেন final। ফাইলটা নিলুম আর ঘুমও ভেঙে গেল।

তারপরই মনে হোল— আরে, গোলাপী যে 'বড়বাবুর রাঁড়' (কথামৃত)— মহামায়া। আমি তো তাকে ছোঁব না, তাই সে ফাইলটা

দিলে সেই অজানা লোকটিকে, অর্থাৎ ভগবানকে। সে আবার ফাইলটা দিলে আমাকে। আমার নোটই final (শেষকথা) হবে।

স্বপ্নের কি মানে তোরা কেউ বলতে পারিস?

* **পৃথিবীতে এতদিন যা কিছু ব্যষ্টির সাধন হয়ে এসেছে তার কোন মূল্য নেই**। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র এ সমস্ত সাধন illusion। তোরা আমাকে challenge কর।

ভারতবর্ষের অতীত ব্যষ্টিগত সাধনের মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন ঠাকুর। কিন্তু যতবড়ই সাধক হোক না, তার যত বড়ই জটা আর দাড়ি থাকুক না কেন, ঠাকুরের কথায় দন্তস্ফুট করবে কার সাধ্য? 'ম আর রা', 'হিমালয়ের গৃহে পার্বতী জন্মাল', 'আলেখ লতার জল পেটে পড়লে গাছ হয়', 'সূর্যের আলো মাটিতে পড়লে এক রকম, আবার যখন আর্শিতে পড়ে তখন আর এক রকম'— এ সব কথার মানে কি কেউ ধরতে পারবে? তবে এ সব কথার মূল্য কী? দেখ্, কথামৃতে যে সব অনুভূতির কথা আছে, তার চেয়ে অনেক বড় বড় অনুভূতি হয়েছে, কিন্তু কাউকেও তো সে সব অনুভূতির কথা বলি নি। কে বুঝবে?

বাবা, আমি যত চেষ্টাই করি না কেন, প্রাণময় কোষে bluish gurgling water (নীলাভ জল কল্‌কল্ করছে) অন্য কাউকে দেখাতে পারবো না। দিন দুপুরে খোলা চোখে দেখছি তলপেটের নীচে থেকে মেয়েছেলে হয়ে গেছি— এ অনুভূতি কারও করাতে পারবো না। পঞ্চমভূমি ষষ্ঠভূমির অনুভূতি অন্য কাউকে দেখাতে পারা যাবে না। তবে কি বলতে হবে— আমি দেখেছি, অতএব তোমরা বিশ্বাস কর? এতদিন ধরে তো খালি এই চলে এসেছে— তোমরা বিশ্বাস কর— তোমরা বিশ্বাস কর— তোমরা বিশ্বাস কর। তাই তো আজ এ সব বিদায় করছি, বলছি— এ সব কিছু নয়, এ সব কিছু নয়। সমষ্টিতে না ফুটলে এ সবের কোন মূল্য নেই। তোরা কি আমার এ সব কথা নিতিস? আমি যদি বলতুম দেখ বাবা, আমিই সব হয়েছি— তোরা আর এ মুখো হতিস? তোরা আমাকে দেখছিস, কত অনুভূতি হচ্ছে, মাথায় সব থিতুচ্ছে, তাই তো এসব কথা নিতে পারছিস। ওরে, এ সব যে কী কথা হচ্ছে তা আর কী বলব।

*** তোদের মধ্যে জনাদশেক লোক সূর্যমণ্ডলের মধ্যে আমাকে দেখেছিস**। কিন্তু যারা দেখল না তাদের কি হবে? পুরানো জিনিসের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যে ওই ক'জন লোক আমাকে সূর্যমণ্ডলের মধ্যে দেখেছে। ওরে, বেদের সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ ওতো কল্পনার জিনিস। ওরা এতদিন কল্পনার পূজা করে এসেছে। তোরা কাকে দেখিস? জীবন ঘোষকে দেখিস। সে কে? একটা জ্যান্ত মানুষ। তোদের ধর্ম কি? তোদের ধর্ম জীবন ঘোষ!

*** বীজমন্ত্র জপ করার কোন মূল্য আছে কি না তা জানি না**। আমি তো কখনও করি নি। কি করে জানব? তবে বীজমন্ত্র জপ করার একটা উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারি। ও মনকে সংযত করে। তোদের মন তখনই সংযত হয়েছে যখন তোরা আমাকে দেখেছিস। ও যে নাড়ী ছেঁড়া ধন রে! কতগুলো নাড়ী ছিঁড়ে তবে মায়ের সন্তান হয় বলে না? সেই নাড়ী ছিঁড়ে এই রূপ তোদের দেহেতে ফুটেছে। মন সংযত তোদের আপনি হয়েছে।

সপ্তদশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ১৬ই আগষ্ট, শনিবার হইতে
২৫শে অক্টোবর, শনিবার পর্যন্ত)

*** যে দেশে বলছে 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'**, যে দেশে বলছে 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু', যে দেশে বলছে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', সেই দেশেতেই মানুষের জন্য কি বিধান দেওয়া হ'ল? গোময় আর গোমূত্র খাওয়া। সেই দেশেতেই মানুষের জন্যে কি ব্যবস্থা করেছে বল দেখি?

* কথামৃত চতুর্থ ভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড পড়া হইতেছে। **শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে আসিয়াছেন রথযাত্রা উপলক্ষে। কাল রথযাত্রা**। 'কাল রথযাত্রা' একথা শুনিয়া শ্রীজীবনকৃষ্ণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, কাল রথযাত্রা কি রে? রথযাত্রা কাল কেন? এ যে চলেইছে। দ্বৈতবাদে সোজা করে বলি, তা না হলে তোরা বুঝতে পারবি না। দেহরথে রয়েছেন ভগবান। তিনি মানুষকে চালাচ্ছেন। এ রথযাত্রার শেষ কোথায়?

শেষ— যখন সে জগৎ-ব্যাপী হচ্ছে। জগৎব্যাপী হয়েই তার যাত্রার শেষ। তখন সে জগন্নাথ!

*** ভগবান মঙ্গলময়**। তিনি যে দুঃখ দেন— কেন দেন, তা আমরা কী করে জানবো? **আঘাত দিয়ে আমাদের চৈতন্যকে ফিরিয়ে আনার জন্যই তিনি দুঃখ দেন**। বেদে যাদের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলা হয়েছে, তারা যে অমৃতত্ব লাভ করার জন্যেই এসেছে।

*** Religion is never negative. It is perpetual positive.** কেননা God is positive. It is positive first, positive last, positive for ever.

*** এই জগৎ মিথ্যা বা মায়া নয়**। শঙ্করের ওই মত ভুল। এই জগৎ সত্য। এই জগতেই দেহ নিয়ে মানুষটা সাধনার এক একটা স্তরে এক একটা অনুভূতি লাভ করে, জগতেই দেহ নিয়ে মানুষটা ভগবান হয়ে যায়, এই জগতেই মানুষটা ব্রহ্মে পরিবর্তিত হয়। এই জগতও সত্য।

*** ওই যে গানে আছে 'কালীর ভক্ত, জীবন্মুক্ত, নিত্যানন্দময়'**— বল দেখি মানুষটা কখন কালীর ভক্ত হয়? কালীর ভক্ত কে? তোদেরকে বলেছি— কালী মানে এই দেহ। মানুষটার মন যখন অন্তর্মুখী হয় তখনই সে হয় কালীর ভক্ত। কেন সে কালী অর্থাৎ দেহের ভক্ত হয়? কারণ তখন সে বুঝতে পারে যে দেহেতে ভাগবতী তনুই এই সব লীলা করে। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে সে বুঝতে পারে, তার দেহেতেই তো সব। তোরা কালীর ভক্ত কখন হয়েছিস? যখন তোরা আমাকে দেখেছিস!

আপনা থেকে যদি হয় তবেই হয়। আরোপ করলে কিছু হয় না। ঠাকুর মা কালীকে আরোপ করেছিলেন— কেমন না? কিন্তু ঠাকুর ১১ বছর বয়সে জ্যোতি দর্শন করেছিলেন। সেই জ্যোতি দর্শনের পর তাঁর মা কালী আরোপ করা হয়ে ছিল। শুধু মা কালী আরোপ করলেই যদি হোত তবে বাংলাদেশে তো কালী মন্দিরের অভাব নেই। যেখানে পুরোহিতরাও নিত্য পূজা করে। কিন্তু আর একজন রামকৃষ্ণ হ'লো না কেন?

ঠাকুর বলছেন, কালী কালো কেন? দূরে বলে। ও হচ্ছে ধ্যানের কথা। আমি ও কথা বলি না। আমি বলি— কালী মানে দেহ। সে কালো কেন? এই দেহের যে কি অনন্ত শক্তি আছে তা আমরা জানি না। তাই কালো।

*** আমার ব্রয়্মময়ী কে জানিস? তোরা কল্পনাও করতে পারবি না, অভাবনীয়! আমার ব্রয়্মময়ী— আনন্দ** (শ্রীআনন্দ মোহন ঘোষ নামে এক নিত্যসঙ্গী যুবক)। রোজ সকালে 'ব্রয়্মময়ী, ব্রয়্মময়ী' বলতে বলতে যখন কপালে হাত ঠেকাই, তখন দেখি আনন্দকে। অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ ভেদ বোধ নেই কি না!

*** ভগবান কী, বুদ্ধ তা জানতেন না। আর ঠাকুর বলছেন, 'মাইরি বলছি, ভগবানকে দেখেছি।'** বুদ্ধ ভগবানকে অস্বীকার করেছিলেন। কেন? তাঁর ভগবান দর্শন হয় নি তাই। ভগবান দর্শন হলে তিনি আর অস্বীকার করতে পারতেন না। আবার দেখ, ঠাকুর বলছেন— ভগবান দর্শনের পর তাঁর আদেশ পাওয়া যায়, তবে প্রচার। বুদ্ধ যে অত প্রচার করে বেড়ালেন সে তা হলে কি প্রচার?

বুদ্ধের ভগবান দর্শন হয় নি। তাই তিনি আত্মা বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তিনি কী ধর্ম প্রচার করলেন? আজ এ কথা প্রশ্ন করবার সময় এসেছে যে তিনি জগতের কল্যাণ করলেন না অকল্যাণ করলেন? সত্য স্বয়ংপ্রকাশ! যে ভারতবর্ষ বুদ্ধের জন্মভূমি, সেই ভারতবর্ষ থেকেই বৌদ্ধ ধর্ম উঠে গেল। একদিন সকালে শোনা গিয়েছিল— সমস্ত এশিয়া খণ্ড বলছে, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙঘং শরণং গচ্ছামি।' সেই বৌদ্ধ ধর্ম গেল কোথায়?

*** ব্যষ্টির সাধন আর হবে না।** আমি বুঝেছি ব্যষ্টির সাধন শেষ হয়ে গেছে। তবে কি হবে? ওই একেতে পরিবর্তিত হয়ে যদি কারো হবার হয় নিম্নাঙ্গের কিছু সাধন হতে পারে। বাবা, ব্যষ্টির সাধন? ওতে অহঙ্কারের বোঝা থাকে রে, অহঙ্কারের বোঝা। আর ওতে ভুল থাকে, অজস্র ভুল। দেহের এমনই গুণ যে ওতে ভুল গজিয়ে ওঠে। দেখ না, অমন দশাশই

মানুষ মহাপ্রভু— তিনি ভাবলেন কি না তিনি শ্রীমতী। তাও যদি তিনি physically (দেহগতভাবে) শ্রীমতীতে transformed (রূপান্তরিত) হতেন তা হলে না হয় হোত। তাও তো নয়। ভেবে কি হলো? দেবদাসীরা গান করছে, তিনি ভাবলেন কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন, অমনি ছুটলেন চটক পাহাড়ে। এ কি উন্মাদ নয় বাবা? আর ঠাকুরকে তো লোকে পাগলা বামুন বলতোই। তাইতো বলি ও ভক্তি-উন্মাদ, প্রেমোন্মাদ, জ্ঞানোন্মাদ নয় বাবা, শুধু উন্মাদ। ব্যষ্টির সাধন নার্ভ-কে ওই রকম দুর্বল করে দেয়। খুব স্ট্রং নার্ভ না হলে ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত।

ঠাকুর চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সাধন করেছিলেন। এ কি কম কথা রে! যদি এক একটা তন্ত্রের এক একটা শ্রেষ্ঠ অনুভূতির কথাই ধরি তা হলে তাঁর চৌষট্টিটি অনুভূতি হয়েছিল। কিন্তু এত অনুভূতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি বললেন— তন্ত্রের সাধনা করা কিনা পায়খানার মধ্যে দিয়ে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করা। অর্থাৎ তন্ত্রের সাধনকে তিনি উচ্ছেদ করলেন। আমার এই যে ব্যষ্টির সাধন সব আপনা থেকে হয়েছে। কেন? ব্যষ্টির সাধন আর হবে না তাই। তাই তোদের সাধন হোল একেবারে আত্মজ্ঞানে। একে যে কী সাধন বলবো, নাম তো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। তবে কেউ ফেঁকড়ি তুলতে পারে— কেন মশাই আমাদেরও তো ব্যষ্টির সাধনের অনুভূতি হয়। হ্যাঁ, একটু আধটু হতে পারে। সে তোদের বিশ্বাসের জন্যে। তা না হলে তোদের বিশ্বাস হবে কেন যে একটা কিছু হচ্ছে।

*** গত মঙ্গলবার (১৯শে আগষ্ট, ১৯৫৮) দৈববাণী হ'ল— তোকে শিগ্‌গীর ইংল্যাণ্ডে যেতে হবে।** বুধবার সকালে কালীবাবুর বাজারের দিকে যাচ্ছিলুম বাতাবী লেবু কিনতে। যেতে যেতে ভাবছিলুম— তাই তো, বিলেতে যেতে হবে! কি করে যাব? দুখানা গামছা আছে, একখানা পরা যাবে আর একখানা না হয় গায়ে দিয়ে যাওয়া যাবে। অর্থাৎ 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' (এক পা-ও যাচ্ছি না)।

ডক্টর আর্কাটের Pantheism সম্বন্ধে যে বই ক'দিন পড়া হচ্ছিল, নাথ (পরিতোষ নাথ) বললে, সেই ডক্টর আর্কাট্ ইংলণ্ডে এখনও বেঁচে আছেন। অমর বললে, ওরা নাকি তাঁর ছাত্র ছিল। ঠিক হল, এখানকার

সম্বন্ধে ওঁকে চিঠি লেখা হবে। এখানকার সম্বন্ধে চিঠি লেখা মানে এক রকম আমারই যাওয়া হল।

* গত নভেম্বর মাসে ঘর বন্ধের সময় (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৭ হইতে ১৯৫৮, জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত, তিন মাস শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘর বন্ধ ছিল, এই সময় তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘরের মধ্যেই অতিবাহিত করেন।) যখন খুব কতকগুলো দৈববাণী হয়েছিল তখন একদিন একটা দৈববাণী হ'ল— **ভগবান দর্শনের কথা যখন বলবি তখন বলিস ঠাকুর কৃপা করে আমায় ভগবান দর্শন করিয়ে দিয়েছেন**। আজ তোদেরকে কথাটা বলে ফেললুম। কিন্তু কেন দৈববাণী হ'ল সেটাও বলি শোন। ভগবান দর্শন যে ব্যষ্টির সাধন রে। ওতে যে অহঙ্কার আসে। সেই অহঙ্কারটুকুও যাতে না আসে তাই অমন করে বেড় দিয়ে রাখলেন।

* **ঠাকুর মাষ্টারমশাইকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন, আমাকে তোমার কী মনে হয়? আমার এখন কী রকম অবস্থা? ইত্যাদি**। এ সব কথা শুনে কী মনে হয়? তাঁর কোথায় যেন একটা doubt (সন্দেহ) রয়েছে, কোথায় যেন hesitation রয়েছে। তাঁর নিজের অবস্থা সম্বন্ধে একটা সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে। ব্যষ্টির সাধনে এই রকমই হয়। আর এখানকার কথা ভাব। আমি কি কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি? তোরা এসে বলিস তাই শুনি। জগৎব্যাপী না হ'লে সংশয় যায় না।

* **ঠাকুর বলছেন— ঈশ্বর অনন্ত, পথও অনন্ত**। ঈশ্বর যে অনন্ত এ কথা তোরা আমাকে বুঝিয়ে দে। ঈশ্বর যে অনন্ত এর প্রমাণ কই? প্রমাণ চাই। তোরা যে আমাকে দেখছিস, এই যে হাজার হাজার লোক আমাকে দেখছে, সংখ্যা তো ক্রমশ বেড়েই চলেছে, এই তো প্রমাণ যে ঈশ্বর অনন্ত!

* **তোদেরকে Surplus body-র (সারপ্লাস বডি) কথা বলেছি** বোধ হয় মনে আছে। Surplus body কাকে বলে শুনে রাখ। এই যে এতগুলি লোক আমাকে দেখছে, যত দিন যাচ্ছে ততই আমাকে দেখা লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, এই হচ্ছে Surplus। এতগুলি Surplus body হচ্ছে। এই Surplus body-র শেষ কোথায়? শেষ নেই। অনন্ত হতে পারে।

* **ঠাকুর বলছেন, আমার আমি যায় না**। আগে বলতুম, হ্যাঁ সমাধির পর আমি তো ফিরে আসে। এখনও বলছি আমি যায় না। কিন্তু সে আমি 'বিশ্বব্যাপী-আমি'। কত তফাৎ বল দেখি। দুটোর মধ্যে কি কোন তুলনা হয়?

* **বেদান্ত মতে সাধনের সময় ঠাকুর সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, চাঁদনীতে পড়ে থাকতেন**। আর বেদান্ত সাধনের সময় আমি চলেছি বিলেতে। তার আগেই অবশ্য ঠাকুর কৃপা করে ভগবান দর্শন করিয়েছিলেন।

* কথামৃত পড়া হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়েছেন। **সমাধি ভঙ্গের পর বলছেন, মা তুই কি এলি? গাঁটরি-উটরি বেঁধে ঘর দোর সব ঠিক করে তুই কি এলি?**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, ঠাকুর কাকে মা বলতেন? ঠাকুর ব্রহ্মকেও মা বলতেন। তিনি বলতেন, বেদে যাকে ব্রহ্ম বলে আমি তাকে মা বলি। আর, তুই কি এলি? 'এলি' এখানে কি বোঝাচ্ছে? অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল এক বলে বোধ হয়। তাই 'এলি' বলে ঠাকুর এখানে ভবিষ্যৎ বোঝাচ্ছেন। 'গাঁটরি বেঁধে'— গাঁটরি কি জন্যে বাঁধে? ভবিষ্যতের জন্যে— কেমন না? গাঁটরি কোথায় বাঁধে? সহস্রারে। কার সহস্রারে? (সকলকে দেখাইয়া) সকলের সহস্রারে। তোদেরকে বলেছি বোধ হয় মনে আছে— প্রত্যেকের সহস্রারে আমার ছাঁচ আছে। 'ঘর দোর ঠিক করে' মানে? ঘর মানে দেহ। দেহ ধারণ করে, দেহবান হয়ে।

ওঃ! কতবার তো ঠাকুরের এই কথা পড়া হয়েছে। আজ হঠাৎ কেমন কথাটার মানে বোঝা গেল। ঠাকুর এখানকার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছেন।

অষ্টাদশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ১৯শে অক্টোবর, রবিবার হইতে
১৪ই নভেম্বর, শুক্রবার, ১৯৫৮, পর্যন্ত)

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, ১৬শ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ পাঠ হচ্ছিল। **শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন— 'কৃষ্ণ শ্রীমতীর হৃদয়েই ছিলেন, কিন্তু ইচ্ছা হ'ল তাই মানুষ রূপে লীলা।'** শ্রীজীবনকৃষ্ণের নির্দেশে লাইনটি কয়েকবার পড়া হলে তিনি বললেন,— দেখ্ রে দেখ্। আমি যে তোদেরকে বলেছি যে পুরী মহারাজ, ব্রাহ্মণী, আরও একজন লোক, এ ছাড়া কিছু লোক ঠাকুরের দেহ থেকে বেরিয়েছিলেন, এখানে সে কথার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। কৃষ্ণ শ্রীমতীর হৃদয়ে ছিলেন— একথা ঠাকুর কোথা থেকে পেলেন? কোন বইয়ে তো একথা নেই। এ তাঁর নিজের কথা বলে যাচ্ছেন। পুরী মহারাজ, ব্রাহ্মণী এবং আরও অনেক লোক যে তাঁর দেহ থেকে বেরিয়েছিল এখানে তিনি সে কথাই বলছেন। তোদের তো কতবার বলেছি 'রাধা' মানে হ'ল দেহ আর 'কৃষ্ণ' মানে আত্মা। ঠিক অবিকল মানুষ রূপ ধারণ করে সেই আত্মা কখনও কখনও দেহ থেকে নিঃসৃত হয়। সন্তান হবার সময় যেমন একটা methodical process আছে, এখানে তা হয় না। তবে যে মূর্তি দেহ থেকে বেরোয় তা সাধারণ মানুষের মতই বেঁচে থাকতে পারে। নিজের না হলে এ বোঝা বড় শক্ত।

* **গৌর ভক্ত এলে ঠাকুর তাদের কাছে গৌর ভাবের কথা বলতেন, শাক্ত এলে শাক্তদের ভাবের কথা, আবার ব্রাহ্মভক্ত এলে তাদের কাছে ব্রাহ্মদের ভাবের কথা বলতেন।** এতে কী হচ্ছে? তাদেরকে আরও অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এতে সত্যের প্রকাশ হবে কি করে? ধর্ম তো বহু নয়। ধর্ম এক, কেননা ভগবান যে এক। তোদের ধর্ম ক'টি? তোদের ধর্ম এক। আর সে ধর্ম কি? একটি দেহবান মানুষ।

* **ঠাকুর বলছেন— ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন বটে, তবে অবতার না হলে সব সংশয় যায় না।** হ্যাঁরে, একথা সত্য কি? ঠাকুর তো অবতার, তাঁর আবির্ভাবে মানুষের সব সংশয় মিটেছে কি? যদি মিটেই থাকে তবে

এখানে এ জিনিস ফুটলো কেন? আর অবতার না হলে যদি সংশয় না যায় তবে এ্যাতো যে অবতার হয়েছেন তাঁদের না দেখে তোরা আমাকে দেখিস কেন? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে পরমব্রহ্মের ছাঁচ। সেই ছাঁচ যখন আমার এই রূপ ধরে ফুটে ওঠে তখনই তার সব সংশয় যায়। সেই রূপ ভেতরে দেখা যায় আবার বাইরেও দেখা যায়।

* **ত্যাগী সাধু? ও তো বিবিদিষা। ওতে অহঙ্কার থাকে।** হাম্ করেঙ্গা। কিন্তু ভগবান দর্পহারী, অহঙ্কার সহ্য করেন না। তাদেরকে একেবারে দুমড়ে দেন। ঠাকুর 'টাকা মাটি, মাটিই টাকা' বলে জলে টাকা ফেলে দিয়েছিলেন। ওই বিবিদিষা ছিল বলে আমরা কী দেখছি? কাশীপুর বাগানে ভক্তদের টাকা তাঁকে নিতে হয়েছিল। ওরে, ভগবান যদি ইচ্ছা করেন আমি একটা হসন্তকে (্) হিমালয় পাহাড়ের চেয়ে বড় করব, তিনি হসন্তকে হিমালয় পাহাড়ের চেয়ে বড় করেন। হসন্ত মানে কি জানিস? যে উহ্য থাকে, নিজেকে গোপন রাখতে চায়।

* একটা কথা বলবো? বড় কঠিন কঠোর কথা, সহ্য করতে পারবি? **সাকার নিরাকার নিয়ে এই যে দ্বন্দ্ব— এত টানা পোড়েন এসব ভুল। সাকার নিরাকার এ সব ভুল— কল্পনা— মিথ্যা।** কল্পনা তিন রকম। এক, ব্যক্তিগত— মানুষ নিজে অনেক কিছু কল্পনা করে থাকে। দুই— hereditary— পুরুষানুক্রমে কল্পনা চলে আসছে। আর তৃতীয় হচ্ছে— Universal। কল্পনার একটা universal sketch আছে যা একটু সুযোগ পেলেই মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে। দেখ, আমার যে সাকারে কত গভীর অনুভূতি হয়েছে তা তোদেরকে কী বলবো! যৌগিক রূপে ('ধর্ম ও অনুভূতি' গ্রন্থে) যে ব্যাখ্যা ও তো আমার অনুভূতিতে ব্যাখ্যা। ঠাকুরেরও অত অনুভূতি হয়নি এখন তা আমি বুঝেছি। তা হলে সেই অনুভূতির যৌগিক রূপ তিনি বলে গেলেন না কেন? এত গভীর যে অনুভূতি তাকেও আমি বলছি, ভুল— কল্পনা— মিথ্যা! Am I mad? Am I insane? No, far off from it. আমার মত rational brain মানুষের হয় না। তাই তো এখানে এমন কল্পনাতীত জিনিসের

সৃষ্টি হয়েছে। পনের বছর আগে কি আমি কল্পনা করতে পেরেছিলুম যে হাজার হাজার মানুষ আমাকে এইভাবে দেখবে? ভগবান দেখালেন যে ধর্ম কল্পনা নয়, ধর্ম একজন জীবন্ত মানুষকে নিয়ে।

* **বেদে আছে, পৃথিবীতে তাঁর এক চতুর্থাংশের প্রকাশ, বাকী তিন চতুর্থাংশ অপ্রকাশ। সেই সব ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে।** তিন চতুর্থাংশের প্রকাশ অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু যা প্রকাশ হয়েছে তা আগে কখনও হয়নি। আমি আনন্দ আর অমরকে ক্রমাগত দেখছিলুম তো। ক'দিন অমরকে দেখা কমে গেছে, আনন্দকে দেখছি। এত লোক থাকতে ওদেরকেই দেখি কেন? ও একটা name-sake (নামটা দিয়ে বোঝান) বই তো নয়। **কাল একটা দৈববাণী হ'ল— সে আমি নিজেই বলছি— আমার এই দেহেতে অন্য যুক্ত হয়েছে।** 'অন্য যুক্ত হয়েছে' মানে কী রে? আমি বেড়ে গেছি।

* এরপর শ্রীজীবনকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' নামক গ্রন্থ হইতে কৈবল্যপাদ অধ্যায়ের একাংশ পড়িতে নির্দেশ দিলেন ক্ষিতীশ বাবুকে। তাঁর নির্দেশে ক্ষিতীশবাবু পড়িতে লাগিলেন। **কৈবল্যপাদ রাজযোগের শেষ অধ্যায়। তাহাতে লেখা আছে যে যোগীর পক্ষে দেহধারণ করিয়া চিরদিন পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব।** পাঠ শেষ হইলে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন— তের বছর আটমাস বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে রাজযোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ রাজযোগ আপনা থেকে আমার দেহে ফুটে উঠেছিল। আজ আমার বয়স ৬৫ বছর ৬ মাস। যে রাজযোগ দেহেতে ফুটে উঠেছিল ১৩ বছর ৮ মাস বয়সে সেই রাজযোগ কৈবল্যপাদে এসে পৌঁছল ৬৫ বছর ৬ মাস বয়সে। এখন এর সত্যাসত্য ভবিষ্যৎই নির্ণয় করবে।

* (কৈবল্যপাদের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন — **ক্রমশঃ (প্রকৃতি) তাঁহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিজ হারানো মহিমা ফিরিয়া পাইলেন।** ..... এইরূপে সুখদুঃখের মধ্য দিয়া,

ভালমন্দের মধ্য দিয়া জীবাত্মাগণ অনন্ত স্রোতে প্রবাহিত হইয়া সিদ্ধি ও আত্মা সাক্ষাৎকাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন।) শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন— তোদের বলেছি বোধ হয় মনে আছে যে পিতার বীজ যখন মাতৃগর্ভে পড়ে তখন থেকেই সে পৃথিবীতে যে ভাবে প্রকাশ পাবে তার উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে থাকে। এখানে শিবপুরের বেণী ডাক্তার যখন এলো তখন তার পরিচয় পেয়ে তাকে বলেছিলুম— আপনি ডাক্তার? বাঃ, বেশ হয়েছে। আচ্ছা বলুন তো মায়ের গর্ভে শিশু যা পায় তাই খায়, না তার প্রয়োজন মত আহার্য সংগ্রহ করে? সে বলেছিল যে, না শিশু তার প্রয়োজন মত খাদ্য মায়ের গর্ভ থেকে সংগ্রহ করে। সংস্কার যে আছে এই ব্যাপার থেকে তা বোঝা যায়। এই সংস্কার বশতঃই সে নিজের প্রয়োজন মত খাদ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে প্রকাশ পায়।

* **ঠাকুর বলছেন, 'মা আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন— ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'।** মা দেখিয়ে দিয়েছেন, অতএব আর কথা বলার উপায় নেই,— ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এ কী রকম ব্রহ্ম রে? সগুণ না নির্গুণ, নেতি নেতি বিচার করতে করতে মহাকারণে লয় হওয়া। আবার, ঠাকুরেরই কথা নির্গুণের সঙ্গে আলাপ চলে না। নির্গুণের সঙ্গে আলাপই যদি না চলে তবে নির্গুণ ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা— এ কথা বলা যায় কি করে? আবার দেখাচ্ছে কে?— মা! অর্থাৎ, ঠাকুর নিজেই মা হয়েছেন আর নিজেই দেখাচ্ছেন। ওই যে (কথামৃতে আছে) ধ্রুব জিজ্ঞাসা করছে কুণ্ডল দুলছে না কেন? ঠাকুর বললেন— তুমি দোলালেই দোলে। এখানে ঠাকুরই দেখছেন, ঠাকুরই মা হয়েছেন। তাই তো ব্যষ্টির সাধন আর নিই না। ওকে illusion (ভ্রান্তি) বলে উড়িয়ে দিচ্ছি, ওকে self delusion বলা চলে। দেখ, আমার ব্যষ্টির সাধনে অনুভূতি তো কম হয় নি। কত original (মৌলিক) অনুভূতি সব। Original বলছি কেন? সে সব অনুভূতির কোন reference তো পাই না। তাকেও উড়িয়ে দিচ্ছি, কেন না মানুষ সংস্কার বশতঃ ওই সব দেখে। সংস্কার যায় না— পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় ছড়িয়ে আছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকেও সেই সংস্কার ফুটে ওঠে।

ঠাকুর বললেন—জগৎ মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা কিরে? ব্রহ্মকে দেখবি কোথায়? এই জগতে। ব্রহ্ম আধেয়, জগৎ তার আধার। তাই জগৎ মিথ্যা নয়। ব্রহ্মও সত্য জগৎও সত্য! Final-এ কি পাচ্ছি? ব্রহ্ম একটি দেহবান পুরুষ— তাকে বাইরেও দেখা যায়, আবার ভেতরেও দেখা যায়। এখানেই আবার অমরত্বের কথা এসে পড়ছে। রবি ঠাকুরের একটা কবিতায় আছে— আজি হতে শত বর্ষ পরে .....। আমি যদি বেঁচে থাকি তবে 'আজি হতে সহস্র বর্ষ পরে'— কি হবে?

* **রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম'** ও 'Religion of Man' নামে দুটি বই এসেছে। ২৬শে অক্টোবর তারিখের বৈকালিক আসরে শ্রীজীবনকৃষ্ণ 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ হতে প্রথম দুটি পাতা নিজেই পড়ে শোনালেন এবং প্রতিটি লাইনের ব্যাখ্যাও করলেন। দেখা গেল, শ্রীজীবনকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অন্তর্মুখী আত্মিক অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়েছে দৈবচালিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন তার কথাই লিখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— **'আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব**। তিনি আরও বলেছেন— 'মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।'

পাঠ ও ব্যাখ্যা শেষ হলে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন— বেদের একটা universal aspect (সর্বজনীন দিক) আছে। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ এই universal aspect-টা কি রকম ধরতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কার কথা লিখেছেন রে বল্ না! ও সব যে এখানকার কথা। তা না হলে ওসব কথার কি কোন মূল্য হয়?

* গতকাল (২৭-১০-৫৮) সকালে মানুষের ধর্ম বইটা পড়তে পড়তে এই জিনিসটা পেয়েছি। পড়তো ক্ষিতীশ— এই বলিয়া শ্রীজীবনকৃষ্ণ ওই পুস্তকের ২য় অধ্যায়ের নির্দিষ্ট অংশ দেখাইয়া দিলেন। ক্ষিতীশবাবু

পড়িতে লাগিলেন— **''উপনিষদ বলেছেন 'ত্বমেবৈকং জানথ আত্মানম্'— সেই আত্মাকে জানো, সেই এককে যাকে সকল আত্মার মধ্যে এক করে জানলে সত্যকে জানা হয়**। প্রার্থনা মন্ত্রে আছে, ''য একঃ, যিনি এক, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'', শুভবুদ্ধির দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এক করে দিন।'' (মানুষের ধর্ম) ক্ষিতীশবাবুর পড়া শেষ হলে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন— ঋষিদের কাছে যা ছিল প্রার্থনা তা এখানে বাস্তব রূপ ধারণ করেছে। আর একি শুধুই বেদের ঋষিদের প্রার্থনা। না, তারও কত আগে থেকে চলে এসেছে এই প্রার্থনা— আমাদের সকলকে এক কর! অবশ্য ওরা যা বলছে তাই যে এখানে ফুটেছে তা নয়। তবে ওদের abstract-টি নিয়ে আমরা আমাদের অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের প্রার্থনা— ''আমাদের এক কর— আমাদের এক কর''— এইখানে বাস্তবে ফুটে উঠেছে।

* **মানুষের স্বাভাবিক গতি কী?**— এক হওয়া, যা এখানে ফুটেছে। দরিদ্র নারায়ণ? হরিজন? সে আবার কি রে? এখানে এসেছিল এক মেথর। তাকে ধ্যান করাতে বসালুম, আমিও ধ্যান করতে বসলুম। সে ধ্যানে দেখলে ঠাকুরকে, মা ঠাকরুণকে আর আমাকে। সেই মেথরও তো আমাকে দেখে গেল।

* **ওরে, আমার যদি এতটুকু ত্রুটি হয়, এখানে যা কিছু হয়েছে সব বন্ধ হয়ে যাবে**। কল্পিত ত্রুটি নয়, কল্পিত ত্রুটি আছে। মাংস খাওয়া, কি প্যাঁজ খাওয়া, কি পান খাওয়া এসব ত্রুটি নয়, সত্যিকারের ত্রুটি যদি কিছু হয়— যাকে ঠাকুর বলছেন— 'সুতোয় যদি একটু আঁশ থাকে'— সেই রকম একটুখানিও আঁশ যদি হয় তবে এসব বন্ধ হয়ে যাবে। বাবা, রক্ষাও তিনিই করছেন। এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। তিনি রক্ষা করছেন, তাই হয়েছে।

* **কথামৃত পাঠের পর এই যে প্রায় বলি— 'করিতে ছেলেখেলা, অবসান হ'ল বেলা।' এর অর্থ কী?** -- (মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ) করে কিছু বলতে পারিস? এই পরমব্রহ্ম অবস্থাতেও আমি খুশী নই। এই দেহের

মধ্যে আরও অনেক কিছু শক্তি রয়েছে সেগুলি ফুটতে চায়, জগৎব্যাপী হতে চায়।

*** মানুষগুরু মন্ত্র দেয় কানে। জগৎগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।**

ঊনবিংশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— রবিবার, ১৬ই নভেম্বর হইতে
বৃহস্পতিবার, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৮ পর্যন্ত)

* পাঁজিতে যেমন হরপার্বতী সংবাদ লেখে তেমন হরপার্বতী সংবাদ আমার মাথায় হোত। সেই হরপার্বতী সংবাদেই বলেছিল— ''**পকেটমার সাধু**''। অর্থাৎ সাধু যা দেখতে পাস সব পকেটমার সাধু রে— সব পকেটমার!

* **কেষ্টদা (কৃষ্ণ মহারাজ) মোজেসকে দেখেছিল**। দেখেছিল— আমি Ten Commandments লিখছি, আর তার পাশে একজন দাঁড়িয়ে। কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করেছিল— ওই পাশের লোকটি কে? আমি বলেছিলুম— সে তুমি।

* **আমায় বলেছিল— আমি জন্ম-সন্ন্যাসী**। জন্ম থেকে এই রকম। সন্ন্যাসী— ন্যাসী-ন্যাসী জগৎগুরু। অমরের স্বপ্নেও সেই জিনিসই দেখিয়েছে। (Food Department-এর অমরবাবু স্বপ্ন দেখেছেন— শ্রীজীবনকৃষ্ণ একটি খাটে শুয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর পাশে শ্রীজীবনকৃষ্ণের আর এক শিশুমূর্তি। শিশু জীবনকৃষ্ণের মুখে ঠাকুরের মত দাড়ি। দাড়ি জ্ঞানের চিহ্ন। অমর বাবুর স্বপ্নে প্রকাশ পেয়েছে যে শ্রীজীবনকৃষ্ণ জন্ম হতেই জ্ঞানী এবং সন্ন্যাসী।)

* **এই পৃথিবীকে বলে ব্রহ্মাণ্ড, অর্থাৎ ব্রহ্মের অণ্ড**। ডিমের মধ্যে থাকে পাখীর ছানা। ঠিক সময় হলে সে খোলা ছেড়ে বাইরে এসে পৃথিবীময় বিচরণ করে বেড়ায়। মানুষ তেমনি ব্রহ্মের একটি অণ্ড। সেও

এই দেহের আবরণ ছাড়িয়ে জগদ্ব্যাপী হয়ে বেড়াতে পারে। তাই এই জগৎকে বলে ব্রহ্মাণ্ড।

* **'অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধরতে পারে?'**— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথা পাঠ করা হলে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলে উঠলেন— ঠাকুর এ কি কথা বললেন রে? অখণ্ড মানে যার খণ্ড নেই, অর্থাৎ এক। আর সচ্চিদানন্দ মানে ব্রহ্ম। সেই সচ্চিদানন্দকে সকলে ধরতে পারে না? ঠাকুর একি বললেন? আর ঈশোপনিষদে ঋষির প্রার্থনা তোদের মনে আছে তো? ঋষি বলছে, হে সূর্য! তুমি তোমার তেজ সংযত কর। আমি সূর্যমণ্ডলস্থ পরমব্রহ্মকে দর্শন করি। পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি। যো'সাবসৌ পুরুষঃ সো'হমস্মি।। ঈশ উপনিষৎ। ১৬

[অনুবাদ— হে জগতের পোষণ কর্তা, হে একর্ষি, হে যম (সংযমন কর্তা) হে সূর্য, হে প্রজাপতি তনয়, তোমার রশ্মি সংযত কর, তোমার তেজ সঙ্কুচিত কর। তোমার যে কল্যাণতম অতিশোভন রূপ তাহাই আমি দর্শন করি। কারণ ওই যে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ, তিনিই আমি।]— ঠাকুর যে জিনিস থেকে মানুষকে বঞ্চিত করলেন, দূরে সরিয়ে দিলেন, পরমব্রহ্ম সেই জিনিসকে মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দেখালেন সেই পরমব্রহ্মকে ধারণা করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে। কত তফাৎ বল দেখি! এর root কোথায় জানিস? সেই স্বপ্ন— দুজন থাকবে না, একজন থাকবে।

* **তিনি পুরুষ, কি প্রকৃতি— এসব প্রশ্নই ওঠে না**। তোরা যখন আমাকে দেখিস তখন আমি কি? তোরা বলবি— পুরুষ। কেননা সেটা পুরুষের রূপ তো বটে। আমি তো তোদেরকে বলেছি, স্বপ্নে যখন তোরা আমাকে দেখিস তখন তোরাই ওই রূপে পরিবর্তিত হোস। তোদের বেলায় না হয় বলবি— পুরুষ। কিন্তু বাড়িতে যে মেয়েরা দেখছে? মেয়েরা নিজেরাই ওই রূপে পরিবর্তিত হচ্ছে। তখন কি বলবি? মেয়েছেলে হয়ে তারা পুরুষে পরিবর্তিত হচ্ছে কি রকম? পুরুষ প্রকৃতি ওসব ভেদ ব্যবহারিক জগতে। আত্মিক জগতে কোন ভেদ নেই।

* **আর একটা ভয়ানক কথা ওই 'সংস্কার'**। সংস্কার থাকা চাই, সংস্কার থাকা চাই। যারা ওই সংস্কারের কথা বলে তারা ভগবানে বিশ্বাস করতে পারছে কই? দেখ্‌, এখানে যা হয়েছে তাতে 'সংস্কার' কথাটা থাকছে কোথায়? ..... জাহাঙ্গীরের বন্ধু (হীরামানিক) বম্বেতে আমাকে স্বপ্নে দেখেছিল। তারপর সে আর একটা কি স্বপ্ন দেখেছিল, চিঠি লিখেছিল স্বপ্নের মানে বলে দিতে। আমি ভাবলুম— সে কি? আমি কেন স্বপ্নের মানে লিখে দিতে যাই? যে স্বপ্ন দেখিয়েছে, সেই ওর মানে বলে দেবে। তার দুমাস পরে চিঠি এল— সে ওই স্বপ্নের মানে পেয়েছে। ওদের (যারা সংস্কারের ওপর জোর দেয়) ভগবানে বিশ্বাস কই? ওরা ভাবে খানিকটা তিনি করছেন, খানিকটা আমি করছি। তাই এই গণ্ডগোল। ব্যষ্টির সাধনে এই গণ্ডগোল থাকবেই। দেখ, ওরা নাস্তিক, আমি আস্তিক। (শ্রীজীবনকৃষ্ণের হুঙ্কার)।

* আজ রবিবার, ২৩শে নভেম্বর। **বঙ্কিমবাবু ফেলুদার কাছ থেকে শ্রীজীবনকৃষ্ণ রচিত 'বোধিসত্ত্ব' নামক নাটকটি নিয়ে এসেছেন**। নাটকটির কয়েকটি অংশ শ্রীজীবনকৃষ্ণ নিজে পড়ে শোনালেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণের কণ্ঠে নাটক পাঠ এই প্রথম শোনা গেল। কি অপূর্ব রচনা, কি অপূর্ব বাচনভঙ্গী!

বোধিসত্ত্ব নাটকটিতে ধনপতি শ্রেষ্ঠীর নাম দিয়ে বুদ্ধদেবের জীবনী অঙ্কিত করেছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। ৩৩ বছর বয়সে রচনা এই নাটকটি। যখন যোগসিদ্ধ অবস্থায় তিনি উপনীত হননি তখন ধনপতির মুখ দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার বাসনা প্রকাশ করেছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। কী আশ্চর্য! নাটক রচনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণ যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ৩৩ বছর বয়সে, সে ইচ্ছা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠতে চায় তাঁর ৬৬ বছর বয়সে। এই প্রসঙ্গে আরও প্রকাশ পেল যে তিনি বহু আগে অবসর সময়ে কয়েকটি নাটক রচনা করেন। কিন্তু বেদান্ত সাধনের পর তিনি আর নাটক রচনা করতে পারেন নি এবং তাঁর রচিত নাটকগুলির সন্ধানও আর রাখেন নি।

* **বেদে বলেছে, ব্রহ্মজ্ঞান মানে এক হওয়া। কিন্তু সে এক হওয়া যে কী তা তারা বলতে পারে নি। কিন্তু তার পরেও আছে— সে অবস্থা হচ্ছে আনন্দ**। (একজন নিত্যযাত্রীকে) তোর মনে আছে, তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলি কেউ আমাকে দেখলে আমার আনন্দ হয় কি না? আমি বলেছিলুম— হ্যাঁ, হয়। এই আনন্দ নিয়েই সে বেঁচে থাকে, কেননা আনন্দই জীবনী-শক্তির উৎস। আজ আরও একটা কথা শুনে রাখ— যত লোক আমায় দেখতে থাকবে আমার পরমায়ু তত বৃদ্ধি পাবে। (এক ভদ্রলোক) — যারা আপনাকে দেখছে তাদেরও পরমায়ু বৃদ্ধি হবে তো?

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— ব্রহ্মচারী আর সাপের গল্পের কথায় আপনাদের বলেছি যে সচ্চিদানন্দগুরু দেহেতে উদয় হলে, সাধন শেষ না হলে দেহ যাবে না। এর আরও একটা physical explanation আছে। বিষয় চিন্তা মানুষকে কাবু করে দেয়। এই যে এখানে বসে আছেন, ভগবানের কথা শুনছেন, এতে বিষয় চিন্তা চাপা পড়ে আছে, মন উপরে উঠে আছে। এতে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাবারই তো কথা। তবে চোখের সামনে না দেখলে আমি তো কিছু নেবো না।

* **পূর্ববর্তী আচার্যেরা কেন উন্মাদ হয়েছিলেন তা আজ সকালে বলেছি**। সমষ্টিগত সাধন তো কারো হয় নি। কেউ বলতে পারে— কেন, বুদ্ধদেব? না— তাঁরও না। সমষ্টিগত অনুভূতিমূলক সাধন কারো হয় নি। তাঁরা চেষ্টা করে দেহেতে যে শক্তি উদ্ভূত করেছিলেন সেই শক্তির জালে নিজেরা জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই উদ্ভুত শক্তির তেজ তাঁদের দেহ ধারণ করতে না পারায় তাঁরা উন্মাদ হয়েছিলেন।

* কে একজন ফ্রেঞ্চ মিনিস্টার (আঁদ্রে ম্যালরো) ভারতবর্ষে এসেছেন। খবরের কাগজে নাকি বেরিয়েছে যে ১৯৩৭ সালে যখন তাঁর সঙ্গে জওহরলালের দেখা হয় তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে **হিন্দুধর্মে এমন কী আছে যার জন্যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে লোপ পেল?**

খুব intelligent আর চিন্তাশীল লোকের প্রশ্ন। স্বামীজী তো অত ঘুরেছেন, অত লোকের সঙ্গে দেখা করেছেন কিন্তু এ রকম প্রশ্ন কেউ

তাঁকে করেছে বলে জানা যায় না। চট করে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় শক্ত। আর, একটা aspect নিয়ে এর উত্তর দিলে সেও ঠিক হবে না। বৌদ্ধধর্মে তিনটে স্তর ছিল— (১) Superclass যারা ছিল তাদের ধীরে ধীরে overpower করেছিল বৈদিক কৃষ্টি সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা। বুদ্ধদেব ভগবান মানতেন না। ঈশ্বরীয় অনুভূতি বৌদ্ধরা কিছু পায় নি। তাই বৈদিক কৃষ্টি সম্পন্ন হিন্দু ব্রাহ্মণেরা ওই সব Superclass বৌদ্ধ পণ্ডিতদের অনুভূতি দান করে কাবু করে দিয়েছিল। মানুষটা নিজের ভেতরে যখন দেখবে তখন তার বিরুদ্ধে যাবে কি করে? তারা এই অনুভূতি লাভ করতে লাগল বলে বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে দিতে লাগল। (২) দ্বিতীয় স্তরকে কাবু করেছিলেন কুমারিল ভট্টের মত পণ্ডিতেরা। কুমারিল ভট্ট বৈদিক কর্মকাণ্ডকে সংক্ষেপ করে দিলেন। তারপর এর সঙ্গে ছিল হিন্দুদের সাংখ্য, পাতঞ্জল, গীতা, ভাগবত। আর Finally এলেন শঙ্কর। বৈদিক কর্মকাণ্ড সংক্ষিপ্ত হয়ে ওঠায় বৌদ্ধরা ধীরে ধীরে began to give away। (৩) বৌদ্ধদের তৃতীয় স্তরে ছিল বজ্রযান সম্প্রদায় যেটা পরে ওই বৌদ্ধ-তন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। এরা খুব নেমে গিয়েছিল এবং ক্রমে হিন্দু তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে merged হয়ে যায়।

এতগুলি কারণের জন্য বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে লোপ পেয়েছিল।

* **বিল্বমঙ্গল নাটকে গিরীশ ঘোষ বলেছে কৃষ্ণ দর্শনের ফল কী? না, কৃষ্ণদর্শন**। ওরে, বুঝছিস আমি কি বলছি? আমাকে দেখার ফল কি? না, আমাকে দেখা। রেখে দে তোদের পরমব্রহ্ম! যে একদিনের জন্যেও আমায় দেখেছে সে জগতে এই প্রমাণ বয়ে এনেছে যে এক বহু হয়েছে, আর বহু এক হয়েছে। তার জন্ম সার্থক, তার জীবন সার্থক! এর পরে তো আর কিছু নেই।

কেন আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি বল দেখি? আত্মিক জগতে আমরা সকলে যে এক সেই প্রমাণ বয়ে নিয়ে এসেছি। বেদে বলেছে — একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। বেদের সেই কথার প্রমাণ আমাদের জীবন। তাই আমাদের জন্ম সার্থক, আমাদের জীবন সার্থক।

আহা কি কথাই শুনছিস তোরা।

বিংশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৮ হইতে
৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৯)

* **গীতায় বলেছে— অনিত্যম্ অসুখম্ লোকমিমম্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্**।— এই জগৎ অনিত্যম্ অসুখম্। আর আমি রাত্রদিন ‘আনন্দকে’ (একজন যুবক) দেখি। কেন বল দেখি? আনন্দই আমার স্বরূপ। শুধু কি আমার? না, সকলেরই স্বরূপ সেই আনন্দ। আর তাকেই গীতা বলছে কিনা অসুখম্। গীতায় ভগবান বিদ্রোহী কথা বলা হয়েছে। কই দাশুবাবু, শিববাবু, আপনারা তো সব গীতা একস্‌পার্ট। গীতার কথা রক্ষা করুন। কোথায় তলিয়ে যায় গীতার কথা দেখছেন।

* **ওরা কী বলছে রে? হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল?** মানুষকে কেবল মৃত্যুভয় দেখিয়ে তাকে কাবু করে এসেছে। সে কি? আর আমার কি হয়েছে বল দেখি? আমি বলছি, আমি এই দেহ নিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকতে চাই। এই জীবনে কত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সে সব কথা কিছু মনে আসে না। আমি জীবনে এমন একটা কি পেয়েছি যার জন্যে বলছি আমি চিরকাল বেঁচে থাকবো। এই দেহ পেয়েছিলুম বলেই তো সেই অপূর্ব জিনিসের আস্বাদন ভোগ করছি। Life is so dear to me that I cannot part with it। এখন বলতে পারিস আমি কি পেয়েছি?

* দেখ্ **ব্যষ্টির সাধন এই দেহে যা হয়েছে তেমন কারো হয়েছে বলে তো মনে হয় না**। সে সব দর্শন অনুভূতির কোন রেফারেন্স তো পাই না। তবুও এই ব্যষ্টির সাধনকে উচ্ছেদ করে দিয়েছি। এই ব্যষ্টির সাধন কিছু নয়, মানুষের সংস্কারই ফুটে ওঠে। একটা মানুষ যে পরিবারে জন্মায় সেই পরিবারের সংস্কার,— গোষ্ঠীর সংস্কার— দেশের সংস্কার— গোটা মনুষ্যজাতির সংস্কার থাকে তার মধ্যে। সেই সমস্ত সংস্কার নিয়েই সে জন্মায়। ব্যষ্টির সাধনে সেই সব সংস্কারই ফুটে ওঠে, আর কিছু নয়।

* **ব্যষ্টির সাধনকে আমি কেন উড়িয়ে দিই** তোদের বলি শোন। ব্যষ্টির সাধনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি— ভগবান দর্শন। অবশ্য এই রকম আরও অনেক অনুভূতি আছে। ভগবান দর্শনের সময় সচ্চিদানন্দগুরু ভগবানকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বলছেন— 'এই ভগবান, এই ভগবান দর্শন! পাছে উত্তরকালে কোন সংশয় জাগে তাই তিনি দুবার বলেন— এই ভগবান দর্শন!' দেখিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন। দিয়ে তিনি সেই ভগবানের মধ্যেই লীন হয়ে গেলেন। দেখ্, ভগবানকে যে দেখা যায় সে কথা তো আমি জানতুম না। তবে ভগবানকে দেখলুম কি করে। যতদূর ভেবে দেখেছি সেই ঋষিদের যুগে কখনও কারো ভগবান দর্শন হয়েছে, আর তার পরে বহুযুগ পেরিয়ে এসে ভগবান দর্শন হয়েছে ঠাকুরের। সেই সংস্কার কি রকম ভাবে আমার দেহে ফুটেছে। আচ্ছা, এ কি শুধু আমার দেহেই সেই সংস্কার ছিল? না, সকলের দেহেতেই আছে। আমার এই দেহ পেয়েছি কোথা থেকে? পঞ্চভূত থেকে, কেমন না? সেই পঞ্চভূতেই তা হলে ওই সংস্কার মিশিয়ে ছিল। সেই সংস্কারই ফুটে উঠল আমার দেহে। আবহমানকাল ধরে মানুষ চেষ্টা করে এসেছে কি করে সকলকে এক করা যায়, তাদের সেই ইচ্ছা কিরকমভাবে যেন রূপধারণ করে ফুটে উঠেছে।

* আজ (৭/১/৫৯) ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধ্যান করতে বসার সময় মনে পড়ল— এমনই এক শীতের দিনে ভোর রাত্রে ধ্যান করবার সময় আমার চৈতন্য সাক্ষাৎকার হয়েছিল।

* **ঈশ্বর বস্তুটি কী বল্ দেখি?** মনে কর তোরা জ্যোতি দর্শন করলি। সে জ্যোতি কি তোদের মাথা ছেঁদা করে ভেতরে ঢুকে পড়ল? তা তো নয়। অর্থাৎ, তোরই পরিবর্তিত রূপ হোল জ্যোতি। তা হলে ঈশ্বর কি? মানুষটার পরিবর্তিত অবস্থাই হোল ঈশ্বর।

* বলে, বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর। শুধু একটুখানি যোগ করে দিলেই পারত যে বিশ্বাস কতদিন করতে হবে? কৃষ্ণ পাওয়া যাবে কবে? এই বিশ্বাস কী? না, একটা illusion। বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে Man works under an illusion। বিশ্বাস কি রে? কৃষ্ণ আছেন মানুষের ভেতরে। তিনি কৃপা করে মানুষের দেহে ফুটে উঠবেন। তবে মানুষ কৃষ্ণ পাবে।

* **প্রেম কথাটার আর এক ব্যাখ্যা শুনে রাখ**। প্রেম হলে কি করে? যাকে ভালবাসে তাকে আপনার করে নিতে চায়।— কেমন না? আমার প্রেম হয়েছে। আমি আমাকে এতই ভালবাসি যে জগতে যাকে পাই তাকেই আমাতে পরিবর্তিত করে নিই। এ প্রেম তাই জগৎব্যাপী। তাই তো বলে ঈশ্বর প্রেমময়। তাঁর কাছে কি বড় ছোট আছে রে? দেখনা, এ ঘরে যে আসে ধাঙ্গড় মেথর পর্যন্ত সেও আমাতে পরিবর্তিত হয়ে তবে যায়। এই হল প্রেম! আজ প্রেমের কি মানে শুনলি বল দেখি! জগতে এমন কথা কেউ বলেনি রে!

* **আমাকে নিয়ে এই ভেল্কি কেন?** I am the most mysterious man in the arena of the universe. আমার মত এমন Mysterious man পৃথিবীতে আর জন্মায় নি। কেন বল দেখি? ধর্ম সম্বন্ধে এ যাবৎ যা কিছু সংস্কার চলে এসেছে সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। দেখাচ্ছে যে ধর্ম একজন জীবন্ত মানুষকে নিয়ে। ক্ষিতীশের ভাইকে আজ (২৪/১/৫৯) সকালে তাই বলছিলুম— এই যে কত লোক বহু আগে থেকে আমায় দেখেছে, কেন জানিস? I am one with Nature : nay, a bit more. I am the Nature!

একবিংশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ৭ই মে, বৃহস্পতিবার, ১৯৫৯ হইতে
২০শে নভেম্বর, শুক্রবার, ১৯৫৯ পর্যন্ত)

* **তোদের কাছে চারটি প্রশ্ন করা রইল**। এ সম্বন্ধে তোরা যে যা ভাবতে পারিস ভাবিস, যদি কোন উত্তর তোদের মনে আসে বলিস—

১। এটা কি হচ্ছে? ২। কি করে হচ্ছে? ৩। কেন হচ্ছে? ৪। কে করছে?

তোরা যে আমাকে দেখছিস এতে যে ধর্ম হচ্ছে তা তোদের কে

বললে? একজন লোককে দেখাটা যে ধর্ম তা কোথাও আছে কি? কি করে হচ্ছে তা আমি জানি না, কেন হচ্ছে তা জানি না, কে করছে তাও জানি না। যদি এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যায় তবে অতীত ধর্মজগতের সব কিছু উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

* আজ বিকালে (১১-৬-৫৯) পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি— **নির্গুণ ব্রহ্ম কী?** কি রকম জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল। নির্গুণ ব্রহ্ম— একি macrocosm-এ বলছে, না microcosm-এ বলছে? macrocosm নয়। কারণ macrocosm-এর রূপ আমরা পেয়েছি। এ microcosm-এ বলছে। 'আমি' বললেই আমার গুণ বোঝায়, আমার শক্তি আমার ঐশ্বর্য বোঝায়। দেহের যে গুণ যে শক্তি আমাদের জানা নেই তাকেই ওরা নির্গুণ বলছে। একেই ওরা বলছে— ত্রিপাদ জগতে প্রকাশ, এক পদ অপ্রকাশ। আমি বলি না, যে ওরে, সগুণই সব? ওরাও তাই বলছে। নির্গুণ মানে তো নাস্তি নয়, সগুণের অপ্রকাশ হোল নির্গুণ। Plato একেই বলেছে— The Great unknown and unknowable! Unknown বটে, কিন্তু unknown হলেই তো আর unknowable থাকে না। আমার এখন যেন কেমন মনে হচ্ছে বেদের ঋষিরা এই দেহের কথাই বলে গেছে। The unknown faculties of human body-কেই ওরা নির্গুণ বলে গেছে।

* Don't miss me. Don't miss me now. আমার এখন একটা অদ্ভুত অবস্থা চলছে। Don't miss me now.

* আজ (১২-৫-৫৯) সন্ধ্যার পর সকলে সমবেত হলে শ্রীজীবনকৃষ্ণ complete Works of Swami Vivekananda Vol.3 বইটি ক্ষিতীশবাবুর হাতে দিলেন। তাঁর নির্দেশ মত ক্ষিতীশবাবু স্বামীজীর Unity the Goal of Religion শীর্ষক বক্তৃতার কিছু অংশ পড়ে শোনালেন। সেই বক্তৃতাংশে স্বামীজী যা বলেছেন তার মর্ম এই—

মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে প্রত্যেক ধর্মেই সে কথা বলা হয়। কিন্তু সেই ঐক্যটি কি তা কেউ বোঝাতে পারে নি।

রসায়ন শাস্ত্রে নানা উপাদান ও তার মিশ্রণের কথা আছে। কিন্তু মৌল উপাদান যা থেকে অন্য সমস্ত উপাদান উদ্ভুত হয়েছে সেটি আবিষ্কার করতে পারলে যেমন রসায়ন শাস্ত্রের চরম জ্ঞান লাভ করা যায়, তেমনি মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে তার সন্ধান লাভ করতে পারলে ধর্ম জগতে জ্ঞান চরম সীমায় পৌঁছাতে পারে। স্বামীজীর মতে বেদান্ত এখনও সেই চরম ঐক্যের সন্ধান করছে। Vedanta continues its search for the final unity.

পাঠ সমাপ্ত হলে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, স্বামীজীর এই কথার মানে কী? তিনি বলছেন, তাঁর সময় পর্যন্ত বেদান্ত সেই চরম ঐক্যের সন্ধান করছে। অর্থাৎ বেদান্ত পূর্ণত্ব লাভ করেনি, বেদান্ত অপূর্ণ। বেদান্ত মানে কী? বেদের অন্ত, অর্থাৎ জ্ঞানের শেষ। অথচ এই বেদান্তই চরম ঐক্যের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। তাহলে বেদান্ত কথাটা যে misnomer হয়ে দাঁড়ায়। আবার দেখ, বেদান্তমতে সিদ্ধ হলে তাকে পরমহংস বলে। বেদান্তই যদি অপূর্ণ থাকে তাহলে সিদ্ধ হচ্ছে কী করে? আজ পর্যন্ত যত পরমহংস হয়ে এসেছে তাদের অবস্থা দাঁড়াচ্ছে কোথায়? ঠাকুরকে (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে) কোথায় টেনে ফেললেন স্বামীজী? বেদান্ত গেল, পরমহংস গেল, তাহলে রইল কি?

এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে,
..... যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

তাহলে রইল কী?

* **আমাদের এখানে যা হয়েছে তা বেদান্তের পরিপূরক কিনা?**— না। বেদান্ত মানুষের ভিতরকার ঐক্যের কথা বলেছে। এখানকার ঐক্য কি রকম? ভিতরেও বটে, আবার বাইরেও বটে! তোরা ভিতরেও আমাকে দেখছিস, আবার বাইরেও আমাকে দেখছিস। অর্থাৎ, একটা জীবন্ত মানুষকে নিয়ে সেই ঐক্য। এটা বেদান্তকে কুক্ষিগত করছে না? তাছাড়া বেদে শুদ্ধাচারের কথা আছে। আর এখানে শুদ্ধাচার? গোলাম (উলুবেড়িয়া,

আলপুকুর নিবাসী) আমাকে দেখেছে, মহম্মদ (বেলিলিয়াস রোড নিবাসী, ঘোড়ার গাড়ীর এক চালক) আমাকে দেখেছে, তাদের শুদ্ধাচার?

দেখ্, বাপ আমায় দেখছে, মা আমায় দেখছে, ছেলে আমায় দেখছে, মেয়ে আমায় দেখছে, শিশু আমায় দেখছে, প্রতিবেশী আমায় দেখছে, বাড়ির ঝি চাকরও আমাকে দেখছে। আমি তা হলে কে? বাপ? না মা, না ছেলে, না মেয়ে, না শিশু, না বাড়ির দাস দাসী? আমি তা হলে কে? আমি সব হয়েছি। বাপ মা ভাই বোন ছেলে মেয়ে আমিই সব। আত্মিক জগতে আমিই সব। ব্যবহারিক জগতে আমার বহু রূপ। সব আলাদা।

* **হ্যাঁরে ''রাধাঋণের'' কথা শুনেছিস তোরা?** ওই যে রে মহাপ্রভু এসেছিলেন রাধার ঋণ শোধ করতে। এই রাধাঋণ মানে জানিস কেউ? রাধা মানে এই দেহ। দেহের যে কী অনন্ত শক্তি আছে তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। মানুষের এই অনন্ত শক্তি সে পাচ্ছে কোথা থেকে? এই দেহ থেকে। রাধাঋণ শোধ হয় কখন? যখন সে জগৎব্যাপী হয়ে নিজেকে জগতের মধ্যে বিলিয়ে দেয়, যখন সে আত্মদান করে।

আজ (১৪-৬-৫৯) সকালে একটা দৈববাণী শুনেছি। সে দৈববাণী আমিই আমাকে করেছি। আজকাল বাইরে থেকে কোন দৈববাণী তো হয় না। এর সঙ্গে আরও আছে। একটা বড় হল ঘর। সেই ঘরে আমি গেছি আমার জামাটা আনতে। কিন্তু জামাটা খুঁজে পেলুম না, ফিরে এলুম। তখন আমিই আমাকে বলছি— তোর সব ঋণ শোধ হয়ে গেছে। এর মানে তোরা কেউ বলতে পারিস?

* **ঠাকুর বলছেন, আমি মন্ত্র দিই না**। ঠাকুর কিন্তু মন্ত্র জানতেন। তিনি মা ঠাকরুণকে কত মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। আর আমি? আমি তো কতবার তোদের বলেছি যে ওরে আমি মন্ত্র জানি না। এ দুটো জিনিসের মধ্যে কি তফাৎ বল দেখি?

ক্ষিতীশ বাবু— মন্ত্র মিথ্যা। ঠাকুর তা জানতেন; তাই তিনি মন্ত্র জেনেও কাউকে মন্ত্র দেন নি। কিন্তু আপনার মধ্যে কোন মিথ্যার আশ্রয় নেই। তাই আপনি মন্ত্র জানেন না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— হ্যাঁ রে, মন্ত্র মিথ্যা। আচ্ছা, মন্ত্র যে মিথ্যা তার প্রমাণ কি?

এক ভদ্রলোক— আমরা আপনাকে দেখি কেন? মন্ত্র সত্য হলে আমাদের দেহে তো মন্ত্রই ফুটতে পারত।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— তোরা যে আমাকে দেখিস সে এক প্রমাণ বটে। আর এক প্রমাণ আছে। যারা মন্ত্র জানে না তাদের কি করে হচ্ছে? ক্রীশ্চান আমায় দেখছে কি করে? মুসলমান আমায় দেখছে কি করে? ইহুদী আমায় দেখছে কি করে?

* **কথামৃতে ঠাকুর বলছেন— বেদ পুরাণ তন্ত্রে সেই এক ঈশ্বরেরই কথা**। এদের কাছে ঈশ্বর হচ্ছে বড়, আর মানুষ হচ্ছে ছোট। মানুষকে এরা ছোট করেই গেছে। আর আমি বলছি কি? মানুষটাই ঈশ্বর হয়, It is the process of evolution of man। আমার কাছে মানুষ বড়, ঈশ্বর ছোট।

* **অন্যদিন সকালে তোদের মুখ দেখতে দেখতে আমার ঘুম ভাঙে। আজ (১৩-১১-৫৯) সকালে ঘুমও ভাঙছে আর মনে হচ্ছে এখানকার পরিস্থিতি কী?** পায়খানা গেলুম, তখনও ওই কথাই মনে ফুট কাটতে লাগল। ভাবলুম, আজ সকলে এলে পরিস্থিতি কি তা বুঝিয়ে দিতে হবে।

এখানকার অবস্থা কি? পরিস্থিতি কি? এখানে যে কোন ধর্মের লোক আসুক না কেন, সে যে কোন ধর্মাবলম্বী হোক না কেন তাদের সেই ধর্ম বজায় থাকছে। তার ওপর তারা আমাকে দেখছে। মুসলমান আমাকে দেখছে। কিন্তু সে কি বকরিদ করছে না, না নমাজ পড়ছে না, না তার কোরাণ পড়া বন্ধ হয়ে গেছে? সে মুসলমানই আছে, তার ওপর সে আমাকে দেখছে। বৌদ্ধ আমায় দেখছে কিন্তু সে কি হিন্দু হয়ে গেছে? সে বৌদ্ধই আছে। তাদের ধর্ম বিশ্বাস যাই হোক না কেন, সে যা ধর্ম কর্ম করে তা বজায় থাকছে। তার ওপর তারা আমায় দেখছে। এই হচ্ছে এখানকার পরিস্থিতি।

এ হচ্ছে স্বামীজীর সেই point of union আর point of

harmony। সব ধর্ম বজায় থাকছে, অথচ তার মধ্যে harmony পাচ্ছি কোথায়? আমাকে দেখা! আবার, সব মানুষের মধ্যে point of union পাচ্ছি কোথায়? আমাকে দেখা। সমস্ত ধর্মের মধ্যে হোল point of harmony আর সমস্ত লোকের মধ্যে হোল point of union। এর পরে কী হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাই কেন? আপনা থেকে যা হবার হবে।

* **দেখ দেখি কী বলছে? 'নিবিড় আঁধার মধ্যে মহাকাল মহাকালীর সঙ্গে রমণ করছে।'** মানুষকে কোথায় ঠেলে দিচ্ছে বল দেখি। মানুষ কি বুঝবে? মহাকাল মহাকালীকে খুঁজতে কোথায় যাবে সে? আচ্ছা, যদি ওকথা না বলে এইভাবে বলতো তবে কত ভাল হোত, মানুষ কত সহজে বুঝে যেত যে—

এই দেহ আর দেহস্থ চৈতন্যের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ চলেছে মানুষটা কি তাই জানার জন্যে। তা হলে সে কত সহজে বুঝে যেত। এতেও যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, আরও সহজ করে বলা যায় যে এই দেহ আর আত্মা; এদের মধ্যে অনবরত চেষ্টা চলেছে দেহস্থ চৈতন্যকে নিঃসৃত করার জন্যে।

* **ঠাকুর বলছেন, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না।** Oh! then what did he come here for? মানুষকে তিনি কী দিয়ে গেলেন? কাঞ্চনের কথাই প্রথমে ধরি। কাঞ্চন ত্যাগ কার হয়েছে? ওরা বলবে, কেন? সাধু, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ। বেশ, সে না হয় ভিক্ষা নিল। কিন্তু যে ভিক্ষা দিল সে ওই অন্ন সংগ্রহ করেছে কি ভাবে? কাঞ্চন দিয়ে,— কেমন না? তাহলে সাধুরও তো পরিগ্রহ হয়ে গেল। কাঞ্চন ত্যাগ হোল কোথায়? ঠাকুর এমন কথা বললেন যা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য না হলে সে কথার মূল্য কী? কোহিনুর যখন কয়লার খাদে ছিল তখন তার মূল্য কী ছিল? মানুষের হাতে পড়েই না তার মূল্য হোল! মানুষের কাজে যদি না এল তবে ঠাকুরের কথার মূল্য কী? আমি কি কখনও এসব কথা বলেছি? For

any day? any time? any moment? No, never! ঠাকুরের কথার মানে আমি অন্য দিক থেকে ধরেছি। ঠাকুরের কথার এক অর্থ এই হয় যে এসব জিনিস কখনও কারো হয় নি। ওরে, **একটা গল্প মনে পড়ে গেল। বলি শোন—**

এক পাঠশালে এক পণ্ডিত মশাই পড়াতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল ছেলেদের অঙ্ক দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া। ছেলেদের অঙ্ক কষতে যেটুকু সময় লাগত তার মধ্যে তিনি একটু ঝিমিয়ে নিতেন। এখন ছেলেরাও একটা মতলব করল। পণ্ডিত অঙ্ক দিয়ে ঝিমুবার উদ্যোগ করছেন, আর ছেলেরাও তাড়াতাড়ি অঙ্ক কষে নিয়ে হাজির। পণ্ডিত মশাই তো গেলেন রেগে, বললেন, দাঁড়া বেটারা, এবার এমন অঙ্ক দেব যে তোদের বাপ চোদ্দপুরুষও সে অঙ্ক কষতে পারবে না। তা ঠাকুর আমার এমন কথা বললেন যে চোদ্দপুরুষে কখনও কারো কিছু হবে না।

ওরা মানুষের common frailty-কে আঘাত করে মানুষটাকে কাবু করে দেয়। আমি কি কখনও কোন কথা তোদের বলেছি? ভণ্ডুল (পরে আত্মানন্দগিরি, বৃন্দাবনের এক মঠাধীশ) একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দাদা, ব্রহ্মচর্য? সে অনেক দিনকার কথা। তখন সে গেরুয়া পরে নি। আমি তাকে বলেছিলুম, দেখ ভণ্ডুল, **ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মচর্য করে ব্রহ্মচর্য হবে কি না জানি না কিন্তু যদি ভগবান ভগবান কর তবে ভগবান হয়ে যাবে।**

দ্বাবিংশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ২৪শে নভেম্বর ১৯৫৯ থেকে
১১ই ডিসেম্বর ১৯৫৯ পর্যন্ত)

* **জগতে দ্বৈতবাদই তো চলে এসেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যে দ্বৈতবাদ পৃথিবীর অপর জায়গায় কই?** কোথাও নেই। শীতলার কথা হচ্ছিল তাই মনে পড়ে গেল। ঠাকুরের বাবা ফুল তুলছেন, একটি ছোট মেয়ে আঁকশি দিয়ে গাছের ডাল নুইয়ে দিচ্ছে। ঠাকুর বলেছেন সেই ছোট মেয়েটি শীতলা। 'ঠাকুরের রামলালা, গোপালের মার গোপাল' এ দ্বৈতবাদ পৃথিবীর আর কোথাও কৈ?

*** আচ্ছা, প্রহ্লাদ-চরিত্র অভিনয় দেখতে দেখতে ঠাকুর কাঁদছেন কেন?** ও তো কবির কাব্য নাটক করে লেখা। প্রহ্লাদ ছিল কোথায়? কবে এ সব হয়েছিল? ওরে, এ সব Daniel-এর কাহিনী থেকে নেওয়া। Daniel ছিল প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার লোক। সে ছিল Jew-দের prophet। তার জীবনে এ সব কাহিনী পাওয়া যায়। ওই Daniel-এর কাহিনী থেকেই প্রহ্লাদ-চরিত্র নেওয়া। তোদের ধর্মে আছে কি রে? সবই তো কবির কাব্য! ওরে ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যজীবনের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতি, যে গতিতে মানুষটা জগদ্ব্যাপী হয়ে যায়।

ওদের fundamental mistake কোথায় হচ্ছে জানিস? সকলেই ভাবছে God the creator. I the creator— এ কথা ওরা ধরতে পারে নি। বাইরের জগতকে নিয়েই সকলে গোলমাল করে ফেলেছে।

*** ঠাকুর বলছেন, তিনি কল্পতরু। কল্পতরুর কাছে গিয়ে চাইতে হয়।** সাধারণ যোগের দিক থেকে কথাটা ঠিক বটে। দেহ হচ্ছে কল্পতরু। দেহের কাছে যে যা চাইবে সে তা পাবে। কিন্তু তা ছাড়াও আছে। না চাইলেও পাওয়া যায়। ভগবানকে যে দেখা যায় তাই তো আমি জানতুম না। হ'ল কেমন করে?

*** All is one— একথা প্রমাণ হয়েছে। কিন্তু One is all— একথা এখনও প্রমাণ হয়নি।** কাশ্মিরী Shaivism-এ একেই বলেছে সদ্বিদ্যাতত্ত্ব। এতদিন আমি তোদের মুখাপেক্ষী হয়ে ছিলুম। তোরা এসে বললি তবে বুঝলুম। কিন্তু এই সদ্বিদ্যা যদি প্রকাশ পায় তবে আমি যা ভাবব আত্মিক জগতে তাই প্রকাশ পাবে। তবে বাবা, দোহাই তোমাদের। তাই বলে ভেবো না যে হিমালয় পাহাড়কে প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবিয়ে দিতে পারব, আর চীনেরা আসছে বলে হিমালয় পর্বতে প্রশান্ত মহাসাগরের সৃষ্টি করব। ও সব নয়। আমি যা ভাবব আত্মিক জগতে তাই হবে। তখনই প্রমাণ হবে One is all। তবে না হলে তো কিছুই বলার উপায় নেই।

*** এ জিনিসের কি শেষ আছে রে! ৬৭ বছর বয়স, এখনও আমার অনুভূতি হচ্ছে!** সেদিন দেখছি সতীশকে। ওর চোখ দুটো যেন বোজা ছিল খুলে গেল। তারপর আমার ত্রিনেত্রের এখানটায় কি রকম টান পড়ল। সতীশকে জিজ্ঞাসা করলুম— ও কিছু দেখছিল কিনা। ও বললে, আপনাকে দেখছিলুম। আর একদিন স্বপ্নে দেখছি— এক তাড়া সাদা কাগজ তাতে যেন সব সই করা রয়েছে, একটাতে কেবল সই করা নেই। সেই কাগজখানা তুলে ধরে দেখি water colour-এ সব আঁকা রয়েছে। এর মানে করতে পারিস? সাদা কাগজ অর্থাৎ সহস্রার। সেখানে water colour-এ আঁকা অর্থাৎ outline রয়েছে। সেগুলো ফুটবে।

ত্রয়োবিংশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯ হইতে
৩রা জানুয়ারী, ১৯৬০ পর্যন্ত)

* আমি জ্ঞানও জানি না, ভক্তিও জানি না। আমি জানি মানুষ। মানুষ বাইরে বহু, কিন্তু ভিতরে এক!

*** জীবোদ্ধারের কথা এখন শুনতে পারি না, আমার কষ্ট হয়।** এখন feeling এত acute হয়েছে যে এই কথা আর শুনতে পারি না। জীব কই? জীব তো দেখতে পেলুম না, সবই যে শিব।

*** শূণ্যম্ কী?** এই পড়া হচ্ছে, শুনতে শুনতে জিতুকে দেখলুম। তার পরেই দেখলুম আনন্দকে। আমার চোখ মুছলুম না, আনন্দর চোখ মুছলুম। আজকাল এই রকমই হচ্ছে। খেতে, শুতে, বসতে কাউকে না কাউকে দেখছি। দেখাচ্ছে যে আমার অস্তিত্ব কিছু নেই। অপরের অস্তিত্বেই আমার অস্তিত্ব। এই হচ্ছে শূন্যম্, একেই বলে শূন্য।

*** এই যে তোরা আমাকে দেখিস এর এক মানে বলে দিই।** আত্মিক জীবনে তোরা নেই, আমি আছি। জৈবী অস্তিত্বে তোরা, আত্মিক

অস্তিত্বে আমি। এই যে মুখুজ্যে মশাই বসে আছেন, আর ওই তার সন্তান (ভোলাবাবুকে দেখাইয়া), এবার স্বপনকে (ভোলাবাবুর পুত্র) এনে বসিয়ে দে। দেখবি কই ওরা? আত্মিক জীবনে তিন-ই যে আমি হয়ে আছি। একেই ঠাকুর বলেছেন, তিন পুরুষে আমীর জানলে তবে তো লোকে মানবে।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে এর মানে করতে পারিস? অর্থাৎ আমি Eternal (শাশ্বত), (কিছুক্ষণ পরে) তোরা চুপ করে গেলি কেন? জিজ্ঞাসা করতে পারলি না — আমি Eternal কী করে? কেন রে, ওই যে ঈশোপনিষদের সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ। সেই সূর্যমণ্ডলের মধ্যে ১৪/১৫ জন আমাকে দেখেছে।

* **ওই যে রামপ্রসাদের গানে আছে, 'দেহের মধ্যে ছ'জন কুজন, তাদের ঘরে দূর করেছি,'**— ওরা ভুল লিখেছে রে বাবা। কুজন যাবে কোথায়? দেহের বাইরে তো কিছু নেই। ওই কুজনই সুজন হয়। ভগবান হলে কি হয়? ওই ষড় রিপুই ষড়ৈশ্বর্যে পরিণত হয়।

* **Evolution of self কী?** ঠাকুর বলছেন বটে যে ঈশ্বরদর্শন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু সে হচ্ছে practical life এর কথা। আমার কথা principle নিয়ে। মানুষটা জন্মেছে ভগবানে পরিবর্তিত হবে বলে। এটা principle এর কথা। গোলাপ গাছে যেমন গোলাপ ফুল হয় তেমনই মানুষটা জানুক আর নাই জানুক, তার মধ্যে অবিরাম ক্রিয়া চলেছে কি করে সে ভগবানত্ব লাভ করবে। এই ক্রিয়াকেই বৌদ্ধেরা বলেছে perpetual change। না, perpetual change নয়, change বললে ভুল হয়, perpetual evolution।

এই জিনিসটা হচ্ছে evolution of self, – evolution and revelation both। প্রাণময় কোষে জল দেখল, কি হ'ল? Evolution এবং revelation-ও বটে। মনোময় কোষে জ্যোতি দেখল। কি হ'ল? Evolution। সহস্রারে ভগবান দর্শন, সেও evolution নয় কী? আচ্ছা বেশ। তারপর সহস্রার থেকে কণ্ঠদেশ, চৈতন্য সাক্ষাৎকার হ'ল, সেও

তো evolution হচ্ছে। তারপর একেবারে লাফ দিয়ে ঈশ্বরতত্ত্বে চলে যা। সকলের মধ্যে সে ফুটে উঠল। এখানেও সেই revelation। সকলে বললে, ওগো, আমরা তুমি। এই হ'ল evolution of self। ওরা কি evolution-এর কথা বলছে? সে হল material world এর কথা। যেমন কয়লার খাদে মানিক থাকে। মানিক হ'ল কয়লার evolution। এবার দেহতত্ত্বে মেলা। এই দেহ হ'ল কয়লার খাদ। আর সহস্রারে মানিক জন্মায়। হ্যাঁরে, ঠিক মানিক দেখা যায়।

* **ঈশ্বরত্বলাভ করার পর মানুষটা জগতের সকল বস্তুর ঊর্ধ্বে।** তাই ব'লে তার জাগতিক ক্রিয়া থাকবে না তা নয়। ওখানে ওদের নির্লিপ্ত কথাটা কিছুটা ব্যবহার করা যায়। সে জাগতিক বস্তুর ঊর্ধ্বে। আহা আমি কী কথাই বলছি রে! আমি আমাকে প্রণাম করি, আমি আমাকে প্রণাম করি।

* **মরণ মরণ করেই আঁটকুড়ির বেটারা মরেছে।** জীবন জীবন করে যেতে পারে নি, তাই তো আমাকে এতো বকতে হচ্ছে। হিন্দুদের বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ কঠোপনিষদ। এর বিখ্যাত কাহিনী নচিকেতা উপাখ্যান। হিন্দুরা কত শ্রদ্ধার সঙ্গেই না এই উপাখ্যান পাঠ করে। কিন্তু একটু গোল রয়েছে। নচিকেতা মৃত্যুর পরিচয় নিতে গিয়েছিল। কিন্তু সে জীবনটাকে জেনেছিল কি? জীবনটাকে বাদ দিয়ে সে গেল মৃত্যুর পরিচয় নিতে। এই তোদের ধর্ম!

* **ভগবান কৃপাই যদি করেন তিনি কি বেছে বেছে কৃপা করবেন**— এখানে যে এসেছে সেই তো আমায় দেখেছে, মেথর দেখেছে আবার ধোপাও দেখেছে, এখানে সব চেয়ে গায়ে জোর হচ্ছে বাসুর, সে দেখেছে। আবার সব চেয়ে রিকেটি (rickety) একেবারে অষ্টাবক্র বললেই হয় অমিয়, সেও আমায় দেখেছে। ভগবান কি বেছে বেছে কৃপা করবেন বাবা?

* **জগতে এক আমরাই আস্তিক, আর সবাই নাস্তিক।** Vedanta

is no more imperfect. It has become perfect in me, or rather, with me. It was imperfect with Swamiji, but with me it is perfect. But mind that, this Vedanta is not within the fold of Hinduism. It embraces every religion. বেদান্তের মূল কথা কি? একত্ব। মানুষ আগে, ধর্ম পরে। কেননা, ধর্ম তো মানুষেরই সৃষ্টি। তোরা এতদিন ধরতে পারিস নি কেন রে যে with me Vedanta has become perfect? অবশ্য যা হয়েছে তা বেদান্তকেও ছাড়িয়ে গেছে। কেননা, আমি যে একজন জ্যান্ত মানুষ রে বাবা, জ্যান্ত মানুষ।

* **আমি কাল রাত্রে (২৭-১২-৫৯) একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম।** আমি যেন খুব ভাবে রাস্তা দিয়ে চলেছি। এলো গা, পায়ে চটি, এক জোড়া নতুন চটি। রাস্তাটা একটা মোড় ফিরতে আমি চটি জোড়াটা খুলে সেখানেই রেখে চলেছি। পথে তিনজন লোক দেখলুম। তারা যেন একটু দুষ্ট টাইপের লোক। তাদের মধ্যে একজনের যেন ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট হয়েছে। আমি তাকে বললুম, দেখ, কিছু ভেবো না। ভগবানকে ডাক, সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর আমার নিজের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে তাকে বললুম, দেখ, আমার মধ্যেই ভগবান। ভেবেছিলুম, এ স্বপ্নের কথা তোদের বলব না। তা বললেই বা কি! আর আমি যে ভগবান সে তো আমি আগেই জানি। সেই যে গহ্বর থেকে অনাথবন্ধু বলে একজন লোককে টেনে তুললুম, সে আমায় হাত জোড় করে বলতে লাগল, বাবুজি, মশাই, আপনি জানবেন যে আপনি ভগবান, তবে গুপ্তভাবে লীলা। আমি যে ভগবান তা তো আমি জানি তবে একথা আবার বলার দরকার কী? এই স্বপ্নের কিছু মানে করতে পারিস?

* **মহাকারণ মানে কী?** হ্যাঁরে, তুই আমাকে দেখিস। এর কারণ কে— তুই না আমি? আমি! বেশ! আর দেখছিস তোর কোন্ শরীরে? আমি তোর কোন্ শরীরে অবস্থান করি? কারণশরীরে! বেশ! তোর বেলায় আমি হলুম কারণ। আর এই যে সকলে দেখছে? সকলের বেলায় আমি কী হচ্ছি? মহাকারণ! আমি তাহলে হলুম কারণের কারণ মহাকারণ! আর দেখ্ ওরা কী বলছে— মহাকারণে গেলে লয় হয়। কি

হ'ল রে? মহাকারণের ব্যাখ্যা দাঁড়াল কোথায়? বেদ মতে পাঁচটি কোষ, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ আর আনন্দময় কোষ। ঠাকুর বলছেন, সব কোষের অতীত হল মহাকারণ। এ তা হলে কোন মহাকারণের কথা বলে এসেছে রে?

তন্ত্র তো আবহমানকাল ধরে চলে এসেছে। বৌদ্ধদের থেকে যে তন্ত্র এসেছে সে তো ভূতুড়ে কাণ্ড। না, তন্ত্র মানে যোগ। কেউ কেউ বলে তন্ত্র বেদের আগে ছিল। কেননা যোগ তো আবহমানকাল ধরে চলে এসেছে। বেদের সময় এই তন্ত্রের কথা চাপা পড়ে গিয়েছিল। যুগ যুগ ধরে যে তন্ত্র চলে এসেছে তাতে মহাকারণের কথা কী বলেছে? না, মহাকারণে গেলে লয় হয়। এবার তোরা তুলনা কর। এখানে মহাকারণ মানে কী, আর ওরা কী বলেছে! তোরা তো দূরের কথা, আমিই কি এর মানে ধরতে পেরেছিলুম। শালারা গাধা পুজো করিয়ে করিয়ে ব্রণগুলোকে গাধার ব্রণ করে দিয়েছে। No, there is no গাধা, no মা শীতলা here! তাই তো আজ সকালে পড়া হতে হতে যখন হঠাৎ মহাকারণের মানে flash করে গেল তখন ভারী আনন্দ হ'ল। মনটা হৈ হৈ করে উঠেছিল, নাচতে ইচ্ছে করছিল। হ্যাঁরে, ব্রণে একটা শক্ লাগে, তাইতে আনন্দ হয়।

চতুর্বিংশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— জানুয়ারী মাস, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ)

* ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) এসেছেন বলরাম বোসের বাড়ী! মাস্টারমশাই (শ্রীম) বর্ণনা দিচ্ছেন— **'প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা'**। ঠাকুর এসেছেন, প্রেমের দরবার হয়েছে, তাতে ভক্তরা মেলা করেছেন। দেখ্, এখানেও তোরা এসেছিস, ভগবানের কথা হচ্ছে, প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা বসেছে। কিন্তু দুটোর মধ্যে তুলনা করতে পারিস, তফাৎ কি ধরতে পারিস? ওখানে যে প্রেমের দরবার হয়েছে তার প্রমাণ কোথা? ওতো বাহ্যিক, কথার কথা! তোরা আমাকে দেখেছিস, দেখে এক হয়েছিস, এই তো সত্যিকারের প্রেমের দরবার। আর আনন্দের মেলা? সেও ওই এক হয়েছিস বলে। দুই থাকলে

তো আনন্দ হয় না। এই হচ্ছে আনন্দের মেলা, সে ভেতরেও বটে, বাইরেও বটে। এই কথাটা ব্যালান্সে ফেলে তোরা জেনারালাইস (generalise) কর। ওদের ধর্ম বলতে যা কিছু তা হচ্ছে ওই বাইরের কথা। আমাদের কাছে ধর্ম হচ্ছে— a living reality।

* **ঠাকুর বলছেন, ফুল ফুটলে মধুকর আপনি এসে জোটে**। এ কথার আমরা ব্যাখ্যা দিয়েছি যে ঠাকুরের সহস্রার ফুটেছিল, তাই ঠাকুরের কাছে সব ভক্তরা এসেছিল। কিন্তু বেদের সঙ্গে এ কথার মিল নেই, এ বেদের বিপরীত কথা। বেদ বলছে— তিনি বিভিন্নভাবে নিজের রস নিজে আস্বাদন করেন। সে কথা সার্থক হয়েছে এখানে। যারই সহস্রার ফুটছে আমি মৌমাছি হয়ে তার রস আস্বাদন করছি।

* **ঠাকুরের কথা— ছলরূপী নারায়ণ, খলরূপী নারায়ণ, লুচ্চারূপী নারায়ণ ইত্যাদি**। সব নারায়ণই যদি হলো তার ছলরূপ খলরূপ কেন? ভুল কোথায় হচ্ছে জানিস? আত্মিক জীবন আর ব্যবহারিক জীবনকে এক করছে বলে। হ্যাঁরে রবি, তুই আমাকে দেখেছিস, তোর নাম কী? রবি। হ্যাঁরে শৈল, তুই আমাকে দেখেছিস, তোর নাম কী? শৈল। হ্যাঁরে সন্তোষ, তুই আমাকে দেখেছিস, তোর নাম কী? সন্তোষ। হ্যাঁরে উপেন, তুই আমাকে দেখেছিস, তোর নাম কী? উপেন। তাহলে কী হচ্ছে? রবিরূপী জীবনকৃষ্ণ, শৈলরূপী জীবনকৃষ্ণ, সন্তোষরূপী জীবনকৃষ্ণ, উপেনরূপী জীবনকৃষ্ণ। কেমন না? ছলরূপ খলরূপের কথা ওঠে কী?

* **একটা ভাব আশ্রয় করে থাকতে ঠাকুর বলেছেন, যেমন দাসভাব সখীভাব ইত্যাদি**। আমি যে দাস তা আমি জানব কেমন করে? আমাকে কল্পনা করে নিতে হবে, কেমন না? এই দাসভাবে সাধন করতে হলে একটা রামমূর্তি তৈরী করে লেজ পরে বসে থাকতে হবে। আর সব ভাব সম্বন্ধেও ঠিক ওই এক রকম কথা বলা যায়। অর্থাৎ, কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। তাই স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) ঠিক ধরেছেন; তিনি বলছেন— All the religions of the world are based on hypothesis (জগতের সকল ধর্মই অনুমান ভিত্তিক)।

এবার তোরা এখানকার কথা ধর। তোদের ধর্মজীবনের শুরু কোথায়? আমাকে দেখা থেকে। আমি কি কল্পনা? আমি কি ভাব? আমি একজন জীবন্ত মানুষ। এতদিন ওরা ছুটেছে আলেয়ার পিছনে, All religions of the world were based on hypothesis. To us it is practical। আমাদের কাছে ধর্ম হচ্ছে বাস্তব সত্য!

* **ঠাকুর বলছেন, বিশ্বাস! বিশ্বাস**! যীশু চীৎকার করছেন Faith! Faith! হাঁ, বিশ্বাস যেন এমনি হলেই হলো। তোরা তো আমাকে ২০০/৫০০ বার স্বপ্নে দেখেছিস। তোদের বিশ্বাস হয়েছে?

হীরুবাবু— আজ্ঞে, স্বপ্নে আপনাকে এত দেখি, আমাদের বিশ্বাস হয়েছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— বিশ্বাস হয়েছে— কী বল?

অপর একজন— আজ্ঞে না, বিশ্বাস হয় নি। যদি হতো, আপনাকে ছেড়ে যেতে পারতুম না, এখানেই পড়ে থাকতুম।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— হ্যাঁ, ঠিক বিশ্বাস কই? বিশ্বাস যদি হতো তোরা আমাকে আঁকড়ে থাকতিস। দেখছিস! এত স্বপ্ন দেখছিস, শুনছিস, তবু বিশ্বাস হয় না; আর ওরা চেঁচাচ্ছে— বিশ্বাস, বিশ্বাস।

* **নারদ, নারদ বললে ঝগড়া হয় শুনেছিস তো? এ কথাটা কিভাবে চলে এসেছে বলি শোন**। এ কথার এ ব্যাখ্যা আর কোথাও পাবি না তোরা। ব্যাস ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লেখেন অদ্বৈতবাদে। কিন্তু নারদ ভাষ্য লিখলেন দ্বৈতবাদে, ভক্তিমার্গের পথ সৃষ্টি করে। এই শুরু হলো মতবিরোধ, অর্থাৎ ঝগড়া! সেই থেকে কিংবদন্তী হিসাবে চলে এসেছে যে নারদ নারদ বললে ঝগড়া হয়।

* **অহং ব্রহ্মাস্মি— এই কথা বলতে বলতে আজ ঘুম ভেঙেছে** (১২-১-১৯৬০)। তার পরই মনে হলো— এ কথা কে বলেছিল? ও, ঋষিরা বলেছিল। কিন্তু ব্রহ্ম কী একথা কেউ বলেছিল কী? ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র হলো 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। তারপর

ব্রহ্মসূত্রের ছ'রকম ভাষ্য হলো। কিন্তু কেউ ঠিক করে বলতে পারল না ব্রহ্ম কী। ঋষিরা যে ব্রহ্মের কথা বলেছিল তা ফুটেছে এখানে, হাজার হাজার বছর পরে।

* **নিরাকার কী আমি ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারি, কিন্তু বোঝা ভারী শক্ত**। আমি তোদের বলেছি— এ হচ্ছে evolution of the self, কুড়ি বছর আগেও আমি কল্পনা করতে পারিনি যে এত লোক আমায় দেখবে। তাই বা বলি কেমন করে? আমার ১৪ বছর বয়সেও লোকে আমায় দেখেছে তার রেফারেন্স রয়েছে। ১২ বছর ৪ মাস বয়সে ঠাকুরকে দেখলুম। ১৩ বছর ৮ মাস বয়সে রাজযোগ দেহেতে ফুটল। আর ১৪ বছর বয়স থেকে লোকে দেখছে। অবশ্য তখন দেখাটা কম ছিল। গত ২০ বছরের মধ্যেই দেখাটা বেড়ে গেছে। এর পিছনে তা হলে একটা principle ছিল। সেই principle হচ্ছে impersonal। সেই principle এর evolution হয়ে হলো cosmic law। আর, এই cosmic law-তেই তোরা আমাকে দেখছিস। এই principle-ই হলো নিরাকার। তা না হলে ওই জ্যোতি দর্শন নিরাকার দর্শন! তা একদম নয়।

* **ঈশ্বরের স্বরূপ কী?** স একঃ, তিনি এক। ঈশ্বরের স্বরূপ ওই হিরণ্যকশিপু বধ করা নয়। ওতো কবির কল্পনা! Whip them। আমি বেশ বুঝেছি যে মানুষের এই যে দুর্দশা এর মূলে আছে ওরা। মানুষের আত্মিক জীবনের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে ওরা।

* **কত অনুভূতি, কত দর্শন! কটা কথাই বা তোদের বলেছি। একবার মাথাটা কি রকম হয়ে গেল, ভাবলুম, চাকরী ছেড়ে দেব, একলা থাকব**। উলুবেড়ে চলে যাব। সেখানে থাকব, গরু কিনব আর এটা ওটা করব। ওমা, স্বপ্ন দেখছি— আমি একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তার সামনে একটু উঁচু একটা জায়গা। আর সেই জায়গাটায় একটা ফুলের বাগান, চমৎকার বাগান। সেই বাগানের সামনে রাস্তাটাকে ঘিরে একপাল গরু, আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। বুঝলাম, ওই গরুই দেবে আমার পথ রুদ্ধ করে। তবু একলা থাকার ইচ্ছে গেল না। একবার ভাবলুম— রামেশ্বর

চলে যাই, সেখানে গিয়ে থাকব। পরে বুঝতে পারলুম আমার এই একলা থাকার ইচ্ছে কেন। আমি রয়েছি সকলের মধ্যে। কিন্তু মন রয়েছে অনেক ঊর্দ্ধে— তাই একলা থাকার ইচ্ছে।

* **আমি ভগবানের কাছে বর চেয়েছিলুম যে আমার এক কথাতেই যেন লোকের ভগবান দর্শন হয়**। আমি লোকের সঙ্গে অত বকতে পারব না, আমি যাকে একবার বলব সেই যেন ভগবান দর্শন করে। দেখ, মানুষ কতটুকু ভাবতে পারে, কতটুকু বুঝতে পারে, কতটুকুই বা চাইতে পারে। আমি যা চেয়েছিলুম তা হলো না, কিন্তু তার চাইতে কত বড় জিনিস হয়েছে বল দেখি।

আমি অবশ্য specific (সুনির্দিষ্ট) ভগবান দর্শনই চেয়েছিলুম, কিন্তু তখন তো বুঝতুম না যে ভগবান দর্শন বলতে যা বোঝায় তা সকলের হয় না। তা ছাড়া আমাকে world tourer (ভূ-পর্যটক) হতে হত। আমি যতক্ষণ না বলতুম ততক্ষণ তো কারও ভগবান দর্শন হত না। দেখ না, বাড়ীতে যে মেয়েরা ঘরে বসে আমায় দেখছে তা তো হত না। (একজনকে দেখাইয়া) তোদের বাড়ী গিয়ে বৌমাকে বলতে হত — দেখ্‌গা বৌমা, তুই ভগবান ভগবান করছিস, ভগবান তোর ভেতরে। তবে তার হত। এইভাবে আমাকে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে হত। আমি যা চেয়েছিলুম তা কতটুকু! আর ভগবান কী করেছেন বল দেখি! আমাকে একবার শুধু ভেতরে দেখবে, ব্যস্, তা হলেই হয়ে গেল। ফুরোল আমার ল্যাটা।

পঞ্চবিংশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ফেব্রুয়ারী মাস, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ)

* **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আমরা কী পাই? ঠাকুরের কতকগুলো উপমা, সেগুলো হচ্ছে বাইরের কথা**। আমি সেই উপমাগুলোর দেহতত্ত্বে যৌগিক ব্যাখ্যা দিয়েছি। যেমন ধর্— হিমালয়ের গৃহে পার্বতী জন্মাল .....। ঠাকুরের এই কথা কেবল পুরাণজানা হিন্দুরাই বুঝতে পারবে। আর আমি এর কী ব্যাখ্যা দিয়েছি? দেখ্, মানুষের দেহ হল হিমালয়।

সেই দেহে আর একটি দেহ জন্মায়, তাকে বলে ভাগবতী তনু। সেই ভাগবতী তনু জন্মালে মানুষ বুঝতে পারে। এই হল হিমালয়ের গৃহে পার্বতী জন্মান। আচ্ছা, একথা বুঝতে কি সাধারণ লোকের কষ্ট হবে? অহিন্দু কি একথা বুঝতে পারবে না?

* **ঠাকুর বলছেন, আমায় কঠোর সাধন করতে হয়েছে। তা হলে তিনি হচ্ছেন সাধনসিদ্ধ।** আর আমার সব আপনা থেকে হয়েছে। ঠাকুর তাকেই বলেছেন— নিত্যসিদ্ধ। তা হলে সাধনসিদ্ধের বেলায় জিনিসটা হচ্ছে individual (ব্যক্তিগত) আর নিত্যসিদ্ধের বেলায় universal (সর্বজনীন)। আর একটা কথা— ঠাকুর বলছেন আমায় কঠোর সাধন করতে হয়েছে, কিন্তু নিত্যসিদ্ধের সাধন করতে হয় না। তাহলে ঠাকুর যে নিত্যসিদ্ধ ছিলেন না সে কথা তিনি নিজেই বলে যাচ্ছেন। তিনি যদি নিত্যসিদ্ধ না-ই হন তাহলে নিত্যসিদ্ধের সাধন করতে হয় না একথা তিনি জানলেন কেমন করে? ঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে এমন একজন আসবে যাকে এসব কিছু করতে হবে না।

* **ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরদর্শন হলে বালক স্বভাব হয়**— ঈশ্বর বালক স্বভাব কিনা। বালক স্বভাব যে কী সে সম্বন্ধে সঠিক জানা নেই, শোনা কথা আউড়ে যাচ্ছেন। বালকের ব্রেনের কম্পোজিসন এমনই যে সেখানে স্পনটেনিয়াস্ কাজ হয়। ঈশ্বর মানে spontaneous evolution of self, আপনা থেকে হচ্ছে। আমি তো তোদেরকে কতবার বলেছি যে, খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতুম আর দেখতুম সব আপনা হতে হচ্ছে। এইবার তোরা এখানকার কথা মিলিয়ে নে। এই যে তোরা আমাকে দেখিস, এ আপনা থেকে হচ্ছে— স্পনটেনিয়াস্। এই spontaneous evolution of self-কেই ওরা বলছে বালক স্বভাব।

* **খালি সংসারী, সংসারী, সংসারী।** একথা শুনলে আমি ঠিক থাকতে পারি না। I cannot control myself। সংসারী নয় কে? সংসারে থাকবে না তো যাবে কোথায়? ওরা কি একথা বুঝতে পারে না যে, একথা বলে ওরা জগতটাকেই condemn (দোষারোপ) করছে?

* **ভগবান যে আছেন তার প্রমাণ আছে কী?** সাংখ্যদর্শনের লেখকের মত অমন intelligent man আর দেখা যায় না। কী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। ওর ওই যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, দেহটাকে চব্বিশটা ভাগে ভাগ করা— আজ পর্যন্ত কেউ একটা ভাগ কমাতেও পারলে না, বাড়াতেও পারলে না। সেই কোন অন্ধকারময় যুগে সে যা বলেছে আজও তা ঠিক আছে। অত বড় পণ্ডিত, সে কিন্তু ঠিক কথাই বলেছে— ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ। ভগবান আছেন এর কোন প্রমাণ নেই। জগতে তোরাই আমাকে দেখে প্রথম প্রমাণ করলি যে, ভগবান আছেন। তাই আমি ওদেরই কথায় বলছি— ঈশ্বরঃ সিদ্ধঃ সপ্রমাণম্।

* **সাংখ্যের প্রকৃতিলীন কথাটা ব্যাখ্যা কর দেখি।** তোরা তো এই ব্যাখ্যা দিবি যে আমি প্রকৃতিলীন হয়ে আছি। তাই লোকে আমাকে দেখে। আর কিছু? আম গাছে মুকুল হয় কেন? আম হবার জন্য। সে আম ছিল কোথায়? গাছের মধ্যেই ছিল, কেমন না? আমি বার বছর চার মাস বয়সে ঠাকুরকে দেখেছিলুম (স্বপ্নে)। ঠাকুর ছিলেন কোথায়? আমার দেহের মধ্যেই ছিলেন। তারপর রাজযোগ, তারপর আরও সব হতে লাগল। তা হলে কি হচ্ছে? প্রকৃতি আমাতে লীন ছিল। তাই আবার ধীরে ধীরে প্রকাশ পেয়ে বাইরের প্রকৃতিতে লীন হয়েছে।

* **জীবন্মুক্ত অবস্থায় মানুষ কী করে?** পাখীর বাসা যদি পুড়ে যায় পাখী কী করে? (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) ওরে, পেয়েছি রে, পেয়েছি! একেই তো বলে বিদেহ মুক্তি! ব্যষ্টিতে আমি হলুম জীবন্মুক্ত, সমষ্টিতে হ'ল বিদেহ মুক্তি। এই বিদেহ মুক্ত অবস্থার জন্যেই তোরা আমাকে দেখতে পাস।

ধীরেন রায়— পুরাণকাররা তাই বিদেহরাজ জনকের কথা বলে গেছেন। জনক অর্থাৎ স্রষ্টা,— যিনি নিজেকে সৃষ্টি করেন, যেমন আপনি নিজেকে আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করছেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— ওরে হ্যাঁ, তাই তো! বিদেহরাজ জনক। তা বাবা আমি তো ওসব মানি না। তবে এইটুকু বলা যায় যে ওদের কল্পনা এখানে ফুটেছে।

ধীরেন একটা স্বপ্ন দেখেছে। ওঃ কি স্বপ্নই দেখেছে! সবটা বলে কি হবে? জিস্টটাই বলি— এ যাবৎ মানুষের ভগবানদর্শন হয়েছে, কিন্তু মানুষ কখনও ভগবান হয় নি। এই প্রথম মানুষ ভগবান হয়েছে— আমি ওকে একথা বলছি। কেন বল্ দেখি? অন্য কেউ তো বলতে পারত। না রে, একথা বলার অধিকার আর কারও হয় নি যে।

* **আমি হিন্দু নই আমার জাত নেই**। একদিন স্বপ্নে আমি আমাকে বলছি, তোর জাত নেই। যেদিন তোরা আমাকে দেখেছিস, সেদিন থেকে তোদেরও জাত গিয়েছে।

* **ভগবানদর্শন। সাধন জগতে ওকি খুব বড় কথা নাকি? ওতো ম্যাট্রিক পাস**। ওরে কত যে দর্শন হয়েছে তা কি বলব। এক এক সময় তাই তো ভাবি আমি বেঁচে আছি কি করে! Other side-এ আমি ভাবি যে, brain-এর এই sanity কি করে রয়েছে।

* একটা কথা তোদেরকে বলে দিই শুনে রাখ। বাইরে তোরা যখন আমাকে দেখবি তখন আমি হলুম ঈশ্বর। ভেতরে যখন দেখবি তখন আমি হলুম তোদের স্বস্বরূপ, আত্মা।

* **আমার জীবনে এ জিনিসের (আত্মিকের সাথে ব্যবহারিকের) কোন adjustment (মিল) তো পাই নি**। এ আমি সারা জীবনব্যাপী দেখেছি, কোথাও adjustment পাই নি, তাই তো হাড়ে হাড়ে বুঝেছি যে, বাবা ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আত্মিক জীবন আলাদা, ব্যবহারিক জীবন আলাদা।

* **তখন তখন আমি বলতুম, ওরে ঠাকুরের জন্যে আমি লোকের মাথা কাটতে পারি**। East Indian Railway একবার বেলুড় মঠ acquire করতে চেষ্টা করে। মিস্ ম্যাক্লাউড অবশ্য সেটা বন্ধ করে। আমাকে তখন একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, East Indian Railway যদি বেলুড় মঠ acquire করে আপনি কি করবেন? আমি বলেছিলুম যুদ্ধ করব। যুদ্ধ করে না হয় মরেই যাব।

* **জগৎ নিয়ন্ত্রণ কিভাবে হচ্ছে?** প্রত্যেকটি মানুষ জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রত্যেকটি জীবজন্তু জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে, প্রতিটি গাছপালা জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যারই reaction আছে সেইই জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ওই যে দেওয়ালে ঘুঁটে দেওয়া হয়েছে ওই ঘুঁটেও জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কি ক'রে? দুর্গন্ধ ছড়িয়ে। তাহলে sum total-এ দাঁড়াচ্ছে কি? জগৎ আপনা হতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

* **জগতে সবাই পাওনাদার রে!** বাবা মা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র সবাই পাওনাদার। জগতে সমস্ত লোকই তোর পাওনাদার, তাই তো আমাকে দৈববাণী করে বলেছিল— তোর সব ঋণ শোধ হয়ে গেছে।

ষড়বিংশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— মার্চ মাস, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ)

* **ঠিক ঠিক তত্ত্বজ্ঞান যদি কারও হয় সে কড়ে আঙুলটাও নাড়বে না**। না, না, ভুল হচ্ছে. নাড়বে না নয়, নাড়তে পারবে না।

* **'আত্মা অবিনশ্বর' (Immortality of the Soul)— আসছে কোথা থেকে জানিস?** ওই যে বেদে আছে অমৃতত্বের কথা— ওই থেকে। যখন দেখল যে দেহ তো থাকে না তখন বললে— আত্মা অবিনশ্বর। আরে, আত্মা যে অবিনশ্বর তার প্রমাণ কোথায়? প্রমাণের বেলায় মাথা নিচু। প্রমাণ কি না ওই স্বামী অভেদানন্দের বই (মরণের পারে), আর প্লানচেট? ওরে সব জোচ্চুরী রে বাবা, সব জোচ্চুরী। চোখের সামনে ঠকাচ্ছে তাই কি আমরা ধরতে পারি? আমাদের ধরবার কি মাথা আছে? দেখ্ না এই শ্রাদ্ধ। কি করছে বল দেখি। ওদের কাটান দেবার পথ আছে। ওরা বলবে— 'কেন? আমরা স্মৃতি তর্পণ করতে বলছি'। তাতে লাভ? অর্থাৎ তোমরা অতীতের দিকে মানুষকে ফিরে যেতে বলছ। অবশ্য অতীতের কথায় অনেকে আনন্দ পেতে পারে। কেউ কেউ বর্তমানে আনন্দ পায় না। ভবিষ্যৎ কি তা তারা জানে না। তাই তারা অতীতের দিকে ফিরে তাকায়। কিন্তু লাভ কী?

অতীত তো অতীত হয়ে গেছে। মানুষ অতীতকে নিয়ে থাকতে পারে না, সে চায় নতুন কিছু। আজ যদি বুদ্ধ যীশু কি মহম্মদ ফিরে ফিরে আসে মানুষ তাদের নেবে না। ভাববে এ আবার কে লোক ঠকাতে এসেছে। আমার যদি পয়সা থাকত আমি একটা পরীক্ষা করতুম। আমি তোদের বল্কল পরিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিতুম। দেখতুম তোরা ক'জন বল্কল পরে থাকতে চাস। ওরে অতীত নিয়ে পড়ে থাকলে ভগবানকে যে ছোট করা হয়। ভগবানের যে অনন্ত, অফুরন্ত শক্তি। সে কি শুধু অতীতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকবে?

* দেখ, আমার মাথাটা গেছে তলায়, আর নীচুটা উঠে এসেছে উপরের দিকে। এ কথা প্রথম বলেছিলুম ফটিককে। বলেছিলুম, দেখ্ ফটিক আমার মাথাটা গেছে নীচের দিকে, আর নীচুটা উঠেছে মাথায়। একথার ব্যাখ্যাও দিয়েছিলুম, না হলে তো লোকে বুঝবে না। সাধারণ লোকের মাথায় থাকে জীবত্ব, আর শিবত্ব থাকে নীচের দিকে। আমার বেলায় হলো উল্‌টো। জীবত্ব গেল নীচে, মাথা ভর্তি হল শিবত্বে।

* কিভাবে বিদ্যামায়া সাধকের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করেন ''ধর্ম ও অনুভূতি'' গ্রন্থ হতে সেই অংশটি পড়া হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন—

বিদ্যামায়া কিন্তু সহজে যেতে চায় না। তাড়ানো ভারী শক্ত। শেষবার আমি কাটারি, বঁটি, জাঁতি তিনটে নিয়ে তাকে তাড়া করেছিলুম। দেখছি, এই রকম একটা ঘর। আমি বসে আছি। ঘরে তিনটে র‍্যাকের মত আছে। আমার কাছে যে র‍্যাকটা তাতে কাটারি, বঁটি, জাঁতি তিনটেই রয়েছে। বিদ্যামায়া গেরুয়া পরে আমার ঘরে ঢুকছে। হাতে একটা বই। আমি দেখেই বুঝেছিলুম ও ছল করে ঘরে ঢুকেছে। ও ঘরে ঢুকতেই আমি ওই কাটারি, বঁটি, জাঁতি তিনটে নিয়েই তেড়ে গেলুম। ও তো একেবারে দে ছুট্। সেই যে গেল আর কই ওকে দেখিনি। এর আগে আরও তিনবার তাড়ান হয়েছিল।

কিন্তু যায়নি, ফিরে এসেছিল। পরের দু'বারের কথা আর মনে নেই, কিন্তু প্রথমবারের কথা বেশ মনে আছে। দেখছি—

ওকে টিকিট কাটিয়ে জাহাজে তুলে দিয়েছি। জাহাজ চলে গেল। কিন্তু কোথা থেকে একটা ছোট নৌকা এসে সেই জায়গায় লাগল। আমি পনটুন থেকেই নৌকাটায় নামলুম। নৌকা চলতে লাগল। যত যায় ততই নৌকাটা বড় হয়। ক্রমে একটা বড় ময়ুর পঙ্খী জাহাজের মত হয়ে গেল। আমি বসে আছি। আমার হাতে নুন টেপা (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী টিপিয়া দেখাইলেন)। নৌকাটা যাচ্ছে, এমন সময় কোথা থেকে একটা বিরাট কুকুর ঘুরতে ঘুরতে এসে আমার হাতের টেপা নুনটা খেতে এল। আমি তো আঙ্গুল টিপে বসে আছি। নৌকাটা নদীর একটা বাঁকে ঢুকে এক জায়গায় এসে থেমে গেল। এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করিনি যে একটা সাহেব নোঙরের দিকে মাথা করে শুয়ে ছিল। নৌকাটা থামতেই সে উঠে তীরে নেমে গেল। স্বপ্নও ভেঙে গেল। এর বহু দিন পরে আমি দেখেছিলুম আমি দু-এক দানা নুন মুখে পুরে আস্বাদ করছি।

নুন চাখছি মানে কী? ব্রহ্মের রস আস্বাদন করছি। নুনকে হিন্দিতে বলে রামরস। ওই তো কথামৃতে আছে— সন্ত্ ওহি হ্যায় যো রামরস চাখে। আর সাহেবটি কে বল দেখি? বিধাতা পুরুষ। দেখাচ্ছে যে আমিই আমার বিধাতা পুরুষ হলুম। আর কুকুরটি হচ্ছে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম। আমার ব্রহ্মত্ব লাভে বাধা দিচ্ছে।

* **আমি ২২/২৩ বছর বয়সে চণ্ডীদাসকে দেখেছিলুম।** তিনি আমায় গান গাইতে শিখিয়েছিলেন, কি করে পদাবলী রচনা করতে হয় তাও শিখিয়েছিলেন। তখন তখন যে সব নাটক লিখেছিলুম তাতে অনেক পদাবলী লিখতে হয়েছে, শিখেছিলুম চণ্ডীদাসের কাছ থেকে।

* **ওই যে গানে বলছে, শিব ''পঞ্চমুখে গুণ গায়'', ওই পঞ্চমুখ কী বল দেখি?** পঞ্চমুখ হ'ল Kashmir Shaivism-এর পাঁচটি aspect— পরমশিব, শিবশক্তি, সদাশিব, ঈশ্বরতত্ত্ব আর সদ্বিদ্যাতত্ত্ব। এই পাঁচটা aspect-কেই ওরা বলছে 'পঞ্চমুখে গুণ গায়।' কার গুণ গায়? এই দেহের।

* **একদিন বিষ্টু পালকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, হ্যাঁ বিষ্টু, জগৎটা কোথায় বল্‌ত?** বিষ্টু তো চুপ করে আছে। বার কতক জিজ্ঞাসা করার পর সে বললে, দাদা জগৎ আপনার ভেতরে। তখন অবশ্য আমি প্রায়ই বলতুম, জগৎ আমার ভেতরে। তখন এই রকমই মনে হত যে আমার মধ্যে জগৎ। বিষ্টুর কথা শুনে আমার মনে হল যে আরে, এইভাবে বললে তো ওরা কিছু বুঝবে না। তখন থেকেই বলতুম— আত্মার মধ্যে জগৎ।

* আজ (২১-৩-১৯৬০) **দুপুরে ধ্যানে অমরকে দেখলুম**। প্রথমে দেখলুম ফরসা কবরেজকে (শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রায়কে), তারপরে দেখলুম স্বামীজীর ধ্যানমূর্তি। তারপর ভাবলুম— কী হবে কতকগুলো রূপ দেখে? মনটাকে টেনে তুললুম। বেশ উঠেও গেল হু হু করে। বেশ ধ্যান হল। ধ্যান ভাঙ্গার পর আবার ঘুম এল। ঘুমে যেন অভিভূত হয়ে পড়লুম। মনে হল— এ যোগনিদ্রা। আবার কী দর্শন হবে মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে রইলুম। দেখলুম—

একটা মস্ত বড় হাতি। আমি তার দাবনার কাছে দাঁড়িয়ে। এমন সময় কোথা থেকে অমর (সরকারী খাদ্য বিভাগের) এল। সে এসে হাতির গাটা ছুঁতে আমি ভাবছি— এই রে, এইবার তো অমরকে জড়াবে। **হাতিটা তখন শুঁড়ে করে অমরকে জড়িয়ে ধরে শুঁড়টা উঁচু করে রইল।** তখন মনে হল অমর কি রাজচক্রবর্তী হবে! তারপর ভাবলুম— না, তাহলে হাতিটা অমরকে তার মাথার উপর বসাতো। এ স্বপ্ন আমার সম্বন্ধেই বলেছে। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। বিকালে ওদেরকে এই দর্শনের কথা বলেছিলুম। ওরা বললে, আপনার অমরত্ব লাভ হয়েছে। তোরা কিছু মানে করতে পারিস?

একজন বললেন, **অমরত্ব আপনার ইচ্ছাধীন তাই দেখিয়েছে।**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— ওরে তাই তো। রাজযোগের বিভূতিপাদেও ওই কথা লেখা আছে।

এই বলিয়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ''রাজযোগ'' গ্রন্থ হইতে

বিভূতিপাদে লিখিত আলোচ্য অংশ হইতে পাঠ করিয়া শুনাইতে উদ্যত হইলে তাঁহার কি একটা অনুভূতি হইল। তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে নিজের অনুভূতির মাধ্যমে তাহার বিষয়ে দৈব সমর্থন লাভ করিলেন। বিভূতিপাদে লেখা আছে যে, যোগীপুরুষ অমরত্ব লাভ করেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে দেহত্যাগ করিতেও পারেন। ইচ্ছামৃত্যু লাভের এই উপলব্ধি বিষয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—

ভগবানের দান কি অদ্ভুত বল দেখি। আমার মনের গতি এই যে আমি অমর হব। আমি 'হ্যাঁ' চেয়েছিলুম, কারণ religion to me is positive, a perpetual positive। তিনি দেখালেন যে শুধু 'হ্যাঁ' কেন, 'না' ও নে। 'হ্যাঁ', 'না', দুয়ের ওপরই কর্তৃত্ব দিলেন। কি অদ্ভুত বল দেখি!

* আজ (২৩-৩-৬০) **শ্রীজীবনকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে ভগবান দর্শন সম্বন্ধে কিছু নতুন বিবরণ শোনা গেল**— দেখ, সহস্রারেই যে দর্শন হচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারা যায়। তখন বোধ শুধু সহস্রারেই থাকে, আর কোথাও না। আর, বলতে গেলে সেই প্রথম সমাধি। সমস্তটাই জ্যোতি। মাঝখানে একটা blue outline (নীল রেখা দ্বারা সীমায়িত অংশ)। শুধু shape-টা (আকৃতিটা) বোঝাবার জন্যে। মাঝখানের shape-টা হচ্ছে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠবৎ। ওর মধ্যে দেখেছিলুম— এটমের মালার মত ঘুরছে। ওই অবস্থাতেই মনে হয়েছিল— এই কি রাস! সচ্চিদানন্দগুরু দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন— এই ভগবান! এই ভগবান দর্শন! ব'লে না দিলে তখন বোঝে কার সাধ্যি। বোঝবার কোন উপায় থাকে না। তারপর সচ্চিদানন্দগুরু shape-টার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। সেই condensed shape-টার (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠবৎ ঘনজ্যোতির) মুখ তখন ঘুরে গেল। সেটা তখন spread out করল। ঝাঁটার মত ছড়িয়ে গেল। তাইতে নিগমের দ্বার উন্মুক্ত হল। পরে বুঝেছিলুম যে ঐ condensed shape-টা ছড়িয়ে না পড়লে দেহ সে তেজ সহ্য করতে পারত না, দেহ থাকত না। spread out করে যে shape-টা হল তাকেই ওরা বলেছে— ধান্যশীর্ষবৎ।

* যৌগিক রূপে (ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থে) চৈতন্য সাক্ষাৎকারের কথাই লিখে গেছি। কিন্তু আরও কত দর্শন আছে। সে সব দর্শনের কথা তো আর পাই না কোন জায়গায়। তাই তো বলি না। **সহস্রার থেকে কণ্ঠদেশ শুধু নয়, সমস্ত দেহটা জ্বলে যায়। অস্থি মজ্জা সমস্ত জ্যোতিতে ভরে ওঠে।** দেখছি— আমি বসে আছি। আমার সামনে একটা পট পড়ে গেল। সেই পটে আমারই আর একটা রূপ। পটের সামনে রয়েছে একটা বাতি। সেই বাতিটা আমার দেহের ভেতরে ঢুকে গেল আর আমার সহস্রার থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত দেহটা জ্যোতিতে ভরে উঠল, অস্থি মজ্জা সব জ্বলে উঠল।

সপ্তবিংশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— এপ্রিল মাস, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ)

* **একদিন আমি মহাপ্রভুর কথা পড়ছি,** সারাদিনই পড়ছি; আর অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। কতই যে কেঁদেছি তা আর কি বলব। বিকালের দিকে পড়ছি— জগন্নাথের মন্দির, মহাপ্রভু গিয়ে সেই জগন্নাথের মূর্তির সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন। তখন মনে হল— আরে এ তো ঠিক নয়। সারাদিনের অত ভাব কোথায় মিলিয়ে গেল।

* **সেই কোন হাজার বছর আগে ঋষিরা তো বলেছিল, অহং ব্রহ্মাস্মি।** একথার দুরকম অর্থ হতে পারে। এক, আমি ব্রহ্ম, আর দুই, সমস্ত মানুষই ব্রহ্ম। কিন্তু কই, ঋষির একথা তো জগৎ নেয়নি। জগৎ নিল না কেন? কি করে নেবে? তাদের তো কোন উপলব্ধি হয়নি। তাই তারা নেয়নি। আমার মধ্যে যে সত্য ফুটে উঠেছে সে সত্য যদি জগতে স্ফুরিত না হয় তবে জগৎ তাকে সত্য বলে তো গ্রহণ করবে না। তাই ওই ঋষি বাক্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জগৎ গ্রহণ করেনি।

* **ব্রহ্মের স্বরূপ আনন্দ।** আজ (১০-৪-৬০) ওইখানটায় (বাইরের বারান্দায়) পায়চারি করছি, দেখছি আনন্দকে (আনন্দ নামে এক

যুবককে)। ভেতরে এলুম তখনও দেখছি আনন্দকে। বুঝলুম আনন্দই আমার স্বরূপ, তাই দেখাচ্ছে। একি শুধু আমার বেলায়? না। যারাই আমাকে দেখেছে তাদেরই স্বরূপ হচ্ছে আনন্দ।

* ব্রহ্ম কি তাই কেউ জানে না, তা আবার ব্রহ্মের পারে কি আছে! কিন্তু আছে। আমি বুঝতে পেরেছি ব্রহ্মের পারেও আছে। ছায়ার মত সব দেখেছি। তবে না ফুটলে তো বলবার যো নেই।

* **কাকীমুখ** ('তব তত্ত্বগুণত্রয় কাকীমুখ আচ্ছাদিনী') সহস্রারে সৃষ্টি হয়, বুঝতে পারা যায়। এই কাকীমুখে ঢুকে বেরিয়ে এলে তবেই নিগমের পথ খুলে যায়। বেরোতে না পারলে দেহ চলে যায়। ঠিক কাকের মুখের মত দেখতে কিনা, তাই বলে কাকীমুখ। আমায় কি করে কাকীমুখ বুঝিয়েছিল বলি শোন—

আমি খুব উঁচুতে উঠে যাচ্ছি। খুব উঁচুতে উঠে সেখান থেকে মারলুম এক লাফ। নীচেতে ছিল একটা পাতকুয়া। সেটাতে ঢুকে আবার বাইরে বেরিয়ে যাবার পথ আছে। আমি এত ফোর্‌স্‌-এ লাফ দিয়েছি যে সেই ফোর্‌স্‌-এর চোটেই পাতকুয়ার মধ্যে পড়ে অপর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। তখন আমি বুঝলুম যে ওরে, আমি তো কাকীমুখে ঢুকেছিলুম।

* **আজ (১৮-৪-৬০) তেল মাখতে যাব, মেনোর নাতনী ছুটতে ছুটতে তেলের বাটিটা নিয়ে এলো। আমি তার হাত থেকে বাটিটা ধরতেই মেনোর নাতনী হয়ে গেলুম।** আমি ক'দিন আগে তোদেরকে বলেছিলুম— এত লোককে দেখছি, এমন কি রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে হঠাৎ তার দিকে নজর পড়তে আমি তাকে দেখতে লাগলুম। এ রকম অবস্থাতেও কোন মেয়েছেলেকে দেখিনি। কিন্তু আজ এই প্রথম দেখলুম। হোক্ সে ছোট, কিন্তু মেয়েছেলে তো বটে। আজ মনে হচ্ছে জিনিসটা কি রিটার্ড করছে? সার্কল কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাই যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরে আসছে? ..... আমি বেশ বুঝতে পেরেছি এখন আমি অন্য স্ফিয়ারে (sphere) চলে গেছি। শুধু আমাকে বোঝাবার জন্যেই বুঝি এত বড় একটা জিনিস হয়ে গেল। এ যে কী তা তো কেউই বুঝল না।

* **কী অদ্ভুত এই মনুষ্য দেহ**। কত অফুরন্ত শক্তি যে রয়েছে এর মধ্যে তা কেউ জানে না। আজ বিকালে (১৯-৪-৬০) তাই ভাবছিলুম যে কী অপূর্ব এই মনুষ্যদেহ। পিতার বীজ থেকে ধীরে ধীরে— হার্ট, লাঙ্গস্, ব্রেণ, লিভার, স্প্লীন হচ্ছে। বাইরে থেকে তো কিছু আসে না। সব সেই পিতার বীজের মধ্যেই ছিল। বাইরে থেকে নিচ্ছে কি— শুধু তার ডেভেলপ্‌মেণ্ট হবার জন্য যা দরকার তাই। কেমন করে হয় তা কেউ জানে না। ওদের সেই— আলেখে আসে আলেখে যায়।

আমরা কতটুকু জেনেছি? আমরা শুধু এইটুকু জেনেছি যে মানুষ দেখতে বহু কিন্তু আত্মিক জগতে এক। এও কি বাইরে থেকে এসেছে? না, ভিতরেই ছিল, সেটা প্রকাশ হ'ল। কেবল যে মানুষের বেলায় হচ্ছে তা নয়। বস্তু জগতেও হচ্ছে। ভাবতো, আম গাছ থেকে আম হচ্ছে কি করে। আমটা তো বাইরে থেকে আসছে না, সেই গাছের মধ্যেই ছিল। গাছটা বাইরে থেকে নিচ্ছে কি— জল, বাতাস, আলো, উত্তাপ। অর্থাৎ, সেই পঞ্চভূত। সেও শুধু তার ডেভেলপমেন্টের জন্যে। কিন্তু আমটা হচ্ছে কী করে? এ রহস্য তো আজও ভেদ হয়নি। কি রহস্যময় এই মনুষ্যদেহ। ধর্ম বলতে আমার আর কিছু মনে হয় না, ষট্‌চক্র আর ষষ্ঠভূমি মনে হয় না, শুধু মনে হয় কী অফুরন্ত শক্তির আধার এই মনুষ্য দেহ।

এই যে সব সময় তোদের কাউকে না কাউকে দেখছি এ কী হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না। ব্রেণ ঠিক রাখা দায়, গোলমাল না হয়ে যায়। আজকাল আর অভয়কে দেখতে পাচ্ছি না। ভেবেছিলুম বলব না, তা বলেই দিই। আজ বিকালে অভয়কে দেখতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু পারলুম না। খুব faint একটা যেন এলো, ভালভাবে নয়।

* **আজ (২৬-৪-১৯৬০) দুপুরে বসে বসে তিব্বতীদের কথা ভাবছিলুম**। আজ প্রায় বারশো বছর হ'ল তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম গিয়েছে। ওরা করছে কী? একটা চাকা ঘুরছে, আর তার সামনে বসে, ওঁ মণিপদ্মে হুং, ওঁ মণিপদ্মে হুং— এই কেবল করছে। কেন? কুণ্ডলিনী জাগ্রত হবে বলে। কিন্তু এই হুম্ হুম্ করে কী হলো? কারও কুণ্ডলিনী কি জাগ্রত হয়েছে? কুণ্ডলিনী জাগরণ যে কী তাতো তোরা বুঝেছিস। যদি কারও কুণ্ডলিনী জাগরণ হয় সে তো এমনি যাবে না। সে যে সারা জগতটাকে নিয়ে টানা-পোড়েন করবে। হুম্ হুম্ করলে কি কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়? কুণ্ডলিনী জাগরণ হয় আপনা থেকে।

আমি একথা বেশ ভালভাবেই বুঝেছিলুম যে কারও কুণ্ডলিনী যদি জাগে সে জগতটাকে তোলপাড় করে ফেলবে। তিব্বতীরা আজ প্রায় ১২০০ বছর ধরে এই যে ওঁ মণিপদ্মে হুং, ওঁ মণিপদ্মে হুং করে আসছে, কারও কুণ্ডলিনী জাগলো না কেন?

* আজ (২৬-৪-৬০) দুপুরে **মা ঠাকরুনকে ধ্যানে দেখেছি**— মা ঠাকরুন একটা সবুজ চেক শাড়ী পরে আছেন। এর মানে কেউ বলতে পারিস?

এক ভদ্রলোক— আপনার নতুন জীবন লাভ হয়েছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— আমি এদের কাছে ঠিক এই ব্যাখ্যাই দিয়েছি।

* **যীশুর সম্বন্ধে তোদেরকে আগে যে কথা বলেছি আজ তার একটা সাপোর্ট পাওয়া গেল**। ঠাকুর দেখেছিলেন যীশুর নাক থ্যাবড়া, তাই তিনি কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে যীশুর নাক থ্যাবড়া দেখলুম কেন? কেশববাবু বলেছিলেন যে, হ্যাঁ যীশুর চেহারার তিন রকম বর্ণনা আছে। এইবার ধর স্বামীজীর কথা। ক্রীট দ্বীপের কাছে তাঁর দর্শনের কথা মনে আছে? সেই দর্শনের পর তিনি বুঝেছিলেন যে যীশু বলে কেউ ছিল না। এইবার তোরা সক্রেটিসের কথা মনে কর। আমি তোদেরকে বলেছি যে সক্রেটিসের নাক থ্যাবড়া ছিল। আমি আরও কী বলেছিলুম তোদের মনে পড়ে? বলেছিলুম যে সক্রেটিসকেই ওরা যীশু বলে খাড়া করেছে। আর দেখ্ সেই কথাই এই বইটাতে পেয়েছি। (ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের "History of Philosophy, Eastern & Western" গ্রন্থের ভূমিকায় ভারতের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মহাশয় লিখিয়াছেন যে 'যীশুর জীবনে সক্রেটিসের ছাপ পাওয়া যায়।—ইহুদীদের যীশু এথেন্সবাসী সক্রেটিসের কথাই মনে করাইয়া

দেয়।' ভাষার পারিপাট্যের আবরণে তিনি এই আভাস দিয়াছেন যে সক্রেটিসই যীশুতে রূপায়িত হইয়াছেন।)

* আমার ভারী আনন্দ হয়েছে। **আমাদের দেশে ভক্তি কাল্ট কী করে এলো তার একটা হিস্টোরিক্যাল বেসিস পেয়েছি;** তোরা কতটুকু বুঝতে পারবি তা জানি না, তবে যে যতটুকু পারিস লিখে রাখিস।

এখন থেকে ঠিক দু-হাজার বছর আগে রোমানরা প্যালেস্টাইন অধিকার করে। সেই সময় একদল জু (ইহুদী) দক্ষিণ ভারতে এসে বসবাস করতে শুরু করে। এই জু'রা খুব ইমোশন্যাল ছিল। ইজেকিয়েলের ভাবটাব হোত। সলোমন ভাল গান (psalm) লিখতে পারত। এসব রেফারেন্স পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে এই জু'দের ইমোশন্যাল্ ভাবধারার সঙ্গে তাদের ভাবধারা মিশে গেল। ভক্তি কাল্ট খুব প্রসার লাভ করল। এই ভক্তি কাল্ট প্রচার করেছিলেন রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য ইত্যাদি। রামানুজ আল্ভারদের রচিত শ্লোককে খুব উঁচু স্থান দিতেন। তিনি বলতেন, আল্ভারদের এই সব রচনা বেদকেও ছাড়িয়ে গেছে।

এরপর মুসলমানরা ভারতবর্ষ অধিকার করল। এরা সারাসান্স নয়, আরবিয়ান মুসলমান নয়,এরা তুর্কী, মঙ্গোলিয়ান। এদের ভাবধারার সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে ভক্তি কাল্ট ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। দক্ষিণ ভারতে প্রচার করলেন ওঁরা ওই পাঁচজন— রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য ইত্যাদি আর উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব ভারতে প্রচার করলেন— নানক, কবীর, তুকারাম, চৈতন্য, রামানন্দ ইত্যাদি। এই হোল ভারতবর্ষে ভক্তি কাল্টের ইতিহাস। কোথায় কবে ভারতবর্ষে এলো একদল জু, কালক্রমে ভক্তি কাল্ট ছড়িয়ে পড়ল দেশে। বাতাসে মিশে থাকে ফুলের পরাগ, সে খালি চোখে দেখা যায় না। সেই পরাগ এসে পড়ে virgin ফুলে, আর তাই থেকে জন্মায় ফল।

অষ্টবিংশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— মে ও জুন মাস, ১৯৬০)

* **প্রাচীনকাল থেকে কত ধর্মই তো চলে এসেছে।** আর্য ধর্ম, জু, পারসী, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্ট— কত ধর্মই তো চলে এসেছে।

কিন্তু কেউ যে ট্রু বুদ্ধিস্ট হয়েছে তা আমরা জানব কেমন করে? কেউ যে ট্রু ক্রীশ্চান হয়েছে তার কি কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে? না। আর এখানে কী হয়েছে? (আমার) রূপ ধারণ করে ফুটে উঠে তোদের জানিয়ে দিচ্ছে। তাহলে কী হচ্ছে? ওদের ধর্মে ''নেই'', আমাদের কাছে 'আছে'। ওদের ধর্মে 'না', আমাদের বেলায় 'হ্যাঁ'।

* **দ্বিজ** কথার কী চমৎকার অর্থ আমরা পেয়েছি, বল দেখি। যখনই কেউ আমাকে দেখল তখনই সে হ'ল দ্বিজ।

* **'অপাপবিদ্ধং'** কথাটা কী করে বোঝাবি? মোটা কথায় বলা যায়, এখানে চোর আসছে, সেও আমাকে দেখছে, আবার ডাকাত আসছে সেও আমাকে দেখছে।

* কপিল (মুনি) বলছেন— **এই দেহ পঞ্চভূতে গঠিত**। আবার দেহের এই তেজ disintegrated হতে হতে যখন পঞ্চভূতে একেবারে মিশে যায় তখনই মানুষটা মরে যায়। কিন্তু মাঝে যে এই জগৎ-ব্যাপী অবস্থা হয়, সে কথা ওরা বলে যেতে পারেনি। তখন জীবিত অবস্থাতেও তার তেজ পঞ্চভূতে লীন হয়ে থাকতে পারে— যা এখানে হয়েছে। সে কথা ওরা জানতো না।

* **'কুও ভাডিস্' (Quo Vadis) তোরা পড়েছিস কেউ?** 'কুও ভাডিস্' মানে whither goest thou? এই ছিল মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা— পথ কী? বঙ্কিমচন্দ্র এই জিনিসটাকেই ঘুরিয়ে বলছেন, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ? ওই যে কপালকুণ্ডলা প্রশ্ন করছে নবকুমারকে। এ যাবৎ মানুষ কেবল হৈ চৈ করে এসেছে, কিন্তু পথের সন্ধান পায়নি। আমরা জেনেছি আমাদের পথ কী? মানুষটা ভগবান হয়ে যায়। ঠাকুরও বলছেন বটে ঈশ্বরদর্শনই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ওতেও ঠিক হয় না। একজন মানুষ এই রূপ (শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপ) তার ভিতরে দেখল, ব্যস্, তার সব হয়ে গেল। স্বামীজীর ওই কথা— Being one with Divinity there cannot be any further progress in that sense.

* **হ্যামিলটন সাহেবের ঐ কথাটাই ধর— 'the end of philosophy and beginning of religion'**। আমার বয়স এখন ৬৭ (১৯৬০)। ৬৭ থেকে ১২ বাদ দিলে হয় ৫৫। ৫৫ বছর আগে — আমাদের এখানকার কথাই ধর, বাংলাদেশে কি আর ১২ বছর বয়সের ছেলে ছিল না? কতই তো ছিল। এই দেহেতে কেন ঠাকুর আর স্বামীজী ফুটে উঠলেন। এই হলো the end of philosophy and beginning of religion। আমার ব্যষ্টির সাধনের কথা বাদ দে। কেউ বলতে পারে, মশাই আপনি যে ঠাকুর আর স্বামীজীকে দেখেছেন ওকথা আমরা বিশ্বাস করি না। বেশ! তোরা এতগুলি লোক কেন আমায় দেখছিস? কেন এই একটা লোকের রূপ তোরা এই হাজার হাজার লোক দেখছিস? সেখানেও কি হচ্ছে? The end of philosophy and beginning of religion। শুরু যেখানে সেখানে mysterious আর শেষ যেখানে সেখানেও mysterious।

* **আমার গুরু কে?** আমার তো কোন গুরু নেই। ১২ বছর ৪ মাস বয়সে ঠাকুরকে দেখলুম। তখন তো জানতুম না উনি কে। ১৩ বছর ৮ মাস বয়সে স্বামীজী রাজযোগ শেখালেন। তাঁকেও তো জানতুম না। এমন কি যখন গুরু ইষ্টে লীন হচ্ছেন তখনও ঠাকুরকে গুরু বলে আমার বোধ ছিল না। পরে কথামৃত পড়তে পড়তে ধরেছিলুম যে, আরে ওকেই তো সচ্চিদানন্দগুরু বলে! আমি যদি নাই জানলুম তা হলে আমার গুরু হলো কি করে! তা ছাড়া, যোগের দিক দিয়ে ধরতে গেলে ওতো আমিই আমার গুরু হয়ে শিক্ষা দিচ্ছি।

* আজ (১০/৫/১৯৬০) ভোর পাঁচটাও বাজছে আর আমিও ছাদ থেকে নামছি। ঘুম ভেঙেছে কখন সে কথা আর শুনে কাজ নেই। ছাদ থেকে নামতে নামতে মনে হলো— ১২ বছর ৪ মাস বয়সে আমি ঠাকুরকে দেখলুম। **১৩ বছর ৮ মাস বয়সে আবার স্বামীজীকে দেখলুম কেন?** শুধু ঠাকুরকে দেখলেই তো হতো। স্বামীজীকে দেখাতে তবে জিনিসটার fulfilment হলো। ঠাকুরের তো রাজযোগ ছিল না। তার প্রমাণ এখানকার মত এত লোক তো তাঁকে দেখেনি। Thakur was minus রাজযোগ। ঠাকুর plus(+) রাজযোগ হলো আমার জীবন।

* আমি আমতায় মাতামহের বাড়ীতে জন্মেছিলুম। মাতামহ ছিলেন সাবরেজিস্টার। আমি হই সকাল ৯টা থেকে ৯।। টার মধ্যে। আমি হবার পর খুব বৃষ্টি হয়েছিল। আমার আটকৌড়ে হয়েছিল ঘরের মধ্যে। সে দিনও এত বৃষ্টি হয়েছিল যে ছেলেরা কেউ আসতে পারেনি। আমার মাতামহের আটজন বন্ধু কূলো বাজিয়েছিল।

* **আমার মত rebel (বিদ্রোহী) পৃথিবীতে আর জন্মায়নি**। I am a born rebel। আমি তো এই বাংলাদেশেই জন্মেছি। কিন্তু মন্ত্র জানিনা, গুরু জানিনা, ফুল চন্দন জানি না। দ্বৈতবাদে বলবি— ভগবানই এমন করেছেন— কেমন না? না রে, ভগবানও আমাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি (হুঙ্কার)।

* **অনুরাগ হচ্ছে এক রকম যোগজ ব্যাধি**। দেহেতে ফোটে। লোমকুপগুলো লাল হয়ে ঘামাচির মত ফুলে ওঠে। তা বলে কোন ব্যথা বা জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না। চার পাঁচ দিন পরে আবার মিলিয়ে যায়।

* সে সময় খুব ধ্যান করতুম। মাঝে মাঝে এই রকম হয়। খুব ধ্যান করি। সেই সময়ই একদিন **দৈববাণী হ'ল— ''এবার নীল চৈতন্য।''** পুরাণকার এই নীল চৈতন্যের কথা জেনেছিল, কিন্তু বোঝেনি কিছু। তাই শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরামচন্দ্রকে নীল রং করে ছেড়ে দিয়েছে। নীল চৈতন্য মানে হলো জগদ্ব্যাপী চৈতন্য। নীল চৈতন্য কী তা বোঝাবে বলেই কবে আমায় দেখিয়ে রেখেছে।

* **জীবনটা যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ**। সুখেও আনন্দ, দুঃখেও আনন্দ। সকালে কান কট্‌কট্‌ করছে তাতেও আনন্দকে দেখছি। তেল মাখছি— আনন্দ, নাইছি— আনন্দ, খাচ্ছি— আনন্দ। তরকারিটা খেতে ভাল লাগছে না— তাতেও আনন্দ, আবার যা ভাল লাগছে তাতেও আনন্দ। সর্বক্ষণই এই আনন্দ।

✻ **নির্বাসনা কাকে বলে জানিস?** এই গামছা দিয়ে মুখ পুঁছলুম। বোধ হ'ল আমার না, অশোকের মুখ পুঁছলুম। কি বোঝাচ্ছে জানিস? আমার এমন কিছু নেই যার জন্য শোক হতে পারে। একেই ওরা বলে নির্বাসনা। বাসনা থাকলেই শোক।

✻ **তখন তখন সকাল থেকেই খুব ভাব হোত**। সকালে ভাব হলে বাজারে বেরিয়ে পড়তুম। বাজারে নানান লোকের ছোঁয়ায় ভাব কমে যেত। তা না হলে রান্নাও হয়ত হোত কিন্তু খাওয়া আর হোত না। জামা গায়ে দিয়ে অফিসে বেরিয়ে পড়তুম। কোন ভ্রুক্ষেপই থাকত না। খাওয়া হোত হয়ত সেই রাত্রে। এইভাবে কিছুদিন সকালে খাওয়া উঠেই গিয়েছিল।

✻ তখন তখন ভাবতুম— শুধু অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ কেন? আর কি কিছু হতে পারে না? **নাম কি দেহেতে ফুটতে পারে না**— কপালে নাম ফুটে উঠবে? তা, কপালে ফুটলো না, ফুটলো পিঠে— 'শ্রীরামকৃষ্ণ'।

✻ **Christian mysticism-এ Holy Hound-এর কথা আছে।** কিন্তু ওরা ধরতে পারে নি। Hound (শিকারী কুকুর) কি করে? শিকারের সন্ধান করে। মানুষের শিকার কি— ঈশ্বরত্ব। তারই খোঁজে সে ঘোরে। আমি এই কুকুর দেখেছিলুম তোদের বলেছি। বাঁ হাতে নুন টিপে বসে আছি আর একটা মস্ত বড় কুকুর, সে যে কত বড় তা বলতে পারি না। সেই কুকুরটা আকাশেই পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে আর আমার হাতের নুনটা খেতে আসছে। অর্থাৎ, আমারই পরিবর্তিত রূপ তখন ঈশ্বরত্বের সন্ধান করছে। যখন হাতে নুন টিপে বসে আছি দেখেছিলুম, তখন আমি সন্ত্ হই নি। যো রামরস চাখে ওহি সন্ত হ্যায়। রামরস মানে নুন। নুন চেখেছিলুম অনেক পরে। তখন আমার ভেতরে মানুষ রতন। আমি এক দানা নুন মুখে দিলুম। ঘুম ভেঙ্গে গেল, ঘুম ভাঙতে বুঝলুম আমার মুখটা নোনতা হয়ে আছে। তখন মনে হলো আরে এই তো রামরস চাখা।

✻ **বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান? তোদেরকে বলি শোন**। একদিন স্বপ্নে দেখছি— একটা নদী। আমি সেই নদীতে স্নান করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলুম। নদীর ধারেই এক মন্দির। সেই মন্দিরের মধ্যে এক কালীমূর্তি। আমি ধূপকাঠি দিয়ে সেই মূর্তির আরতি করতে লাগলুম। কী আনন্দই যে হচ্ছে কী বলব। পরের দিন সকালে উঠে মনে হোল— আরে, এ তো সাত্ত্বিক ভোগ।

এর সাত আট বছর পরে। ইচ্ছে হোল মেনোর (মাসতুত ভাই, মানিক লাল বসু) দেশে চলে যাব। একটা ধ্যান ঘর করব। আমাদের ওখানে একজন ইঞ্জিনীয়ার ছিল। তাকে বললুম, "দেখ শিবু, এই রকম একটা ধ্যান ঘরের প্ল্যান করে দিও তো। আর কত খরচা পড়ে জানিও।" সে বললে, "আজ রাত্রে, না হয় কাল সকালে দিয়ে যাব।" একথা আমাদের হয়েছিল সকাল বেলায়— রাত্রে স্বপ্ন দেখছি আমি যেন লাহাদের, নরেন লাহাদের বাড়ী গেছি। ওদের প্রত্যেক বাড়ীর সামনে একটা করে দালান আর রক, তারপর অন্দরমহল। সেই দালানে দুটো ছেলে পড়ছে। একটা ছেলে বলছে property আর একটা ছেলে মানে বলছে— 'অষ্টপাশ'। সে যত বলে property, অপরটি তত বলে অষ্টপাশ। এই ভাবে বার কতক হবার পর আমার মনে হোল— একি নতুন dictionary হোল নাকি— property মানে অষ্টপাশ। ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন মনে হোল— আরে, আমি তো ধ্যান ঘর করতে যাচ্ছি! ধ্যানঘর মানে তো property! আমাকে তো ধ্যান ঘর করতে বারণ করছে!

দেখ, শুরু হোল কালী মন্দিরে; পূজার আনন্দ হোল সাত্ত্বিক ভোগ, আর তার শেষ হল— property মানে অষ্টপাশ। তাইতো আগে আগে বলতুম— ওরে সন্ন্যাসী যখন একটা একটা করে ইঁট গাঁথে, সে ইঁট গাঁথে না, সে নিজেকে গাঁথে। এবার আমার এই অনুভূতির সঙ্গে মঠের কথা ভেবে দেখ দেখি।

✻ (২৪-৬-১৯৬০) আজ কথা প্রসঙ্গে **ভোলাবাবু বললেন, এত কালী মন্দিরে যে কালী ঠাকুর রয়েছেন একটিও যদি জীবন্ত হয়ে উঠতেন তবে বুঝতুম**। এই কথা শুনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন—

ও কথা বলিসনি রে! এই মনুষ্যদেহ পেয়েছিস কি অদ্ভুত ক্ষমতা যে ওর কি বলব! ওই তাকে জীবন্ত করে তুলবে। তোর দেহ থেকেই

সে জীবন্ত মানুষ হয়ে বেরোবে। এত অদ্ভুত এই মনুষ্য দেহ। একদিনকার কথা বলি শোন, সেদিন সকাল বেলা, এক শিব মন্দিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। খুব ভাবে রয়েছি। আমি শিব মন্দিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, শিব ঠাকুর আর থাকতে পারলেন না। মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন, এসে আমার সঙ্গে hand shake করে আবার মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। ভাব দিকি কি অদ্ভুত এই মনুষ্য দেহ। এমন সময় **সৌরেন (বাণীর মামা) আর একটি প্রসঙ্গ তুলে নিবেদন করল, সেই সিদ্ধেশরী এসেছিলেন আপনার কাছে।** শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলতে লাগলেন—

আবার সে কথা তুললি। কত অদ্ভুত ব্যাপারই যে হয়ে গেছে। আমি তখন অফিস থেকে ছুটি নিলেই আমার অসুখ হোত। সেবার ছুটি নিয়েছি, গায়ে কতকগুলো ফোড়া হয়েছে। ক'দিন কোথাও বেরোইনি। এমনিতেই আমি বড় একটা কোথাও বেরোতুম না। কেষ্টদা ছিল আমার সঙ্গে। তখন খাবার সময় হয়েছে। আমি কেষ্টদাকে বললুম — তুমি একটু বস, আমি খেয়ে আসি। কেষ্টদা ডেক চেয়ারটায় বসল। আমি খেতে গেলাম। তারপরই কেষ্টদার ট্রান্স এসেছে। কেষ্টদা দেখছে— একটি ছোট ৫/৭ বছরের মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। আর তার সঙ্গে ruffian type-এর ৪/৫ জন লোক, ছোট বড়। তাদের মধ্যে যে লোকটি বয়সে বড় সে কেষ্টদাকে বলছে, উনি কোথায়? উনি রোজ যান, এই মেয়েটি তাঁকে প্রণাম করে। আজ ক'দিন উনি যান নি। মেয়েটি প্রণাম করতে পায় নি, ছট্‌ফট্ করছে। তাই ও নিজেই এখানে এসেছে প্রণাম করবে বলে। তারপরই কেষ্টদার ট্রান্স গেল ভেঙে।

আমি ফিরে আসতেই কেষ্টদা সব বললে, আমি শুনেই বুঝলুম। ও মেয়েটি সিদ্ধেশ্বরী। রোজ ওই সিদ্ধেশ্বরীতলা দিয়েই তো প্রণাম করে যাই। ক'দিন যাওয়া হয়নি। ভাবলুম, এমনি করেই প্রতিমা জাগ্রত হয়ে ওঠে। আমি তো কোন কিছুই গ্রাহ্য করিনি। ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিলুম। বললুম, মায়ের যদি এতই দয়া তবে দেশবন্ধুর (বড়বাজারে দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের) এক ঝোড়া খাস্তা কচুরী আর এক ঝোড়া আবার-খাব সন্দেশ নিয়ে এলেই তো বেশ হোত।

***** আজ (৩০-৬-১৯৬০) দুপুরে **সেই ঋষির কথা মনে হচ্ছিল, যে ঋষি বলেছিল, ''চৈতন্য শীঘ্রই অবতার হয়ে আসছে।''** আমি ভাবলুম চৈতন্যদেব আবার কোথাও জন্মেছেন, সেই কথা জানিয়ে দিল। বাইবেলের সেই Wise men-দের মত চৈতন্যের আবার আবির্ভাবের কথা আমাকে জানিয়ে দিলে। তখন চেতাবনীর কথা মনে পড়ল। চেতাবনীতে লিখেছিল চীনে কোথায় অবতার জন্মেছেন, সেই কথাই বুঝি আমাকে জানিয়ে দিল। পরে সহস্রার থেকে কটিদেশে চৈতন্যের অবতরণ দর্শন হলে কথাটির প্রকৃত অর্থ বুঝেছিলাম।

''চৈতন্য শীঘ্রই অবতার হয়ে আসছেন'', এ কথার অন্য কোন অর্থ করতে পারিস? চৈতন্য রূপে আমি মানুষের দেহে অবতীর্ণ হব সেই কথা জানিয়েছিল (হুঙ্কার)। এতদিন গেল ততদিন গেল আজ কেন একথা মনে হোল বল দেখি? তোরা সব স্বপ্নের মানে করিস, বুঝতে পারছিস স্বপ্নের মানে বোঝা কত শক্ত! আবার এও হতে পারে যে আমার চৈতন্যে যা উদয় হবে তাই তোদের মনে ফুটবে। এটা হোল রূপ, সেটা হবে বোধ। সেটা হবে more acute but easy।

*** ভগবান বলতে কী বোঝায়?** বলতে পারিস, তোরা ভগবান বলতে কী বুঝিস? আমি তো কোন উত্তর খুঁজে পেলুম না। অথর্ব্ব বেদে শুধু একটা কথা খুঁজে পেয়েছি— সঃ একঃ। সঃ একঃ-র সম্বন্ধে অতীতেও কিছু পাই না। ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে কিনা জানি না। আমরা শুধু এইটুকু জেনেছি যে মানুষগুলো দেখতে বহু কিন্তু ভেতরে এক। ভেতরে তার একটা সত্তা আছে। এখানে কিছু লোকের মধ্যে এই একত্ব ফুটে উঠেছে। আমরা যা পেয়েছি শুধু তাই নিয়েই বিচার করব। এখন এই 'এক' ভগবান কিনা তা কেমন করে বলবো! তোরা বলবি কেন আপনাকে তো বলে দিয়েছে। সে ব্যষ্টির সাধনে কি ভাবে সংস্কার ফুটে উঠেছে। আর তা ছাড়া ওই যে জ্যোতি, ও আমিই তো জ্যোতিষ্মান হচ্ছি, আমিই সচ্চিদানন্দগুরু হচ্ছি, আমিই আবার দেখছি। আমার নাক কান চোখ ফুঁড়ে বাইরে থেকে তো কিছু আসছে না। আমি যা বুঝেছি তাই তো বলবো। তোরা যা বুঝিস বুঝবি।

ঊনত্রিংশ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— জুলাই মাস, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ)

* **ওদের মতে ঈশ্বর সর্বভূতে ওতঃপ্রোত হয়ে আছেন**। কিন্তু সর্বভূত যদি একথা না বলে, যে ওগো, আমরা ঈশ্বর, তবে ওদের ও কথার মূল্য কি? ওতো নিছক অনুমান। ওরে মানুষই ঈশ্বর হয় আর সে জিনিস প্রথমে এখানেই ফুটেছে।

* **ধর্ম অধর্ম এসব তো সংস্কারের কথা**। শুধু বল, কেন এত লোক আমাকে দেখছে? ধর্মই বল, অধর্মই বল ও সব তো সংস্কারজ কথা। চোরও আমাকে দেখছে। অধর্ম তাহলে থাকছে কোথায়? ধর্ম কি শুনে রাখ্— It is the natural feature in every human body.

* **হ্যাঁরে, ওই যে জীবশিক্ষার কথা বলেছে— জীব কই?** আমি তো জীব খুঁজে পেলুম না। সবই যে শিব। শিব মানে? এক। আবার ওরাই বলছে, ভগবান দর্শনের পর দেখে ঈশ্বরই সব হয়েছেন। তা হলে জীব শিক্ষা? সবাই যদি ঈশ্বরই হোল, তবে কে কাকে শিক্ষা দেবে?

* **ঋষিরা বললেন, মানুষই ব্রহ্ম, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'**। আর পরবর্তী কালে আচার্যেরা সেই কথা চাপা দিয়ে বললেন, 'দাস আমি'। কবীর বলছেন, 'ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম তেরা।' এই গানটা যখন শুনি আমার শরীর তখন যে কী করে তা বলতে পারি না। আজ যদি কবীরকে পেতাম, তাকে টেনে এনে বলতাম, দেখাও তোমার ওই 'তেরা'টিকে। ঠাকুরও কম যান না। তিনি বলছেন, 'শালা, আমি তো যাবে না, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে।' যে দেশে ঋষিরা বললেন, মানুষই ব্রহ্ম সেই দেশেরই আচার্যরা মানুষকে কোথায় টেনে নিয়ে এসে বললেন, আমি দাস।

* কথামৃতের চতুর্থ ভাগে **ভগবতী কন্যা কিভাবে ছুতো ধরে রণজিৎ রায়ের বাড়ী থেকে চলে যান** সেই অংশটি পড়া হচ্ছিল।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন— দেখছিস, ওদের ভগবতী কী রকম! খালি

ওৎ পেতে বসে আছে, একটা ছুতো পেলে হয়। ওদের ভগবতী হচ্ছে fault-finder and short-coming seeker! যেন দড়িতে ফাঁস দিয়ে বেড়াচ্ছে, একটা কিছু পেলেই অমনি গেরো দিয়ে দেবে। যোগেতে এর ব্যাখ্যা কর দেখি। ভগবতী অর্থাৎ কারণ শরীর। আমি তো তোদের কতবার বলেছি— ভগবান যদি দেহেতে উদয় হন তিনি তো তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ জেনেই দেহেতে উদয় হচ্ছেন। রণজিৎ রায়ের কারণ শরীরে ভগবতী উদয় হলেন, তবে আবার ছেড়ে গেলেন কেন? দেখ্ ফণী (ফণীবাবু তখন কথামৃত পাঠ করছিলেন) তোর দেখছি চশমা পাল্টাবার দরকার হয়েছে। ভগবতীরও দেখছি চশমা পাল্টাবার দরকার, তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান না কি না! আসল কথা কি জানিস? এই সব বিষয়ে এদের idea এত hazy যে আর কি বলব!

* **ঠাকুর ওই যে বলছেন, মলয়ের হাওয়া বইলেই সব গাছ চন্দন হয়, একথা শুনে আমার সেন্ট্ টেরেসার কথা মনে পড়ছে**। সেণ্ট্ টেরেসার গা দিয়ে এক রকম সুগন্ধ বেরোতো, সে যে কেবল কাছের লোকগুলিই গন্ধ পেত তা নয়, সে গন্ধ অনেকটা জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে থাকত। সেন্ট্ টেরেসা মারা যাবার পর যখন তাকে কবর দেওয়া হয় তখন কবরের ভেতর থেকেও সেই গন্ধ বেরোতে থাকে। মলয়ের হাওয়া হ'ল কুণ্ডলিনী জাগরণ; গাছ বা কাঠ হচ্ছে দেহ আর চন্দন হচ্ছে সুগন্ধ। অর্থাৎ সেণ্ট্ টেরেসার কুণ্ডলিনী এমনভাবে জেগেছিল যে সেই কুণ্ডলিনী জাগরণের ফলে তার গা দিয়ে এক রকম সুগন্ধ বেরোতো। সেণ্ট্ টেরেসা যখন মারা গেল ওই কবরের ভেতর থেকে সুগন্ধ আসার কথা শুনে একজন ডাক্তার বললে, দাঁড়াও তো বুজরুকি বার করছি। তারা ভেবেছিল যে কোন রকম মাস্ক্ ইনজেক্শন করে থাকবে বা পিরামিডে যেমন নানা রকম উপকরণ সঙ্গে দিয়ে মৃতদেহ রেখে আসা হ'ত সেই রকম কিছু একটা করা হয়েছে। এই ভেবে তারা কবর খুঁড়ে সেণ্ট টেরেসার একটা হাত কেটে নিয়ে এল। তখন দেখে যে সেই হাড়ের ভেতর থেকেও সুগন্ধ বেরোচ্ছে। ওরা তো অবাক! পোপকে লিখলে যে আমরা এই রকম করে ফেলেছি। পোপ বললে, যেখানকার জিনিস সেইখানে রেখে এস। তখন তারা সেই হাতখানা আবার কবরের মধ্যে রেখে আসে।

কি অদ্ভুত এই মনুষ্য দেহ! কত অফুরন্ত শক্তি যে আছে এর মধ্যে তা বলা যায় না।

✻ **ঠাকুর একদিন শিব মন্দিরে যাচ্ছেন। একজন ধরে বসলেন, আপনি শিব ঠাকুরের কিছু মাহাত্ম্য শোনান।** সেই কথা শুনে ঠাকুরের ভাব হয়েছে। ঠাকুর বলতে লাগলেন, শিব ঠাকুরগো, তোমার গুণের কথা আর কি বলবো। সমুদ্র যদি কালি হয় আর মৈনাক পাহাড় যদি কলম হয় তবু তোমার কথা বলে শেষ করা যায় না। শিব ঠাকুর কে বল দেখি? তোরা রে, তোরা! এই মানুষই শিবঠাকুর। সমুদ্র যদি কালি হয়, মৈনাক যদি কলম হয়,তবুও এই দেহেতে কি জিনিস আছে তা লিখে শেষ করা যাবে না।

✻ **ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে তাঁকে লাভ করা যাবে।** ঈশ্বরের উপর যে ভালবাসা হয়েছে তা জানা যাবে কী করে; ওরে, জগৎ জানিয়ে দেবে। আমি তোদেরকে ভালবাসি। এত ভালবাসি যে জগতে কেউ তোদের সে ভাবে ভালবাসে না। কেন বল দেখি; আর সবাই বাইরে, আমি যে তোদের ভিতরে!

✻ **ঠাকুর বলছেন, ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকা— এই আর কি!** না রে, ওসব নয়! ভক্তি ভক্ত— ওসব বুঝবি কী করে? এই এক হয়ে থাকা! এক হয়ে থাকা কেন? ওই যে আমি বিদ্যাপতির গানটা প্রায় বলি 'দশদিশি ভেল নিরদ্বন্দ্বা'! পৃথিবীতে চারদিকে দ্বন্দ্বের অবসান করতে এক হওয়া।

✻ কথামৃত পড়া হচ্ছে। **শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, বটতলায় ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেড়ে মুসলমান (মোহাম্মদ) সানকি করে ভাত নিয়ে সামনে এল। সানকি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন— সব এক। এক বই দুই নাই।**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, হ্যাঁরে, এইতে কি সব 'এক' এই প্রমাণ হয়? Does this calculation follow? এ তো প্রতীকে ব্রহ্মজ্ঞানের

কথা বলছেন। অন্ন হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতীক। প্রতীকে তাই অন্ন ব্রহ্ম। কিন্তু অন্ন ব্রহ্ম কার পক্ষে? বিরোচনের পক্ষে।

বিরোচন ছিল অসুর। উপনিষদে এই কাহিনী আছে, বিরোচনের বেলায় হল অন্ন ব্রহ্ম। আর ইন্দ্র গেল তপস্যা করতে। তপস্যা করে তার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'ল। তাই ইন্দ্রকে ব্রহ্ম বলে। এই উপমার মধ্যে যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা আছে তা হচ্ছে অসুরদের ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। দেড়ে মুসলমান ম্লেচ্ছদের আর ঠাকুরকে ভাত দিলে, ঠাকুর বলছেন— দেখালে সব এক! আর আমাদের 'এক' কাকে নিয়ে? আমাকে নিয়ে। আমি কে? একজন জ্যান্ত মানুষ। ভাত দেখিয়ে 'এক' আর একজন জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে 'এক' কত ফারাক বলতে পারিস?

✻ আমরা তখন থাকতুম গড়পারে। **দিদিমা গুপ্তধনের ব্রত করতেন।** একটা ক্ষীরের নাড়ু, তার মধ্যে একটা দুয়ানী পোরা থাকত। সেটা তিনি একজন ব্রাহ্মণকে দিতেন। ওখানে একটি ব্রাহ্মণের ছেলে আমার বন্ধু ছিল। তাকে ডেকে আনতুম। সে ওই দুয়ানিটি বার করে ক্ষীরের নাড়ুটি খেত। দুয়ানিটি জমান হত। একসের মাংসের দাম হলেই ব্যস, আর কি, মাংস লাগান হত। তারও দর্শন হয়েছিল। তাদের বাড়ীতে বাগান ছিল। সেই বাগানের মাঝখানে একটা বড় গাছ ছিল। একদিন সে দেখছে সেই গাছতলায় কত দেবদেবী লীলা করছেন। ওই হচ্ছে উঁচু সাকার ঘর। ওদের ওই রকম দেবদেবী দর্শন হয়।

✻ **আমি এ জীবনে কী চেয়েছিলাম? আমি তো কিছু চাইনি। চাইনি বলেই এই জগৎব্যাপী-আমি পেয়েছি।** এমনই জীবন নিয়ে জন্মেছিলুম যে আমার মাথায় কামনা বাসনার স্থান ছিল না। সেই অনুভূতির কথা মনে পড়ছে। আমি বাজার করে ফিরছি। বাঁড়ুজ্যেদের পুকুরের কাছে এসে যেন ঘুরপাক খাচ্ছি। আনন্দে যেন ঘুরপাক খাচ্ছি। আমি তখন নিজে নিজেই বলছি— আমার এত আনন্দ কেন রে? আমি তো কিছু চাইনি, তাই বুঝি আমার এত আনন্দ।

✻ **আমি সেই যে নাক জুবড়ে আম খেয়েছিলুম, সেই অনুভূতির**

একটা মানে পেয়েছি। আমি যেন একটা খুব বড় আম খাচ্ছি, নাক জুবড়ে খাচ্ছি। আমার ইচ্ছে যে আঁটিটায় কামড় দিই, কিন্তু আঁটি আর পাচ্ছি না, কেবলই শাঁস। আম হচ্ছে অমৃত। এই দেহে অনন্ত, অফুরন্ত অমৃতত্ব তার আর শেষ নেই।

* **তোর ভেতরেই সব**। Nothing comes from outside। মরে গিয়ে মুক্তি— It is absolutely, purely and simply imagination। মরে গিয়ে পাওনাদারকে ফাঁকি দেওয়া যায়, আর কিছু হয় না।

* **ঠাকুর বলেছেন, কালী, গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে তবে ঠিক জ্ঞান হয়**। এখানে কালী গৌরাঙ্গ এক দেখেছিল G.P.O.-র সেই কেষ্টবাবু। কালীপুজোর দিন পাড়ায় পাড়ায় সর্ব্বজনীন কালীপুজো হয়েছে, উনি গেছেন প্রতিমা দেখতে। কিন্তু কালীমূর্তি আর দেখতে পান না। দেখেন গৌরাঙ্গ। এ গেল দু'নম্বর। এক নম্বর দেখেছিল হরেন, তখন আমি থাকি বেঙ্গল বোর্ডিং-এ। হরেন দরজার বাইরে থেকে আমায় দেখছে কালী, আর ভেতরে ঢুকে দেখছে গৌরাঙ্গ। তারপর ঘরের মধ্যে বসে হরেন ওকথা জানাল। কালী গৌরাঙ্গ এক— কী? পুরুষ আর প্রকৃতি যখন এক হচ্ছে তখনই কালী গৌরাঙ্গ হচ্ছে। বাড়ীতে মেয়েরা দেখছে— কি হচ্ছে? কালী গৌরাঙ্গ এক হচ্ছে না?

* **একবার তারা খুব চড়ে গিয়েছিল**। কয়েকদিন ওই অবস্থায় ছিল। একদিন বিকালে অফিস থেকে সকাল সকাল ফিরে আমার কাছে এসেছে। ক্রমেই he started raving (প্রলাপ বকতে আরম্ভ করল)। বলতে লাগল— আপনি আমায় hypnotise করেছেন, আপনি mesmerise করেছেন। আমি আপনার সব বন্ধুদের বলে দেব— এই ভাবে বকতে লাগল। তারপর আমার মনে হ'ল আমি যেন তার ভেতর থেকে কি টানতে লাগলুম। কিছুক্ষণ পরে তাকে বললুম, যাঃ, তোর ও সেরে যাবে। সেও কিছুক্ষণ পরে বললে, হ্যাঁ, আমি যেন একটু ভাল বোধ করছি। এই ঘটনার তিন চার মাস পরে ও একদিন বলেছিল, ঠাকুর স্বামীজীকে ছুঁতে স্বামীজীর যেমন হয়েছিল আমার যেন

সেই রকম হয়েছিল। কিন্তু আমি তো ছুঁতুম টুতুম না, তবে তখন ওরা সব পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত।

* **তুই আমাকে স্বপ্নে দেখিস, আমি কে বল দেখি?** এত লোক থাকতে আমাকেই বা দেখিস কেন? আমি কে? ভগবান বল, ব্রহ্ম বল, আত্মা বল, ওসব তো সংস্কারজ কথা। যদি বলিস আমি মানুষ তাহলে প্রশ্ন করব, এত লোক থাকতে আমাকেই বা দেখিস কেন? আর কি কোন লোক নেই?— তাদেরকে দেখিস না কেন? এখানে এমন এক অদ্ভুত জিনিস হয়েছে যা বোঝাবার ভাষা নেই।

তোরা যে এত লোক আমাকে দেখিস, আমাকে তোদের কী মনে হয়! আমি একজন মানুষ। কিন্তু কী রকম মানুষ? এ একটা নতুন জিনিস হয়েছে, কেমন না? তাহলে **আমি নতুন মানুষ**। **এই নতুন মানুষ কী করেছে? নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে!**

ত্রিংশৎ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— আগস্ট মাস, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ)

* **কথামৃতে যেখানে দেখবি ওই কথা, 'সংসারী লোক, সংসারী লোক' সব কেটে দিবি,** কেটে দিয়ে বসাবি সাধারণ লোক, তবু যা হোক কিছু হবে। আমরা কি করে ওকথা বলবো? আমাদের যে দেখাচ্ছে রে সব ব্রহ্ম। ওকথা বললে সত্যের অপলাপ হয়।

* **ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) ওই যে বলছেন, সব ত্যাগ হলে তবে ঈশ্বর লাভ হয়, ও কথা ঠিক নয়**। ঈশ্বর লাভ হলে সব আপনা হতে ত্যাগ হয়ে যায়। আর, যার ত্যাগ হয় সে জানতে পারে না। জানলে সে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। ঋষিরা জলৌকার কথা বলে গেছেন। জলৌকা (জোঁক) তার সামনের দিকটা আগে এক জায়গায় রাখলে তবে তার পিছন দিকটা এগিয়ে আসে। তেমনি আগে ঈশ্বর লাভ; ঈশ্বর লাভ হলে ত্যাগ আপনা হতে হয়।

* **সাংখ্য বলেছে যে পরকায় প্রবেশন হয় না।** সে এক ঋষিদের যুগে হতো, এখন আর হয় না। শঙ্করাচার্যের জীবনে পরকায় প্রবেশনের এক গল্প আছে। শঙ্কর মৃত রাজার দেহে প্রবেশ (পরকায় প্রবেশন) ক'রে সব জেনে নিল, তারপর তর্কযুদ্ধে উভয়ভারতীকে হারিয়ে দিল। এ কিন্তু ঠিক নয়। যোগী কখনও পরকায় প্রবেশন করতে পারে না। পরকায় প্রবেশনের স্মৃতি তো যাবার নয়। সেই স্মৃতিটুকুও যোগী সহ্য করতে পারে না। আর দেখ্, একটু আগে আমি মুখ পুঁছলুম, দেখলুম অবলাকে; অবলার মুখ পুঁছলুম। এ কি বল দেখি? পরকায় প্রবেশন? না তার ঠিক উল্‌টো। অপরের মুখ আমার মধ্যে ভেসে উঠল। এ তো পরকায় প্রবেশন নয়।

* **এত জোরে জোরে হাত দিয়ে মাথা ঘসছিলুম কেন জানিস? মাথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না।** মাথায় হাত দেবো বলে জোরে জোরে ঘসছি, কিন্তু মাথা আর পেলুম না। হ্যাঁরে, মাথা খারাপ হোল না তো? তোদের ব্যষ্টির সাধন মতে আমার 'আমি' বোধ ছিল না। 'আমি' বোধ উঠে গিয়েছিল, তাই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আমি রয়েছি অথচ আমার 'আমি' বোধ নেই— কি অদ্ভুত বল দেখি!

* **দেখ না, সব সময় তোদের কাউকে না কাউকে দেখছি।** তখন হাই তুললুম, ক্ষিতীশ হাই তুলল। এই মুখ পুঁছলুম, কালীর মুখ পুঁছলুম। চোখ বুজে বসে আছি, উমা তোকে দেখছি। কাল রাত্রে তোকে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিলুম। এবার দেখছি ওই ওটাকে (নারায়ণকে), ও নামও বলে না, একটা কথাও কয় না। কালী, আবার তোকে দেখছি। এবার কালীবাবুকে; কালী, আবার তোকে। Brain-এ একটা permanent stamp দিতে চাইছে যে আমিই সব হয়েছি, আমিই এই জগৎ হয়েছি। সেদিন ওখানে (বাড়ীর ভিতরে কলতলার দিকে) মেনোর বড় ছেলের সঙ্গে কথা বলছি। অমনি সে হয়ে গেলুম। তাও যদি দেখতুম যে যাকে দেখলুম তাকে বশীকরণ করা গেল, তা হলেও বুঝতুম। এক এক সময় মনে ফুট

কাটে— তাই তো, আমিই সব হয়েছি। বেদান্তের অনুভূতির সময় এইরকম ফুট কাটতো— এই জগৎ, আমার ভেতরে।

* (অপর একদিন) **এই হাই তুললুম, দেখলুম কালীকে। এর মানে কী বলতে পারিস?** কী আশ্চর্য অর্থ এর। হাই তুললে জীবনী শক্তি ক্ষয় হয়। তাই যে শক্তিটুকু ক্ষয় হোল আদ্যাশক্তি রূপ ধারণ করে ফুটে উঠে সেই ক্ষয়টুকু পূরণ করে দিলেন। কি অদ্ভুত এই দেহ, কি অদ্ভুত যোগ! আচ্ছা, এত লোক তো রয়েছে, কালীকেই কেন দেখলুম? আনন্দকে দেখলুম না কেন? আনন্দকে তো দেখা উচিত ছিল। আনন্দে যে সংহারও হয়। কিন্তু এ তো সংহার নয়। এ জীবনী শক্তির পূরণ। তাই আনন্দকে দেখলুম না। দেখলুম কালীকে।

* **তোরা কেউ ষট্‌চক্র বা সপ্তভূমি দেখেছিস?** দেখে থাকিস তো বল। কেউ দেখিস নি? অথচ দেখ, হিন্দু মতে তোদের ব্রহ্মত্ব লাভ হয়েছে। ষট্‌চক্র, সপ্তভূমি যদি নাই দেখলি তবে তোদের ব্রহ্মত্ব লাভ হোল কী করে? অর্থাৎ, প্রমাণ করলি যে ওসবের কোন প্রয়োজন নেই। এখন শুরু হয়েছে নতুন যুগ। তাই ওদের সব কিছু বাতিল হয়ে গেছে।

* **(৭/৮/১৯৬০) আজকের সবচেয়ে ভাল খবর হচ্ছে ভগতের বউ (একজন জার্মান মহিলা) আমায় স্বপ্নে দেখেছে।** সে দেখেছে— কাপড় পরা, খালি গা, মুখে ছাঁটা দাড়ি, দু'হাত তুলে যেন অভয় দিচ্ছি। পিছনে সূর্য। দেখেই চিনেছে, বলেছে এই বাবা! এই প্রথম একজন foreign lady (বিদেশী মহিলা) আমায় স্বপ্নে দেখল।

* আজ প্রায় দু'বছর দু'মাস কয়েকদিন হোল, সেই কলেরার পরদিন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল— **তোরা ভজিস রামকেষ্ট; আর দেখিস জীবনকেষ্ট কেন?** যতদূর পারিস এই কথাটাকে extend করে মানে কর। অর্থাৎ, যে যাই ভজনা করুক না কেন আমাকে দেখবে। মুসলমান কি আমাকে ভজনা করে? তবে আমায় দ্যাখে কেন? সেদিন মুখ দিয়ে ঠিক কথাই বেরিয়েছিল।

✻ আজ একটা কথা বলব? **বেদের ঋষি যে বলছে, অহং ব্রহ্মাস্মি এ কথা ঠিক হচ্ছে না**। এ ভুল বলা হচ্ছে। আমি নিজেকে ব্রহ্ম বললে তো হবে না। ভাবমুখে তো একথা বলা যায় না। জগৎ জানিয়ে দেবে যে সে ব্রহ্ম, তবে হবে। আর ঠাকুরের কথা তুলে ধর, যে বাবু সে কি বলে বেড়ায় যে সে বাবু আর জাঁক করে? প্রমাণ এই ঘরে। হাজার হাজার লোক বলছে। এত লোক তো আর কখনও বলেনি।

✻ **শঙ্করাচার্য বললেন, 'চিদানন্দরূপঃ শিবোহং।'** স্বামীজী বললেন, 'মানুষের স্বরূপ কী? আমিই সেই সচ্চিদানন্দ।' আর আমাদের বেলায়? সেই সচ্চিদানন্দকে (শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপ) ভেতরে দেখে সকলের এক হয়ে যাওয়া।

✻ **ঈশ্বরের স্বরূপ কী?** মানুষের রূপই হোল ঈশ্বরের স্বরূপ। আমি তো মানুষ। তাহলে? ঈশ্বরের স্বরূপ কি এই নিয়ে কত কাণ্ডই যে হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। পৃথিবীতে ধর্ম নিয়ে যত যুদ্ধ হয়েছে এত যুদ্ধ আর কিছুর জন্যে হয় নি। ক্রুসেডে একদিকে খৃস্টান-ইউরোপ জড় করেছে যত পেরেছে তত সৈন্য, আর একদিকে জড় হয়েছে মুসলমান জগতের সৈন্য। বিবাদ কি নিয়ে? কার ঈশ্বর বড়! ভারতবর্ষেও বড় কম হয় নি! ভারতবর্ষে ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে কত কি যে হয়েছে তা ঠাকুরের কথায় বলি, সমুদ্র যদি কালি হয় আর মৈনাক যদি কলম হয় তবুও তা লিখে শেষ করা যাবে না। আর আমাদের কাছে ঈশ্বরের স্বরূপ হোল মানুষের রূপ। প্রমাণ? প্রমাণ— তোরা দেখছিস। কে করেছে বল দেখি। কত বড় যাদুকর বল দেখি। কি অদ্ভুত যাদুকর সে!

✻ **হিন্দু দর্শন অত methodical, অত accurate কিন্তু তবুও তারা বলছে— মরে গিয়ে মুক্তি**। একবার মরলে হয়, অমনি মুক্তি এসে কপ্ করে আঁকড়ে ধরবে। ওরা কখনও কখনও জীবন্মুক্তি, স্বচ্ছন্দ দর্শন ও সদ্য মুক্তির কথা বলেছে বটে, কিন্তু তা কী কেউ তা বোঝাতে পারে নি। প্রায় সবাই বলেছে মরে গিয়ে মুক্তি। ঠাকুর কেশব সেনকে ওই যে বলছেন,

'ওসব কথায় (পরলোকের কথায়) তোমার কাজ কী? তুমি আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও'— ও বরং ভাল। বুদ্ধদেবও ওসব কথা কখনও কিছু বলতেন না। মৃত্যুর পর কী হবে— এ কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি চুপ করে থাকতেন। কিন্তু আশ্চর্য, সেই বুদ্ধদেবের দেহ যাবার পর with all glory জাতক লেখা হল। বুদ্ধদেব বলছেন 'আমি আগের জন্মে এইরকম ছিলুম, সেই রকম ছিলুম ইত্যাদি।' বুদ্ধদেব সত্যিই ওসব কথা বলেছিলেন কিনা তা মেলাবার তখন তো আর কোন উপায় ছিল না।

✻ **কী দেখ কমলাকান্ত মিছে বাজি এ সংসারে? তুমি বাজিকরে চিনলে নাকো, সে যে ঘটে ঘটে বিরাজ করে।**

বাজিকর কে তা জানি না, তবে তার বাজি কী তা বুঝেছি— তোমার এ লোক ভোলান বাজি চাই না। এর চেয়ে ঢের বাজি আছে সেই বাজি দেখাও। লোকের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হয় সেই বাজি কর। সে বাজি হবে এই ব্যষ্টিতে (নিজের দেহ দেখালেন), আর তা হলে এত সব গণ্ডগোল থাকবে না।

✻ **কত হাজার বছর আগে ঋষি উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলছে, 'তত্ত্বমসি'** আর কত হাজার বছর পরে স্বামীজী আমেরিকার প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে সেই কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে বলছেন—

Thou art the man, thou art the woman, thou art the young man walking in the pride of youth, thou art the old man tottering with a stick

ঋষি উদ্দালক যে বলছে, 'তত্ত্বমসি', এই 'তৎ'টি কে? স্বামীজীর ওই 'thou' কে? হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের এই ক্রন্দন ধ্বনি, এই রোদন! 'তৎ' শব্দের উত্তর কেউ দেয় নি। উত্তর দিয়েছিস তোরা। তোদের কাছে এই 'তৎ'-কে, এই thou কে? হ্যাঁ বল্, জোরে বল্— সেই 'তৎ' হলুম আমি, thou তোদের কাছে আমি। কে এমন সৃষ্টি করল বাবা? উদ্দালক বলছে, শ্বেতকেতুকে, সেও জ্যান্ত মানুষ, তোরা বলছিস আমাকে, আমিও জ্যান্ত মানুষ। তফাৎ কি? With them it

was higher imagination, with us it is a reality, এই সত্য প্রমাণ করেছিস তোরা। The gift of this reality has been made by you to the world at large, to the whole human race। কিন্তু এসব জিনিসও আমি নিই না, I have crossed this stage. আমি জগৎকে আমার মধ্যে পেয়েছি। জগৎ মানে মনুষ্যজাতি। তাই তো সব সময়ই তোদের কাউকে না কাউকে দেখছি, খেতে শুতে কথা বলতে। আজ সকালেই কি একটা স্বপ্ন দেখলুম। আগু পিছু কিছু মনে নেই, শুধু মনে পড়ছে যেন একটা তারের বেড়া দেওয়া, আমি সেই বেড়ার ওধারে গিয়েছি, আর কিছু মনে নেই।

* **আমার মাথায় আরও বোঝা চাপল**। কী হ'ল জানিস? (৯/৮/১৯৬০) আজ দুপুরে একটু ধ্যান করতে বসলুম এই খাটের ওপর। দেখছি— ওখানটা দিয়ে (যেখানে বসে পাঠকেরা কথামৃত পাঠ করেন) একটা মেয়েছেলে, deep scarlet (টকটকে লাল) রংয়ের কাপড় পরা— একে আমি আগেও দেখেছি, তবে এবার যেন আরও well balanced মনে হোল, লম্বা, ছিপছিপে— ঘরে ঢুকলো। তার মাথায় এক বোঁচকা কাপড়। সেগুলোও সেই scarlet রংয়ের একটা কাপড়ে বাঁধা। মাথায় কাপড়ের বোঁচকা নিয়ে ঘরে ঢুকলো ওই খাটের পাশে। এর মানে কি বলতে পারিস? কাপড় কী রে? দেহ। অত দেহ— মাথায়, সহস্রারে। জিনিসটা ফিরে এল আর কী। ওই বোঝা এল আমার মাথায়।

* একটা কথা তোদেরকে জিজ্ঞাসা করবো? **এখন আমাদের কাছে জীবনের উদ্দেশ্য কী? ঈশ্বর দর্শন না একত্ব লাভ?**

শ্রীধীরেন রায়— একত্ব লাভ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— প্রণাম হই বাবা, প্রণাম হই তোকে। হ্যাঁ, এই একত্বলাভই বড়, কেন না specific ঈশ্বর দর্শন তো হয় না।

এই যে তোরা আমাকে দেখিস এতে কি হয়েছে? এতে একত্ব হয়েছে। কিন্তু একত্ব বোধ হয়েছে কি? এই একত্ব বোধ কি করে হতে পারে বল দেখি? ভোলা, তুই বলছিস— তুই যখন আমার কথা ভাববি তখন আমি যদি বুঝতে পারি তবেই একত্ববোধ হবে। না, তা হতে পারে না। দশ হাজার লোক যদি একই সময়ে আমার কথা চিন্তা করে তখন কি হবে? একত্ব হয়েছে কি ক'রে? আমাকে দেখে। একত্ব যেখান থেকে হয়েছে একত্ব বোধও সেখান থেকে হবে। আমার মনে যা উদয় হবে তাই যদি জগতে ফোটে তখনই হবে একত্ববোধ। এই একত্ববোধ হলে তখন জিনিসটা control করবে। Then it must turn to unification.

* আয় না বসে বসে দেখি কি হয়। সারা জীবন তো দেখেই গেলুম, করিনি তো কিছুই। কেউ বলতে পারে কেন মশাই, আপনি তো যৌগিক রূপ লিখেছেন। সে তোদের ব্যষ্টির সাধন মতে আদেশ পেয়ে লিখেছিলুম। তা ছাড়া ব্যষ্টির সাধনও তো উচ্ছেদ করে দিয়েছি।

* **অষ্টপাশ প্রসঙ্গে একটা স্বপ্নের মানে কর দেখি। ইছাপুরের বড় কালীবাবু, সেই বৌমা দেখছেন—**

যেন কথামৃত পড়া হচ্ছে। কথামৃতে যেখানে ঠাকুর বলছেন— অষ্ট বন্ধন নয় অষ্টপাশ, সেইখানটা পড়া হচ্ছে। এমন সময় আমি গিয়ে পড়েছি, সঙ্গে অনেক লোক। আমি বলছি, আমি জগতের সব লোকের অষ্টপাশ খুলে দিয়েছি। এর মানে কি বল দেখি? ওই যে আমি আজকাল বলছি না— যে, আমার মনে যা উদয় হবে জগতে তাই ফুটবে, বৌমা সেই জিনিস দেখেছেন। স্বপ্নটা হচ্ছে in embryo, এর effect দেখলে তবে বুঝতে পারা যাবে, এর আর কিছু মানে তোদের মনে হয়? বল না যদি কেউ অন্য মানে কিছু করতে পারিস। সে মানে অবশ্য আমার ব্যষ্টির সম্বন্ধে। অষ্টপাশ কে খোলে রে? ঠাকুরের কথা মনে কর না। ঠাকুর তো বলেছেন, 'গুরুকৃপায় অষ্টপাশ খুলে যায়।' গুরুই অষ্টপাশ মুক্ত করেন। জগতের অষ্টপাশ যে খোলে সে তা হলে কী হচ্ছে? জগৎগুরু।

ব্যাস ভাষ্য, শাণ্ডিল্য ভাষ্য, নারদ ভাষ্য, শঙ্কর ভাষ্য, রামানুজ ভাষ্য সব জায়গাতেই বলছে— ব্রম্ববিদ ব্রম্ব ইব চ। কিন্তু তা বলে সে সর্বশক্তিমান হতে পারে না। এদের এ কথায় আমি কী বলেছি মনে আছে? বলেছি— দেখ্ এদের সর্বশক্তিমানত্ব জগতের বাইরে কোথাও লুকিয়ে আছে। এদেরই

কথা challenge করে বলছি যে মানুষেরই সর্বশক্তিমানত্ব হতে পারে। আমার মনে যা উদয় হবে জগতে তাই ফুটবে। আজ কত কথাই মনে হচ্ছে। বসন্ত দেখেছিল— অনেক গেরো দেওয়া একটা দড়ি। আমি সেই দড়ির দু'দিকে দুটো হাত রেখে যাই টান দিয়েছি অমনি সব গেরো খুলে গেল। বসন্তকে বললুম, দেখ রে তোর অষ্টপাশ খুলে গেল।

আমি জাল ফেলেছিলুম, পৃথিবীব্যাপী জাল। ওই যে আছে— মাকড়সা তার নিজের ভেতর থেকে জাল বার করে— সেই জাল। সেই জাল গুড়িয়ে এসেছে নিজের ভেতর।

* কি স্বর্গের কল্পনা ওরা করেছে? মানুষের দেহে যে স্বর্গ রয়েছে তা আর কি বলবো।

* **Man becomes God. I have this tale to tell the world. Man is born to be God, that is the sole and fundamental aim of human life.** (মানুষ ভগবান হয়। জগতের মানুষকে এই কথাই আমার বলার আছে। মানুষ জন্মায় ভগবান হবার জন্য, এটিই মনুষ্যজীবনের একমাত্র ও মূল লক্ষ্য।)

একত্রিংশৎ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— সেপ্টেম্বর মাস, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ)

* **দেখ রে, আমি আজকাল স্বপ্নে ইংরিজি শিখছি**। দুপুর বেলা শুয়েছি, শুনছি, 'Calcutta bell cribbling'। এর আগেও কি যেন দেখেছি সব মনে নেই, তবে যেন Universality সম্বন্ধে কি দেখেছি বলে মনে হয়। যাক, cribbling কথার মানে কি বলতে পারিস? (শ্রীজীবনকৃষ্ণের নির্দেশে বাড়ীর ভিতর থেকে চেম্বার্সের অভিধান এনে শব্দের মানে দেখা হোল। Cribbling মানে ছাঁকনী দিয়ে পরিষ্কার করা, ময়লা ফেলে দেওয়া ইত্যাদি। Bell মানে ঘণ্টা, গির্জ্জার ঘণ্টাও বোঝায়) শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন ওরে, ওর মানে পেয়েছি রে! Bell মানে church bell, it represents church, মানে মন্দির— এই দেহমন্দির। ওই বইটা প্রকাশ হলে (Religion

& Realisation গ্রন্থের Foreward অংশটি) কলকাতার লোকের দেহমন্দির শুদ্ধ হবে এই কথাই যেন বলছে। আমাকে বলছে, তার মানে আমার থেকেই হবে আর mass scale-এ হবে।

* **ঠাকুর বলছেন, লজ্জাই নারীর ভূষণ**। Can you think how I looked upon this long long ago? আমি রোক্ করে বলেছিলাম— এখানে মেয়েদের আসা হবে না। ওরে বাবা ও যে আমার ঠাকুরের কথা, লজ্জা নারীর ভূষণ। তাই আমার এত রোক্। দুনিয়া টলে যায় যাক্, তবু আমার কথা টলবে না। তখন আমার এই রকমই রোক্ ছিল। আর ঠাকুরের ওপর ছিল আমার এই রকম ভাব। তারা (বন্ধুস্থানীয় জনৈক সঙ্গী) জানত এ কথা। তাকে বলেছিলুম, আমি ওদের Equality of Rights বার করে ছাড়ব। সেই Equality of Rights কি করে প্রতিষ্ঠা হোল দেখ্,— not as a woman, not as a mother, not as a daughter। অর্থাৎ, মেয়েছেলে হয়ে Equality of rights নয়, Equality of Rights হোল পুরুষের সঙ্গে এক হয়ে।

ঠাকুর বললেন, 'ওরা কি জানে না যে ওদের ভাতাররা ওখানে যায় আসে'— ওর ব্যাখ্যায় আমার মুখ দিয়ে বেরোল যে স্বামীর হোলে স্ত্রীর হবে, আর মেয়েরা ঘরে বসে আমায় দেখতে লাগল। ঠাকুরের কথা আমি কিভাবে নিতুম দেখ্ দিকিনি! তাই তো এক এক সময় ভাবি আমি বেশ ছিলুম আমার ঠাকুরকে নিয়ে। তোরা এসেই তো যত গোল বাধালি।

* আমাকে তোরা মাপ করিস রে, আমাকে তোরা ক্ষমা করিস। **ধর্মের নামে এতদিন খালি জোচ্চুরী চলে এসেছে। লোককে খালি ধোঁকা দিয়ে এসেছে রে,** ওই যে তোরা থিয়েটারে বৃষকেতুর অভিনয়ের কথা শুনলি (কথামৃত পাঠ প্রসঙ্গে), কি হোল? কর্ণ আর পদ্মাবতী স্টেজের ওপর জ্যান্ত বৃষকেতুকে কেটে দু'ফাঁক করে ফেললে। যারা করছে তারাও জানে এ সত্য নয়, আর যারা দেখতে যাচ্ছে তারাও জানে এ সত্য নয়। তবু তারা গাঁটের পয়সা খরচ করে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে

আনন্দ করতে চলেছে। এই হোল তোদের ধর্ম! দেখ্ না, এই দুর্গাপূজা।— হচ্ছে কি? খড়ের গাদাকে মাটি দিয়ে চাপড়া তৈরী করে করছে কী বল দেখি! যারা করছে তারা allow themselves to be cheated and they cheat others too। কী বললি? প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে পুজো করে? হ্যাঁ, তা বটে। দেখিস না, প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর মা দুগ্‌গা ধেই ধেই করে অসুর মারছে, গণেশ চক্র ঘোরাচ্ছে, কার্তিক ময়ুরের ওপর ধেই ধেই করে নাচছে, সরস্বতী বীণা বাজাতে বসে গেছে আর লক্ষ্মী ঠাকরুণের পাখনা গজিয়েছে? জানিস রে বাবা, পুজোয় আজকাল ইঁদুরেরও কাপড় চাই। এ সব কিরে? ধম্মো!

✻ আমি তো ঠাকুর ছাড়া আর কিছু জানি না। কিন্তু সেই ঠাকুরের বেলাতেও দেখ্! এদিকে বললেন, সন্ন্যাসী নারীর ছবি হেরবে না, অথচ মা ঠাকরুণকে দিয়ে পা টেপাচ্ছেন কী করে? বিবাহ বিভ্রাট নাটক দেখতে দেখতে ঝির কথা শুনে হাসছেন। বলি, ঝি তো মেয়েছেলে, পুরুষ তো নয়। তবে তিনি দেখছেন কী ক'রে? এদিকে বলছেন সন্ন্যাসী নারীর ছবি দেখবে না। তবে হ্যাঁ, individualism-এর দিকে থেকে ও খুব ভাল। Individual life কাটাবার পক্ষে খুব ভাল, যদি অবশ্য তার নিজের মধ্যে confined থাকে।

✻ এও এক বড় আশ্চর্যের কথা। বোধ হয় এই কান দিয়ে যা কিছু ঢুকেছে, যা কিছু শুনেছি সব আমার মনে আছে। আগে আগে এমনও হয়েছে রাস্তা দিয়ে লোক গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে, কথা কিছু বুঝিনি কিন্তু সুরটা কানে এসেছে। পরে আমি নিজেই গান লিখেছি সেই সুর নিয়ে। যা কিছু শুনেছি আমার জীবনে কিছুই যেন ভুলিনি।

✻ আজ (৫-৯-১৯৬০) দুপুরে বসে বসে ভাবছিলুম, **মোজেস Ten Commandments করলেন, বুদ্ধ আটটি শীল তৈরী করলেন**। কেন? মানুষ সেইগুলি পালন করবে বলে। কিন্তু মানুষ পালন করতে পারল কি? না, পারল না। ঠাকুরের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগও তাই; মানুষ

সে কথা নিতে পারে নি। কেননা, কোন imposition মানুষ পালন করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে তারা কি পড়ে থাকবে? না। আমি বলেছি যে দেখ, মনুষ্যজাতি এখন আমার ভেতরে। জাল গুড়িয়ে এখন আমার ভেতরে এসেছে, তাই আমার মধ্যে যদি কিছু ফোটে সেটা অপর সকলের মধ্যে আপনা থেকে ফুটবে। exertion করে কোন কিছু তো হচ্ছে না, আপনা থেকে হবে। সে হয়ত বুঝতেও পারবে না। তা নাই বুঝুক, effect হলেই হোল। Religion মানে কী? সকলকে এক করা। Effect-এ যদি সবাই এক হয়, একভাবে কাজ করে, তবে Religion কথাটারই বা কী দরকার। Universal religion এখনও জগতে ফোটেনি। এ জিনিস যদি ফোটে তবে এই হবে Universal religion.

✻ **ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ**। এই গামছা দিয়ে মুখ পুঁছলুম দেখলুম তোদের সবাইকে। কি হচ্ছে বলব?

—জগৎটা জ্যান্ত হয়ে আমার মধ্যে ফুটতে চাইছে।

✻ পাঠান্তে ঘরোয়া কথা প্রসঙ্গে অমরবাবু জানালেন যে বাবার হার্নিয়া অপারেশন হওয়ায় কোন এক ভক্ত আজ আসতে পারে নি। কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও জানালেন যে ভক্তটির বাবার বয়স ৭৫ বছর। এই নিয়ে মোট সাতবার তাঁর দেহে অপারেশন হয়েছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, তা হলে operation proof বল। **তবে একটা গল্প শোন**—

একটা marriage bureau। সেখানে একটা মেয়ে এসেছে নাম registry করবার জন্য। বিয়ে করতে চায়। যে registry করছিল তাকে details দিচ্ছে ঃ— my first husband died of cholera; my second husband died of apoplexy; my third husband died of heart failure; my fourth husband died of ..... তাকে বাধা দিয়ে যে registry করছিল সে বলে উঠল— Stop! stop! stop! I understand! You want a death-proof husband!

উপস্থিত সবাই হাসিতে ফেটে পড়লেন।

দ্বাত্রিংশৎ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— অক্টোবর, ১৯৬০)

* **মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কী?** ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলেছেন, ভগবান দর্শনই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আবার বলছেন, ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঈশ্বরলাভটি যে কী তা তিনি বলেননি। যাই হোক, ভগবান দর্শন আর ঈশ্বরলাভ এই দুটো কথাকেই তিনি এক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যাই তিনি বোঝাতে চেয়ে থাকুন না কেন, এ জিনিসটা তাঁর ব্যষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কেমন না?

আমরা ঠাকুরকে কোথায় ছাড়িয়ে যাচ্ছি? আমরা বলছি যে মানুষই ভগবান, মানুষই ঈশ্বরে পরিবর্তিত হয়। আর তার প্রমাণ দেয় জগৎ। কেননা— 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', আর, 'স একঃ'— এ হোল প্রথম অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা হোল জগৎ তার ভেতরে হওয়া চাই। এই আমি বলছি না যে আমি তোদের ভেতরে দেখছি! অর্থাৎ, আমি দেখছি যে জগৎ আমার ভেতরে। কিন্তু এতেও হোল না। তৃতীয় অবস্থা হোল যে, আমার আত্মিক চৈতন্যে যা উদয় হবে তা জগতের লোকের মধ্যে বর্তাবে। তবেই জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হবে। এ কথা লিখে রাখিস রে, লিখে রাখিস।

* **জগতের কল্যাণ করে কে?** ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরই জগতের কল্যাণ করেন। কিন্তু সে ঈশ্বর কে? আমরা বলছি কী? মানুষই ঈশ্বর। সে জগতের কল্যাণ কি ক'রে করে? এখানে যেমন ক'রে হয়েছে। তা না হলে, অন্ন দান ক'রে, কী বিদ্যা দান ক'রে তথাকথিত জ্ঞানভক্তি দান ক'রে কেউ জগতের কল্যাণ করতে পারে না। ''জগৎ কতটুকু গা?''

* **অধর সেন যখন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছে, 'বলিদান করা কি ভাল? ওতে তো জীবহিংসা হয়।'** ঠাকুর তখন উত্তর দিচ্ছেন, 'বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, শাস্ত্রে আছে, বলি দেওয়া যেতে পারে। বিধিবাদীয় বলিতে দোষ নাই। যেমন অষ্টমীতে একটি পাঁঠা।' আমায় জিজ্ঞাসা করলে আমি কী বলতুম জানিস? বলতুম, পাঁঠা খেতে ইচ্ছা হয়েছে, তা

খাওনা। এর মধ্যে আবার ধম্মো ঢুকুতে যাও কেন? কি হয়েছে জানিস? এরা tradition-এর পুজো করে। They worship tradition. But my dear friend, no worship is required— কোন পুজোরই দরকার নেই। আমার জীবনটা দেখ দিকিনি?

* **ঠাকুর বলেছেন, 'আমাকে সব ধর্ম এক একবার ক'রে নিতে হয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে।'** ঠাকুর সব মতের সাধন করেছেন। আর সব মতের লোক— হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পার্শী সব ধর্মের লোক আমায় দেখছে। এ দুটোতে তফাৎ কোথায় বলতে পারিস? একটা হোল start (সূচনা) আর একটা হোল finish (পরিসমাপ্তি)। ঠাকুরের বেলায় হোল start. আর এখানে হোল তার finish। ঠাকুরের সাধন হোল তাঁর ব্যষ্টিতে, আর এখানে finish কি হোল? আমিই সব হয়েছি। আমিই হিন্দু, আমিই মুসলমান, আমিই খ্রীষ্টান, আমিই পার্শী, আমিই সব।

* **দেখ, সাপ আর সাধু কখনও ঘর করে না।** সাধু যখন ইঁট গাঁথে তখন সে নিজেকে গাঁথে। সে বাইরে ইট গাঁথে না, গাঁথে তার সহস্রারে।

চলে আয় বরাহনগর মঠে। সুরেশ মিত্তির এসেছে— বলছে, ভাই, ঠাকুর বার বার স্বপ্ন দিচ্ছেন, একটা কিছু কর। সেখানে তখন এগারজন ছিল। এগারজনই উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলছে, সাপ আর সাধু ঘর করে না, সাপ আর সাধু ঘর করে না। Scene change কর। বেলুড় মঠ— তখনও নতুন মঠ হয়নি। বাড়ী ঘর সব তৈরী হচ্ছে। স্বামীজী তো লে আও রূপেয়া, লে আও রূপেয়া করছেন। স্বামীজী শুনলেন, পোস্ট অফিসে বাবুরাম মহারাজের পাঁচশো টাকা জমান আছে। তাই শুনে আর যায় কোথা! ডাক্ বাবুরামদাকে। বাবুরামদা তো ভয়ে ভয়ে সেই পাঁচশো টাকা পোস্ট অফিস থেকে তুলে দিলেন। আবার Scene change কর। বেলুড় মঠে তখন ভয়ানক মশা। মশারি ছাড়া শোবার কোন উপায় নেই। আগে আগে যেখানে গান-টান হোত সেখানে একজন পেরেক ঠুকছে মশারি খাটাবে বলে। স্বামীজী বসেছিলেন

নীচের বড় বেঞ্চিটায়। ঠক্ ঠক্ আওয়াজ কানে এল। জিজ্ঞাসা করে জানলেন, মশারী খাটান হবে বলে পেরেক পোঁতা হচ্ছে। স্বামীজী বললেন, ‘‘ওরে, ও পেরেক দেওয়ালে ঠুকছে না, ঠুকছে আমার বুকে, কত কষ্টে এই মঠ তৈরী, পেরেক যেন আমার গায়ে ফুটছে।’’ এবার ফিরে আয় দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে দেখছি টাকা ছুঁতে গেলে ঠাকুরের হাত বেঁকে যাচ্ছে, তিনি টাকা ছুঁতে পারছেন না।

ওরে, ওসব কিছু বুঝি না। আমি সাফ্ থাকব। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরলাভ মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি মঠ বুঝি না, মিশন বুঝি না, কামিনী বুঝি না, কাঞ্চন বুঝি না, আমি বুঝি ঈশ্বরলাভ। তাই দেখ্ কেমন টুক্‌টুক্ করে তোদের মধ্যে ফুটে উঠলুম।

* **একথা ধ্রুব সত্য বলে জেনে রাখ— জনক বলে কস্মিন্ কালে কেউ কখনও ছিল না।** তাই তো সেদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে ভাবলুম যে এরা জনকের সৃষ্টি করলে কেন? তখন নিজেই বুঝতে পারলুম যে এরা শুকের সৃষ্টি করে বুঝতে পেরেছিল যে শুকের জীবন কেউ follow (অনুসরণ) করতে পারবে না। তখন ওই এদিক ওদিক দুদিক রেখে জনকের সৃষ্টি হোল। ওই যে রে, ঠাকুর বলেছেন, জনক এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।

* **ঠাকুর যখন ষোড়শী পূজা করেন তখন তাঁর বয়স ছত্রিশ সাঁইত্রিশ, আর মা ঠাকরুনের বয়স আঠারো।**

তন্ত্রের সাধনের সময় ঠাকুরের ষোড়শী দর্শন হয়েছিল। ষোড়শী হচ্ছে দশমহাবিদ্যার একজন। ঠাকুর বলে গেছেন যে সকলের মধ্যে ষোড়শী হচ্ছে রূপসী। ঠাকুরের ষোড়শী মূর্তি দর্শন হয়েছিল, তবুও তিনি মা ঠাকরুনকে আবার ষোড়শী পূজা করলেন কেন? আর তখন মা ঠাকরুন তো ষোড়শী নন, তখন তাঁর বয়স আঠার। মা ঠাকরুন তখন অষ্টাদশী। এসব প্রশ্ন মানুষের মনে কখনও ওঠে না। মানুষ এসব জিনিস বিচার ক'রে দেখতে চায় না।

* আহা, কি জিনিসই বুঝেছিস বাবা, কি জিনিসই তোরা বুঝেছিস!

নিজের দেহের মধ্যে যে সব, বাইরে থেকে যে কিছু আসে না এ কথা বোঝা ভারী শক্ত। বেদে বলেছে **‘স্বশরীরাৎ সমুত্থায় .....।’** অমন স্বামীজী তিনিও সে কথার মানে ধরতে পারেননি!

* হাসছি কেন? একটা কথা মনে পড়ে গেল, তাই হাসছি। গরুর জন্যে খড় কিনতে যাচ্ছে একজন, তাকে ধরেছি— ‘মশাই, আমাকে কিছু বলবেন?’— ‘না তো।’ কিন্তু আপনার চোখ দুটো যেন কেমন দেখছি?’ তাকে ঘরে টেনে এনে বসিয়েছি। তারপর তার পরিণতি? গাছে চোখ পড়ল, দেখছে আমাকে, ল্যাম্পপোস্টে তাকাচ্ছে দেখছে আমাকে। মাটির দিকে তাকাচ্ছে, দেখছে আমাকে। শুধু কি এই? আরও কত অনুভূতি! আহা, কি মানুষই হয়ে গেছে আমাদের ধীরেনবাবু রে (কেদার দেউটি লেনের)!

ওই যে কথামৃত পড়া হচ্ছে— **ছেলে কোঁচড়ে রত্ন চেপে আছে, যে রত্ন চাইছে তাকে দিচ্ছে না, যে চায় না তাকেই হয়ত দিয়ে ফেলে।** একথা শুনেই আমার ধীরেনবাবুর কথা মনে পড়ে গেল, তাই হাসছি।

* যদি ভগবান কোনদিন বোঝান তবে বুঝতে পারবি যে এই শালা (নিজের দিকে দেখাইয়া) কি হাল লাঙ্গলই টেনে গেছে।

* Judge me as an ordinary man. Don’t Judge me in relation to any supernatural thing. **আমি একজন সাধারণ মানুষ হয়েই এ জগতে এসেছি। অথচ কি জিনিস সৃষ্টি হয়েছে বল দেখি!** একরকম বলতে হবে আমিই সৃষ্টি করেছি। কারণ, আমার এই রূপ নিয়েই তো যা কিছু সব হয়েছে। অথচ দেখ, ধর্ম বলতে একটা supernatural thing-ই মানুষ বুঝে এসেছে। ঠাকুরের হাত বেঁকছে, পা বেঁকছে, সে তো তাঁর ব্যষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই তো ওই নিয়ে লোকে ঠাকুরকে criticize করছে। কেউ বলছে— cataleptic fit. কেউ বলেছে— epileptic fit. কিন্তু দেখ, এখানে যদি কেউ anything against-এ বলে, it goes to prove that he is defecient, he is lacking in something; তার opposition-ই তার বিরুদ্ধে যাবে।

ধর্ম যে supernatural নয় তা প্রমাণ করেছিস তোরা, not I (আমি না)। কী মজার জাল ফেলেছে দেখেই গেলাম। কিছু ভেদ করতে পারলাম না।

* **ওরা যাকে ধর্ম বলছে তা তো ধর্ম নয় বাবা। ও হচ্ছে একটা কৃষ্টি, ঋষিরা ঠিকই বলেছে, ব্রহ্মবিদ্যা।** কিন্তু আমি তার চেয়েও ভাল কথা বলি। আমি বলি— Life power. Life power-এর গতি আর তার বিকাশ।

কী অদ্ভুত এই life power! এ যে কী ভয়ানক তা কী বলব। জীব-চৈতন্য ঈশ্বর-চৈতন্যে পরিবর্তিত হয়ে কী যে করে তা কী বলব! —

> 'সখী একথা কহন না যায়,
> হিয়ার মাঝারে বসতি করিয়া
> কখন কি যেন কয়।'
> সে কথা কাকে বলব?
> 'মরম কহিব কায় গো সজনী
> মরম কহিব কায়।'

আমি ভাষা পাচ্ছি না। ভাষা দিয়ে যা বলতে যাচ্ছি তা যেন কম হয়ে যাচ্ছে। Life power-এর তেজ—এ যে শুধু আমার তা নয়, তোদের সকলের— তোদের সকলের!

* ওই যে যৌগিক রূপের ইংরাজি হয়েছে ('Religion and Realisation') ও যে কী জিনিস হয়েছে তা কী বলব! ভাষার দিক থেকে ও ইংরাজি হয়েছে কি না তা জানি না, তবে ইংরাজিতে যোগ ছিল না, যোগ হয়েছে।

তোদের ব্রেণ পরিষ্কার হোক, আরও পরিষ্কার হোক। Religion and Realisation তো পড়লি, **ঈশ্বর কী বল দেখি?** ঈশ্বর হচ্ছে collected life power—collected life power as seen in the cerebrum in the seventh plane. ঈশ্বরকে কোথায় নিয়ে আসা হোল বল দেখি! ঠাকুর বলেছেন, 'মাইরি বলছি, ভগবানকে দেখেছি। এই হাতের পাখাখানা যেমন

দেখছিস তেমনই আমি ভগবানকে দেখেছি।' এই কথা বললে মানুষ ভগবান সম্বন্ধে কি বুঝবে? ভগবান কোথাও লুকিয়ে ছিল, ঝুপ ক'রে এসে পড়ল, আর ঠাকুর দেখে ফেললেন! না, সে তো বাইরে কোথাও নেই। সে যে মানুষেরই ভেতরে, তারই collected life power (সংকলিত প্রাণশক্তি)। এখন এতেও সন্দেহ থাকতে পারে। বিশ্বরূপ দর্শনের সময় সে দেখছে তার মধ্যে জগৎ। তার মধ্যে জগৎ— এ কথার মানে কী রে? অর্থাৎ সে-ই এইসব হয়েছে। আরও একটু— সে-ই এই জগৎ হয়েছে। তখন আর কোন প্রশ্ন ওঠে না। সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে collected life power যে God তার প্রমাণ কী? সচ্চিদানন্দগুরু দেখিয়ে দেন, বলে দেন। তাতেও কেউ বলতে পারে— we don't believe. Where is the proof that collected life power is God? প্রমাণ তোরা দিয়েছিস। তোদের collected life power হলুম আমি। তাই তোরা আমায় দেখছিস। কী চমৎকার বল দেখি! ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন কথা জগতে কেউ বলেনি রে। একথা মনে রাখিস রে, মনে রাখিস।

* **মানুষের মনে যা উদয় হবে জগতে একদিন না একদিন তা ফুটবে।** দেখ না, আমার মনে হোল যে এই রূপ (শ্রীজীবনকৃষ্ণের নিজের রূপ) দেখে মানুষ তো controlled (নিয়ন্ত্রিত) হবে না! আমার মনে যা উদয় হবে তা যদি মানুষের দেহে ফোটে তখন সে আপনা থেকে controlled হবে। তার অজ্ঞাতসারে সে পরিচালিত হবে। তখন তার সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হোল কি না, একত্ব লাভ হোল কি না, তা নিয়ে তাকে আর দৌড়-ঝাঁপ করতে হবে না। দেখ, এই জিনিসটা এখন যদি না ফোটে, পরে কোন না কোন এক সময়ে নিশ্চয়ই ফুটবে।

ত্রয়োত্রিংশৎ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— নভেম্বর, ১৯৬০)

* কাল (১/১১/৬০) রাত্রে একটা কথা ফুট কাটছিল, বলি শোন্। **আমি মুনি আর ঋষি দেখেছিলুম,** তোদের বলেছি মনে আছে?

মুনির পা দুটো দেখেছিলুম ছিনে, যেন অনেকদিন এক জায়গায় বসে পায়ের শক্তি কমে গেছে। কাল রাত্রে মনে হল, আরে সে ত ঠাকুরকেই দেখেছি! ঠাকুরের যে পায়ের শক্তি ছিল না একথা তোরা পেয়েছিস কি? হ্যাঁ, ওই যে ঠাকুর বলেছেন 'মা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু।' তা ঠাকুরের চলবার শক্তি মানে পায়ে ভর দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া, আমাদের কাছে চলার শক্তি মানে এক দেহ থেকে আর এক দেহে যাওয়া। এর অনেকদিন পরে দেখেছিলুম ঋষি—বিশাল বপু, মুখে পাখীর পালকের মত দাড়ি, বলছে 'চৈতন্য শীঘ্রই অবতার হয়ে আসছে।' দেখ্, সে কথা কেমন মিলেছে— আমার চৈতন্য কেমন জগতে অবতীর্ণ হয়েছে!

'আচ্ছা, তেরো বছর আট মাস বয়সে স্বামীজীকে দেখলুম কেন? ওই যে আমার অথরিটি (শ্রী ধীরেন রায়) বললে, রাজযোগ না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না—দেখ্, এসব আমার ভেতরেই তো হয়েছে, বাইরে থেকে তো কিছু আসে নি। দশাবতারের কথায় যেমন বলেছি যে এসব হচ্ছে মানুষের স্পিরিচ্যুয়াল ইভোলিউশন্-এর এক একটা স্টেজ, তেমনিই মুনি বা ঋষিও হচ্ছে আর একটা অবস্থার প্রকাশ। তা হলে ওই যে ঝাঁকে ঝাঁকে মুনি ঋষির কথা আমরা পাই ওরা তাহলে কী? পুরাণের সৃষ্টি নয় কি? ওঃ কী করেছে বল দেখি! ডিস্টর্ট (বিকৃত) ক'রে সত্য কী তাই মানুষকে জানতে দেয় নি।

* **ঠাকুর বলেছেন, চৈতন্যদেব ভক্তির অবতার**। আমি তোদের তো বলেছি যে দেখ্, ভক্তি হচ্ছে সেমিটিক্ কাল্ট। দি সেমিটিক্ কাল্ট রিচ্ড ইটস্ কালমিনেশন্ ইন শ্রীচৈতন্য। তারপর থেকেই জিনিসটা রিটার্ড করেছে। ঠাকুর হচ্ছেন জ্ঞানভক্তির অবতার। আর এখানে? জ্ঞানও জানিনা ভক্তিও জানিনা, আমি জানি সত্য এই আত্মিক একত্ব। তাই একে রিলিজিয়ন বলব না। এ রিলিজিয়ন্ কিনা তা জানি না। কিন্তু এ হচ্ছে সত্য—ম্যানিফেসটেসন্ অফ্ ট্রুথ ইন ম্যান। স্বামীজীও প্রথমে এই সত্যই চেয়েছিলেন, বলছেন, আমি চাই ট্রুথ। কিন্তু 'পড়িয়ে ভব সাগরে, ডুবে মা তনুর তরী।' 'মঠ করেগা'!

* **ঠাকুরের সঙ্গে এখানকার কী তফাৎ তোদের বুঝিয়ে দিই। ঠাকুর বলেছেন, 'বেশ খোল বাজত, তাক্ তাক্ তাধিনা, দাগ্ দাগ্ দাধিনা, তবে বেশ হত**।' খোল হল মাটির তৈরী, কীর্তনের সময় বাজে। আর আমরা খোল বলতে কী বুঝি? বুঝি— দেহ। আর বাজা মানে বুঝি আত্মিক স্ফুরণ। মহাবায়ু বল, কুণ্ডলিনী বল, যাই বল্ সে সুরে বাজে। খোল বাজা বলতে আমরা বুঝি দেহের কুণ্ডলিনীর জাগরণ। ঠাকুরের খোল হল মাটির জিনিস, প্রাণহীন পদার্থ। আর আমাদের কাছে খোল মানে দেহ— প্রাণময়। ওরা বলে শ্রীখোল, আমাদের হল এই শ্রীদেহ, যে দেহে মানুষ ভগবান হয়। কতটুকু তফাৎ হল বাবা?

এই জিনিসের অ্যাবস্ট্র্যাক্ট করেই ওই যৌগিক রূপ (ধর্ম ও অনুভূতি) লেখা। ঠাকুর কতগুলি স্থূল জিনিসের উপমা দিচ্ছেন। যেমন একটা উদাহরণ ধর—সূর্যের কিরণ মাটিতে পড়লে এক রকম, জলে পড়লে এক রকম আর আয়নায় পড়লে আর এক রকম। আমি এর কী ব্যাখ্যা দিলুম? বললুম, দেখ সূর্যের কিরণ হল চৈতন্য। যখন দেহব্যাপ্ত হয়ে আছে তখন এক রকম। জল হল কারণ শরীর, তখন একরকম। আর আয়না হল সহস্রার। যখন সহস্রারে যায় তখন আর একরকম। ঠাকুরের সঙ্গে এখানকার এই হল তফাৎ।

* **ঠাকুর মা ঠাকরুণকে তাঁর একটা ছবি দিয়েছিলেন**। মা ঠাকরুণ সেই ছবিটা পুজো করতেন। বেলুড় মঠে মায়ের মন্দিরে যে ছবিটা রাখা আছে, তোরা কেউ সে ছবিটা দেখেছিস? ওরে এখন ঠাকুরের যা ছবি দেখিস, ওতো অনেক ঘসা মাজার পর ওই ছবি দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেই ছবিটাতে দেখেছিলুম কী হার্ড স্ট্রাকচার ঠাকুরের। এইরকম হার্ড স্ট্রাকচার দেখা যায় ব্যাবিলোনিয়ান আর অ্যাসিরিয়ানদের ছবিতে। লণ্ডন মিউজিয়ামে বা অনেক বইতে ব্যাবিলোনিয়ান বা অ্যাসিরিয়ানদের ছবিতে যে হার্ড স্ট্রাকচার দেখা যায় সেই রকম স্ট্রাকচার দেখেছিলুম ঠাকুরের ওই ছবিটার মধ্যে। কী ক'রে এই রকম হল কে জানে। অ্যানথ্রোপলজিস্টরা হয়ত বলতে পারবে।

* **কাল রাত্রে (৬/১১/১৯৬০) চামুণ্ডা ও অদ্ভুত সব দর্শন হয়েছে**। রাত্রে শুয়েছি, কিছু(ণ পরে দৈববাণী হল, 'এ সব স্বভাবসিদ্ধ বস্তু।' ভাবলুম তাতো ঠিকই। আমার জীবনে কতই তো দেখলুম, এ আর নতুন কী। শুয়ে আছি। আর কিছু(ণ পরেই আবার একটা দুম করে— আওয়াজ হল, বেশ জব্বর আওয়াজ। ভাবলুম বুঝি বাইরে কোথাও শব্দ হল। চোখ চেয়ে দেখলুম। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলুম এ আওয়াজ বাইরে হয়নি, আমার ভেতরেই হয়েছে। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম— এত জোরে আওয়াজ মানুষের ভেতরে হয়! তারপর আমার হাঁটুর কাছে যেন কী একটা দেখলুম, যেন কুলুঙ্গির মধ্যে দেবী মূর্তি না কী যেন। আরও সব কী রয়েছে। তবে সবগুলোর রঙই যেন এক, সোনার রঙ, হিরন্ময় বর্ণ। জেগে শুয়ে আছি, কিছু(ণ পরে এক অদ্ভুত রূপ, একটা ফ্যানটাস্‌ম্যাগোরিয়াল রূপ, ইয়া তার মাথাটা(তার শরীরের অন্য অংশও রয়েছে তবে আমার দৃষ্টি তার মুখেই আবদ্ধ ছিল। মনে হল সেটা যেন মেয়েছেলের রূপ, কিন্তু তা চিন্ময় রূপ নয়, কী রকম যেন। তার বর্ণনা দিতে পারব না, কিন্তু রঙ বলতে পারি। জলে জ্যোৎস্না পড়লে যেমন হয়, সেই রকম রঙ। কিছু(ণ পরে সে দাঁতে দাঁত চেপে শু(করলে বিকট অট্টহাসি, অট্ট অট্ট হাসি। অনেক রকম অনুভূতিই তো হয়েছে, কিন্তু এরকম অট্টহাসি আর কখনও হয়নি। খুব ভয় পেয়ে গেলুম। ভাবলুম, আমার দেহ ফেঁড়ে দিয়ে কি বাইরে বেরিয়ে পড়বে নাকি!

বড্ড ভয় হয়েছিল। কী অট্ট অট্ট হাসি, অনেক(ণ ধরে, যেন হায়নার হাসি। প্রথম যখন দেহ থেকে মূর্তি বেরিয়েছিল, আর যখন ঋষি দেখেছিলুম, যে বলেছিল—'চৈতন্য শীঘ্রই অবতার হয়ে আসছে', সেই সময় মনের অবস্থা খানিকটা এই রকম হয়েছিল। তবে সে যেন এর চার ভাগের এক ভাগ। আমার ভেতরে কেন এ জিনিস দেখলুম কেউ বলতে পারিস? জেগেই সব দেখলুম। আমার আটষট্টি বছর বয়স, এখনও এই অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে! আর লোকে বলে, আমার সাধন হয়ে গেছে! এখন গুটিকতক জাঁদরেল শিষ্য আর 'ঘরে তালা দিয়ে শহরের রঙ দেখে বেড়ান।'

ওরে এসব তোদের ফিলজফির বাইরে। এসব হয়ে যাবার পরই মনকে সহস্রারে তুলে এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি— কী ক'রে হল, যদি কোন হদিস পাই। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলুম না। অট্ট অট্ট হাসি কখন বল্ দেখি? ধ্বংসের সময়, প্রলয়ের সময়। এটা বুঝতে পারছি, আদ্যাশক্তি(খুব (দ্ররূপ ধারণ করেছে।

[শ্রীজীবনকৃষ(বার বার তাঁর এই বিচিত্র অনুভূতির কথা ঘরের সকলের কাছে নিবেদন করতে থাকেন, কিন্তু কেন তাঁর এই অনুভূতি হল, বার বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও কেউ কিছু বলতে পারেন না। শ্রী ধীরেন রায় বললেন, চণ্ডীতে এই অট্টহাসির কথা উল্লেখ আছে। এটি চামুণ্ডার অট্টহাসি। পরে **শ্রীজীবনকৃষ্ণ এই অনুভূতিকে চামুণ্ডার অট্টহাসি বলে উল্লেখ করতে থাকেন**।]

* ওরে কী বলব্! সে অট্টহাসি যদি শুনতিস তবু বুঝতিস ব্যাপার কী। চামুণ্ডার অট্টহাসি আমার মাথাটা গরম ক'রে দিয়েছে। দেহটা যদি ফেটেই যায়, ব্রেন যদি সহ্য করতে নাই পারে, তাতেই বা আর করছি কী। ওরে চলতি কথায় যাকে ধর্ম বলে সে কী ভীষণ রে বাবা, কী কঠোর সত্য! এমন মর্মভেদী সত্য যে কী বলব, এসব থেকে এই বুঝতে পারছি যে দেহের মধ্যে এমন জিনিস আছে যার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। বাট ইট ইস্ অ্যাকটিভ্ ইন ইটস্ ওন্ ওয়ে, ইট ইস সো মাচ সো ওয়ানডারফুলি পিক্যুলিয়ার।

* আজ (১৮/১১/১৯৬০) একটা বিচার মনে উঠেছে। পুরাণের অবতার কী তা আমি দেখেছি। গীতার পার্থসারথি মূর্তি আমার দেহ থেকে বেরিয়েছিল। উপনিষদের ইউনিভারসাল সেলফ্ কী তা তোরা আমাকে বুঝিয়েছিস, আবার আমিও দেখেছি। আচ্ছা, চণ্ডীর কোনও কথা তোরা কখনও আমার কাছ থেকে শুনেছিস কি? না, কখনও শুনিস নি। কেবল একবার জন্মাষ্টমীর দিন, সে তখন আমি সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ি, বাড়ীতে চণ্ডী পড়েছিলুম। সে কথা গল্পের ছলেই কখনও কখনও বলেছি। কিন্তু চণ্ডীর কোন কথা কখনও ব্যাখ্যা করেছি বলে মনে পড়ে না। ওরে ওই চামুণ্ডা মূর্তি আমি কেন দেখলাম? **পুরাণের অবতার, গীতার পার্থসারথি,**

উপনিষদের ইউনিভারসাল সেলফ্, আর চণ্ডীর চামুণ্ডা মূর্তি আমার মধ্যে ফুটল কেন? তোরা কিছু বলতে পারিস?

✻ ঠাকুর বলেছেন, 'ঈ(্বর সা(াৎকার হ'লে তাঁর কাছে কি কতগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেনসারী চাইবে?' এই কথা দিয়ে **আমার চামুণ্ডা দর্শনের কোন ব্যাখ্যা করতে পারিস?** হাসপাতাল, ডিস্পেনসারী যারা করে তারা চায় কী? লোকের রোগ ভাল হোক, কেমন না? কিন্তু ভগবানকে পেলে সে কথা মনে ওঠে কি? আমি তোদের বলছি— জগৎকে আমি আমার মধ্যে পেয়েছি। এখন জগৎকে আমার মধ্যে পেয়েছি মানে তার ভালও আমার মধ্যে পেয়েছি, তার মন্দও আমার মধ্যে পেয়েছি। এখন চামুণ্ডার কথা মনে কর, সে করছে কী? অস্ত্রশস্ত্র সব খেয়ে ফেলছে, অসুরকুলকে নাশ ক'রে সে সুরকুলকে র(া করছে। চামুণ্ডারূপে অসৎ যা কিছু সব খেয়ে ফেলছে। It does not augur destruction but it is a messenger of peace. (এটা ধ্বংসের ভবিষ্যৎ সূচক নয় বরং শান্তির অগ্রদূত)।

সুর অসুর সমস্তই যে আমার মধ্যে সে কথা তো আমি ভাবিনি। আমি বাইরের জিনিস ধরে ব্যাখ্যা করতে চাইছিলুম, তাই কিছু বুঝতে পারিনি। আজ যেন এই দর্শনের একটা মানে খুঁজে পেলুম। তোরা বলছিস্—শান্তি প্রতিষ্ঠাই যদি উদ্দেশ্য তবে (দ্র)রূপ কেন? একটা শান্ত রূপ দেখলেই ত হত। না! তবে কখনও কখনও Dream goes by the contrary (স্বপ্নের অর্থ হয় বিপরীত দিক থেকে)। ঠাকুরের জীবন থেকে আমি এর প্রমাণ দেখাব। ঠাকুর স্বপ্ন দেখলেন, শেষ অবস্থায় পায়েস খেয়ে থাকতে হবে। কিন্তু অ্যাকচুয়্যালি খেলেন কী? সুজির পুলটিস, তাও চামচে ক'রে একটু একটু গলায় ঢেলে দেওয়া হত। তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে আর তিনি বলছেন, 'মা, এই কি তোর পায়েস খাওয়া?' চামুণ্ডাকে দেখাল বটে, কিন্তু সে করছে কী? অস্ত্রশস্ত্র খেয়ে ফেলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছে। চণ্ডীতে তিন রকম ক্যাপাসিটির কথা পেয়েছি— মাসকুলার ক্যাপাসিটি, ইনটেলেকচ্যুয়াল ক্যাপাসিটি আর ডিভাইন ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ দৈবী শক্তি(। এ হচ্ছে সেই দৈবী শক্তি(র কথা। এই ব্যাখ্যা তো এখন মনে ধরেছে। তোরা বলিস যদি অন্য কিছু ব্যাখ্যা মনে আসে।

✻ **আমাকে কতটুকু বুঝেছিস তোরা? তোদের মাথায় ঢোকে না কেন? প্রথমতঃ হচ্ছে সংস্কার।** মন সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। নতুন কোন জিনিস মাথায় ঢুকতে চায় না। কিন্তু এটা বুঝিস না কেন যে এর সঙ্গে পুরণো জিনিসের কোন সম্বন্ধ নেই। তারপর হচ্ছে স্মৃতিশক্তি(। কিছু মনে থাকে না। স্মৃতিশক্তি(বলতে আমি উইক ব্রেন পাওয়ার মিন করছি। দুর্বল মেধা শক্তি(। মানুষের শরীরে কত রকম উইকনেস্ই যে আছে। এই উইক ব্রেন পাওয়ার হেরিডিটি থেকেও হয়। কিন্তু তা বলে আমি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ বলছি না। ও সব নয়। ও অন্য জিনিস। তবুও দেখ্ কোন কিছুই ত মানছে না। দেহ ফুঁড়ে উঠছে। ঋষিদের যুগ বোধ হয় আবার ফিরে এসেছে।

চতুর্ত্রিংশৎ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ডিসেম্বর, ১৯৬০)

✻ **যোগ মানে কী রে?** লিঙ্গ গুহ্য নাভি হৃদয়, কণ্ঠ ভ্রূমধ্য সহস্রার— এর মানে যোগ নয়। নির্গুণের সঙ্গে যুক্ত(হয়ে থাকার নামই যোগ, যা এখানে হয়েছে। দধিমন্থন করলে যেমন মাখন ওঠে তেমনি যোগী নির্গুণকে মন্থন ক'রে দেখে আরও কী আছে, আরও কী আছে। এই দেহের আরও কী শক্তি(আছে।

✻ **এই দেহে যদি মৃত্যু থাকে তবে এই দেহে অমরত্বও আছে।** বাইরে থেকে তো কিছু আসছে না। মৃত্যুও যেমন আছে স্থিতিও তো তেমনি আছে। স্থিতির শক্তি(কে বাড়িয়ে মৃত্যুর শক্তি(কে জয় করা। মৃত্যু বললে অমরত্ব বোঝায় না? কেন বোঝাবে না? কনট্রাডিক্শন্ তো আছেই। তাই ঋষিরাও বলেছে— 'মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়।' কনট্রাডিক্শন্ যে আছে তোরাই বল না। এক তাহলে বহু হল কী ক'রে? আবার, বহু এক হল কী করে? প্রথমে তো অভয়কে দেখতে লাগলুম প্রায় চার মাস ধরে। তারপর আনন্দকে। আনন্দকে দেখতে দেখতে শু(হল অমরকে দেখা। তারপর একদিন একটা বাণী শুনলুম— 'একজন তোমার দেহে মিশে গেছে।' ভাবলুম অমর অর্থাৎ অমরত্ব দেহে মিশে গেছে। এর মানে কী বলতে পারিস?

ঠাকুর বলেছেন, 'কালের জন্য প্রস্তুত হও।' 'কাল' কথাটার সাধারণভাবে মানে হ'ল মৃত্যু। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা যাবে কী করে? এ কথার আর কোন অর্থ করতে পারিস? আর এক অর্থ— মৃত্যুকে জয় করার জন্য প্রস্তুত হও। মৃত্যুকে শাসন করার জন্য প্রস্তুত হও। হোয়াই সাবমিট্ টু ডেথ্? বি রেডি টু কন্কার ডেথ্। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও মানে মৃত্যুকে জয় করার জন্য প্রস্তুত হও— আমার মাথায় এ অর্থ কী করে এল বল দেখি? বত্রিশ বছর বয়সে 'বোধিসত্ত্ব' বলে যে বইটা লিখেছিলুম তাতেও ওই কথা লিখেছি— 'আমি মৃত্যুকে শাসন করব', 'আমি মৃত্যুকে জয় করব।' এ কথা আমার মাথায় কী করে এল বলত? কী করে মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারে? কী করে মানুষ মৃত্যুকে শাসন করতে পারে? মানুষ যদি ভগবান হয়। মানুষ ভগবান হয়ে তা করে। ওরে মানুষ যে ভগবান হয় তা এই প্রথম ফুটেছে— তাই এই মানে।

এমন সময় এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত গুহবাবু তাঁর একটি স্বপ্নের কথা নিবেদন করলেন। স্বপ্নটি দেখেছেন ১৫/১৬ই ডিসেম্বর। স্বপ্নে তিনি শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন। তাঁকে দেখতে এক সুদর্শন যুবা পুরুষের মত হয়েছে। উচ্চতায়ও তাঁকে আরও কিছুটা লম্বা দেখাচ্ছে। গুহবাবুর মনে হচ্ছে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহ অবিনশ্বর, তাই তিনি যৌবন ফিরে পেয়েছেন।

স্বপ্নের বিবরণ শুনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন— বড় অদ্ভুত তো! একে তো অ্যাকসিডেন্ট্ বলতে পারি না। একথা কত হাজারবার পড়া হয়েছে, আজই বা এ কথা ধরলুম কেন? অমরত্ব হবে কিনা তা জানি না। ও কথা বলা বড় শক্ত। তবে ও কথাটার এ মানেও হতে পারে তাই বললুম। ঋষিরাও তো বলেছে— 'মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়'। ঠাকুরও বলছেন— 'সেই সমুদ্রে পড়লে মানুষ অমর হয়।' সেই সমুদ্র কী— ব্রহ্ম সমুদ্র।

* **এ যাবৎ যা অবতার হয়ে এসেছে ওসব তো বিচারাত্মক অবতার**। অবতারের লক্ষণ কী? সুন্দর চেহারা? সে ত রাজারাজড়াদেরও হয়। হাসে কাঁদে নাচে গায়? সে তো যারা অভিনয় করে তারাও তো ওই সব দেখায়। অবতারকে যদি কিছু লক্ষণ দেখে চেনার উপায় থাকত তা হলেও না হয় হত। ভক্তরা অনুমান করে নিচ্ছে যে উনি এত বড়, অতএব উনি অবতার। দেখনা, ঠাকুরকেও তো জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে হচ্ছে, 'আমাকে তোমার কী বলে বোধ হয়।' চৈতন্যদেবও বলেছেন 'মুই সেই'। বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, চৈতন্য এমনকি ঠাকুর পর্যন্ত এক পর্যায়ে পড়ছেন।

রূপ ধারণ করে যে মানুষের দেহে অবতীর্ণ হয় সে-ই অবতার। এত যে সব অবতার সব এতে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। আমি বলেছিলুম তোদের মনে আছে যে আমার এই রূপ নিগম থেকে আসে। চৈতন্য যার রূপ ধারণ করে দেহেতে অবতীর্ণ হবে সে-ই অবতার। তা না হলে অবতার কথার কোন মূল্য নেই। ও বিচারাত্মক কথা।

* কী হয়েছে জানিস? ইমোশনাল রিলিজিয়ন্-এর (আবেগের ধর্মের) বদলে একটা র্যাশনাল রিলিজিয়ন্-এর (যুক্তিবাদী ধর্মের) সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য উপনিষদ্ এই র্যাশনাল রিলিজিয়ন্-এর কথাই বলেছে, কিন্তু জিনিসটা এখানে ফুল-ফ্লেজেড্ ফর্ম-এ (পূর্ণ মাত্রায়) ফুটে উঠেছে।

* **হ্যামিলটন্ সাহেব বলেছেন— "এ লারনেড্ ইগ্নোর্যান্স ইজ্ দি এণ্ড অব্ ফিলসফি অ্যাণ্ড বিগিনিং অব্ রিলিজিয়ন্— মানুষটা যখন পণ্ডিত-মূর্খ হয় তখনই দর্শনের শেষ ও ধর্মের শুরু।"** ই-য়া একটা বড় বই লিখে ফেললেন। না জানি কী কথাই লিখেছে, আর আমাদের দেশের লোকও তেমনি!— আহা, কী কথাই লিখেছে! হি ডাজ নট্ নো এ.বি.সি. অব্ দি থিঙ্ বাট্ মেকস্ এ প্যারেড অব্ হিজ্ ভ্যানিটি। দেহকে যিনি ধারণ করে আছেন তাঁকে জানাই হল ধর্ম। প্রাণশক্তিই দেহকে ধারণ করে আছে। তাই মানুষ মরে গেলে প্রাণশক্তির বিনাশ হয়, মানুষ পড়ে যায়। সেই প্রাণশক্তির বিকাশই হল ধর্ম। আমার জীবনে ধর্ম শুরু হল কবে? যখন তোরা বললি যে তোরা এক হয়েছিস। সেদিন থেকেই আমার ধর্মজীবনের শুরু। তা না হলে ব্যষ্টির সাধনের মূল্য কী? তোরা কী বুঝবি? কতই যে অনুভূতি হয়েছে! দুটো অদ্ভুত অনুভূতির কথা বলি— আমি সহস্রার ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেছি। দেখছি একটা ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা ফুল এমনি করে রয়েছে (আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন)। আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছি বটে কিন্তু ঠিক হচ্ছে না আর তারই ভেতর দিয়ে যেন

জ্বলন্ত জ্যোতি বেরোচ্ছে। গভীর ধ্যানে এই অনুভূতি হয়েছিল। আর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল এই রকম পঙ্গদে (বহু লোকের মাঝে) বসেই। দেখছি, আমার ত্বক থেকে অস্থিমজ্জা সব যেন জ্যোতিতে জ্বলে উঠল।

এই যে দুটো অদ্ভুত অনুভূতির কথা বললুম তোরা কী বুঝলি? আজ যদি ওদেশে গিয়ে বলি— ওহ্ সিস্টারস্ অ্যাণ্ড ব্রাদার্স অব্ অ্যামেরিকা! আই হ্যাভ মেড্ সাচ্ ওয়াণ্ডারফুল রিয়্যালাইজেশন্ ইন্ মাই লাইফ! তারা বলবে— ওয়েল গ্র্যাণ্ডপা, উই অ্যাকসেপ্ট ইওর কক্ অ্যাণ্ড বুল স্টোরি। অর্থাৎ তোমার এসব আষাঢ়ে গল্প। আর হ্যামিলটন্ সাহেব বললেন কিনা— এ লারনেড্ ইগনোর্যান্স ইজ্ দি এণ্ড অব্ ফিলজফি অ্যাণ্ড বিগিনিং অব্ রিলিজিয়ন্!

* হাওড়া কেদার দেউটি লেনে, শ্রীজীবনকৃষে(র ঘরখানিতে নিত্য অগণিত মানুষের যাওয়া আসা। বিকালের দিক থেকেই সাধারণতঃ ভিড় বাড়তে থাকে। ঘরে স্থান সংকুলান করার জন্য তিনি তাঁর শোবার খাটখানিতেই দুই সারি করে লোক বসার ব্যবস্থা করে দেন। প্রথম সারিতে তাঁর ডান দিকের জায়গাটি প্রেসিডেন্টের আসন। যিনি সেখানে বসেন তিনি সেদিনের প্রেসিডেন্ট। আজ একটি বালক এসেছে। শ্রীজীবনকৃষ(তাকে প্রেসিডেন্টের আসনে বসিয়ে বলতে লাগলেন—

'বলতে যাচ্ছিলুম— জেন্টল্‌মেন, ঘোষ সাহেবের বদলে, উই হ্যাভ গট্ এ নিউ প্রেসিডেন্ট টু-ডে! অ্যাড্রেস করার একটা প্রথা আছে জানিস তো? লেডিজ্ অ্যাণ্ড জেন্ট্‌লমেন বলে অ্যাড্রেস করতে হয়। আমাকে লেডিজ্ বলে সম্বোধন কখনও করতে হবে না। আমার জীবনে লেডিজ্-এর কোন সম্বন্ধ নেই। জগতে এমন কাউকে কি তোরা দেখেছিস? আমিই যে সব! লেডিজ্ বলে আলাদা করব কাকে?'

* **মেয়েরা এখানে আসতে পারে না। তা হোক, একদিন না একদিন তাদের মনে হবে যে আমার চেয়ে মঙ্গলাকাঙ্খী তাদের কেউ নেই।**

* **আজ একটা নতুন জিনিস দেখলুম** (২২/১২/১৯৬০)। চোখ বুজে বসে আছি। রাধুকে (শ্রী রাধাচরণ মিত্র) দেখলুম, আর রাধুর মধ্যে ভগবান দর্শন হল। এরকম তো কখনও হয়নি। দেখালে রাধু একরূপে সেই ভগবান।

পঞ্চত্রিংশৎ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— মার্চ থেকে জুন, ১৯৬১)

* **যীশু বলেছেন knock and the gate shall be opened unto you (ধাক্কা দাও তাহলে দরজা তোমার সামনে খুলে যাবে)। এ কথার মানে কী?** The gate is closed (দরজা বন্ধ), কেমন না? Oh, what a cruel God He is then! না, gate closed থাকবে কেন? খোলাই রয়েছে। কেন না, মনুষ্যজীবনের স্বাভাবিক গতিই হচ্ছে যে সে ভগবানে পরিবর্তিত হতে চাইছে। গোলাপের ডাল যেমন বেড়ে চলে গোলাপ হয়ে ফোটবার জন্য। গোলাপ হয়ে ফুটেই যেমন তার সার্থকতা, ভগবানে পরিবর্তিত হওয়াতেই তেমনি মনুষ্য জীবনের সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথের সেই গান রে—

আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুটবে যে ফুল ফুটবে,
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।

* **আজ একটা প্রশ্ন তুলব? ঠাকুরের বিয়ে হয়েছিল ভগবান দর্শনের আগে না পরে?** যেমন লেখা রয়েছে তাতে ধরতে হবে ভগবান দর্শনের পরেই ঠাকুরের বিয়ে হয়েছে। ঠাকুরের ভগবান দর্শন হয়েছে ২২/২৩ বছর বয়সে, আর তাঁর বিয়ে হয়েছে ২৪ বছর বয়সে। কথাটা ভয়ানক গোলমেলে ঠেকছে না? ভগবান দর্শনের পর তো বিয়ে করতে পারবে না। সংস্কারের জন্য বিয়ে করেছিলেন? না, তা তো হবে না। কোন রকম সংস্কার, ব্রেণে কোন রকম প্রেসার থাকলে তো ভগবান দর্শন হবে না। এ যে যোগের কথা। আমি যখন যোগের কথা বলি তখন যে দেহের প্রতিটি তন্তুকে নিয়ে টান দিই। মনে নেই আমার সেই ব্যাখ্যার কথা— If a single fibre of the body anyhow gets soiled there will be no thorough and complete emanation of the soul from the body।

* কাল রাত্রে (১৮/৩/১৯৬১) একটা দর্শন হয়েছে। শুয়েছি তো রাত একটার পর। তারপর শুনছি বাস চলার মত আওয়াজ, অনেক(ণ ধরে। ভাবলুম বুঝি বাইরে হচ্ছে, তারপর বুঝলুম—না, আমার ভেতরেই হচ্ছে।

তারপর **দেখলুম তুবড়ির ফুলকাটা**। ক-ত রকম ফুল কাটতে লাগল। তুবড়ির ফুলকাটার মানে বুঝিস তো। এই যে সকলকে ভেতরে দেখি, এ জিনিসটা বন্ধ হয়ে যাবে, আবার নতুন জিনিস হবে। তা না হলে যে একটা জিনিসেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

* **দু'তিন দিন আগে একটা দৈববাণী হ'ল— ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়**। তার রেশটা কেটে যাবার পরই মনে হল, দূর! আমি তো ওসব কিছুই নিই না। আমি জ্ঞানও নিই না, ভক্তি(ও নিই না। আমি বলি বিদ্যা। আর সে বিদ্যা কিসে হয়?— যোগে।

* **ধর্মকথা বড় একটা কারো সঙ্গে কইতুম না। তখন থাকতুম বেঙ্গল বোর্ডিংয়ে**। সন্ধ্যার সময় সামনের দরজা পিছনের দরজা খুলে রেখে, ঘর অন্ধকার ক'রে বিছানার ওপর বসে ধ্যান করতুম। তা এক মাসের মধ্যে এমন হল যে সন্ধ্যার সময় যারা বোর্ডিংয়ে থাকত, হ্যারিসন রোডের দিকের ওই লম্বা ফালিটায়, যত লোক থাকত সবাই ওই সময় ধ্যান করত। ঠাকুর চাকররা আমার বেশ নাম রেখেছিল। বলত— গোঁসাই ঠাকুর। তখন রাত্রে লুচি খেতুম। ওরা বেশ গরম গরম লুচি ভেজে দিত। তখন বেঙ্গল বোর্ডিং বেশ ভাল ছিল। একদিন ঠাকুর তো আমার খাবার দিয়ে গেছে। আমি তখনও খেতে বসিনি। যে চাকরটা আমার দেখাশুনা করত শুনতে পাচ্ছি তার গলা। সে ঠাকুরকে বলছে, আরে ঠাকুর, তুমি কী? গোঁসাই ঠাকুরের রাত্রের খাবার নষ্ট ক'রে দিলে? তাঁর খাবারে ডিম দিয়েছো? আমি পাতের দিকে চেয়ে দেখি কই এমন কিছু তো দেয় নি। তখন কী আর করি, ঠাকুরকে বললুম, আজ যা দিয়েছ দিয়েছ, এর পরে রাত্রে আর ডিম দিও না। রাত্রে ডিম খেতে নেই। আর একবার হয়েছিল ট্রেনে। বম্বিংয়ের সময়ে (১৯৪২-৪৩) দিন আঠারো ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছিলুম। এরা (মানিকবাবুরা) তখন গিয়েছিল উলুবেড়ে। আমি ওখান থেকে অফিসে যাতায়াত করতুম। দুটি ছেলের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। বেশ ছেলে দুটি। একদিন তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাচ্ছি, আন্দুলও পেরোয়নি, শুনতে পেলুম— এ ওর সঙ্গে ধর্মকথা কইছে, ও তার সঙ্গে ধর্ম কথা কইছে। আমি কথা বন্ধ করে অবাক হয়ে তাদের কথা শুনতে লাগলুম।

* **একদিন সুশীলবাবুকে বললুম, দেখুন সুশীলবাবু, আমার দয়া বলে কিছু নেই, এ বড় আশ্চর্য**। তার কিছুদিন পরেই অষ্টাবক্র((অষ্টাবক্র(সংহিতা) এল। দেখলুম তাতে আছে যে— এই ধীর, তার দয়া থাকে না। দয়া কাকে করব? দুই থাকলে তো দয়া! দয়া মানে অ্যাকশন। কিন্তু তার তো কোন অ্যাকশন থাকবে না। তার অ্যাক্শন থাকলে জগতের অ্যাক্শন তো থাকবে না। তার ইনঅ্যাকশনের জন্যই জগতের অ্যাক্শন হচ্ছে। তোরা যে আমায় দেখিস আমি কি কিছু জানি? ওই হল সেরা প্রমাণ।

* এত লোক তো দেখেছে, কিন্তু তাদের দেহেতে ফুটল (বর্তালো) না কেন? কত লোকই তো দেখেছে। কিন্তু সবাই স্তব্ধ কেন, নীরব কেন? তাই তো এক এক সময় মনে হয় যে বুঝি আমাকে বোঝাবার জন্যই এ সব হয়েছে। যার জন্যে এই বিরাট আয়োজন সে তাহলে কে?

* **সমাধি মানে কী রে?** সমাধি মানে সমাহিত হওয়া। যেমন, আমি তোদের মধ্যে সমাহিত হয়ে আছি। এর ইংরিজিটাও শুনে রাখ— I have got myself encased in you। এই হল সমাধি। না হলে ও মৃগী রোগের মানে কী। (মুহুর্মুহু সমাধি। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর) যার হচ্ছে তার প(খুবই সত্য, কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু জগতের কাছে এর মূল্য কী? আমার যখন হ'ল তখন যদি তোদের সকলের হ'ত তবে এর মূল্য।

* **শ্রী অনাথ সরকার একটি স্বপ্ন দেখেছেন**— শ্রীজীবনকৃষ(হাতে একটি দস্তানা পরেছেন, কব্জি পর্যন্ত ঢাকা। তিনি একটি পাকা কাঁঠাল ছাড়াচ্ছেন। আধখানা ছাড়ানো হয়েছে, আধখানা তখনও বাকী। কাঁঠালটি ভেঙ্গে এক একটি ক'রে কোয়া সকলকে খাওয়াচ্ছেন। তিনি সকলকে দিচ্ছেন, কিন্তু নিজে খাচ্ছেন না। স্বপ্নটির বিবরণ শুনে শ্রীজীবনকৃষ(বললেন—

'আহা, কী স্বপ্নই দেখেছে। এই স্বপ্ন নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে এখানকার তুলনা কর দেখি। ঠাকুর বলছেন, হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। কাঁঠাল ভাঙ্গার কথাই তিনি বলছেন, কাঁঠাল খাওয়াবার কথা তিনি বলেন

নি। কাঁঠাল মানে কী রে?— দেহ, পঞ্চকোষ। আমি তোদের কাঁঠাল খাওয়াচ্ছি, তোরা খাচ্ছিস। কাঁঠাল তাহলে কী বল? আমি রে আমি! জগদ্ব্যাপী আমার কোষ। তোরা যারাই আমাকে স্বপ্ন দেখেছিস তারাই আমার কোষ। আহা, কী স্বপ্ন রে।

* (ঘাটশিলা থেকে আগত শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়কে) আপনার চিঠিতে বেশ একটি কথা লিখেছেন (ছোট ভাই ধীরেন্দ্রনাথ রায়কে)। বড় ভাল লাগল। এদের সবাইকে পড়িয়েছি। ওই স্পিরিচ্যুয়াল কমিউনিজম্। হ্যাঁ, ওরা যে কমিউনিজম্ করে তা তো হয় না! সকলে এক পরিমাণ ভাত খাবে তা তো হয় না। কেউ বেশী খাবে, কেউ কম খাবে, এই জগতের নিয়ম। স্পার্টানরা, যারা কমন কিচেন করেছিল, তারাও পারেনি। স্পিরিচ্যুয়াল কমিউনিজম্ হয়, যা এখানে হয়েছে— ওয়ান অ্যাণ্ড ওয়াননেস।

* **দুঃখ কী জানেন? ভগবান কী তাই এযাবৎ কেউ জানত না। যদি জানত তাহলে মন্দির তৈরী হত না, মসজিদ তৈরী হত না, গীর্জা তৈরী হত না।** ঋষিরাই কেবল ধরেছিল, তারাই বুঝেছিল যে, মানুষ ভগবান হয়। তাই 'তত্ত্বমসি (্বেতকেতো' বলেই তারা (ান্ত হয় নি, তারা বললে, 'ত্বং জাতো ভবসি বি(্বতোমুখঃ।'

* **গতকাল (১৭/৬/১৯৬১) বাঙ্গালী সম্বন্ধে বেশ কথা হচ্ছিল।** জগতে ৩০০ কোটি লোক তো রয়েছে তার মধ্যে আর কারো হল না কেন? একজন বাঙ্গালীর শরীরেই এ জিনিস ফুটল কেন? খায় তো নোনা চিংড়ীর ঝোল। হ্যাঁরে বাবা, এই শ্রাবণ ভাদ্র মাসে নোনা চিংড়ী ওঠে, তার মাথাগুলো ভেঙ্গে খোলাসুদ্ধ জলে সিদ্ধ করে, ভাজে না রে। আর তার সঙ্গে একটু হলুদ, একটু লংকা বাটা আর খানিকটা তেল দিয়ে রান্না। খায় তো ঐ নোনা চিংড়ীর ঝোল। আর এই সময় ছোট ছোট ট্যাংরা ওঠে, তার ঝোল(এই তো খায় বাঙ্গালী। এই খেয়েই তো তারা এই কৃষ্টি বহন ক'রে এসেছে। কত বড় এই বাঙ্গালী বল দেখি! জগতের মানুষের মধ্যে রয়েছে বাঙ্গালীর ছাপ! মনে পড়ছে রবি ঠাকুরের কথা। বলছেন কিনা—

সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ কর নি।

বলছেন ওই ভোগের কথা। সেই 'ভোগের বিপুল আয়োজন, বিকট আস্ফালন' (ধর্ম ও অনুভূতি)— বলছেন সেই কথা। আর দেখ্ দেখি বাঙ্গালী আজ জগৎগু(! জগৎগু(কী ক'রে রে বল না—

মানুষ গু(মন্ত্র দেয় কানে
জগৎগু(মন্ত্র দেয় প্রাণে।

দেহ ফুঁড়ে না উঠলে কী হল? আজ বাঙ্গালীর রূপ সকলের দেহ ফুঁড়ে উঠেছে। বাঙ্গালী জগৎগু((শ্রীজীবনকৃষে(র হুঙ্কার)! স্বামীজীও ঐ কথা বলে গেছেন, বাঙ্গালী হবে জগৎগু(।

* **আজ (২৬/৬/১৯৬১) সেই দর্শনের কথা মনে হচ্ছিল, স্বপ্নে বাবুকে দর্শনের কথা।** বাবু যেন মৃতপ্রায়, গড়গড়া টানছে না, নলটা শুধু মুখে লাগানো আছে। আমি ভেতরে দেখছি বাবুকে। এ কোন অবস্থার কথা? হ্যাঁ, নির্গুণ। শুধু বোঝাবার জন্যে বাবুর রূপ, যে বাবু নিষ্(িয়। একটা রূপ না দেখালে তো বোঝা যাবে না, তাই নির্গুণের সাকার রূপ দেখা যায়।

আমি আল্লাকে দেখেছি এ কথা তোদের বলেছি। আচ্ছা কী আশ্চর্য! আমি আল্লাকে দেখলুম কী করে? আমি তো আর 'হো আল্লা হো আল্লা' ব'লে জপ করিনি, তবে দেখলুম কী করে? ভারি অদ্ভুত ঠেকে না? এ সব কী ক'রে হ'ল বল দেখি। আমি দূর থেকে দেখছি মহম্মদ আর আল্লা দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছে যেতেই মহম্মদ ছোট হয়ে গেল, (বামন হয়ে গেল) আল্লা যেমন ছিলেন তেমনই রইলেন— অ(য়, অব্যয়! মহম্মদের গলায় দেখেছিলুম একটা বড় লাল (বি।

যীশুকেও দেখেছিলুম। ঠাকুর দেখেছিলেন যীশুর গোটা মূর্তিটা তাঁর ভেতরে ঢুকে গেল। আমি দেখলুম যীশুর গলা পর্যন্ত মাথাটা আমার মাথার মধ্যে মিশে গেল। তাই মনে কেমন একটা খটকা লেগেছিল। যীশুকে অবতার বলতে কেমন বাধ বাধ ঠেকত। তারপর

একদিন কথামৃত পড়া হচ্ছে, এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন—ঋষি খৃষ্ট। আমি শুনেই বললুম, ওরে হয়েছে রে হয়েছে! এই তো ঠাকুর যীশুকে ঋষি বলে যাচ্ছেন! ঋষি— নারদ, শুক। এঁদের চেতন সমাধি। চৈতন্য কণ্ঠদেশ পর্যন্ত অবতরণ করেছিল নিগমে। তাই তো আমাকে দেখিয়েছে গলা পর্যন্ত যীশুর মাথা।

আর একটা দর্শনের কথা এখন মনে পড়ল। দেখছি একটা মস্ত বড় পুকুর, জলে ভরে আছে। এত জল যে পুকুরের একটা পাড় ফেটে গেছে, outer circle-এ আর একটা পুকুর করা আছে। এর মানে বলতে পারিস? পুকুর—সহস্রার। এত জল যে outer circle-এ আর একটা পুকুর করতে হয়েছে। অর্থাৎ, দেখাচ্ছে যে সারপ্‌-াস হয়েছে। কটা কথাই বা বলব। কী ক'রে এসব দেখলুম বল দেখি!

*** শিব পূজার কথা ঠাকুর কী বলছেন দেখ দেখি।** ''**মাতৃস্থান ও পিতৃস্থানের পূজা**। ভক্ত(এই বলে পুজো করে যে, যেন আর মাতৃস্থান পিতৃস্থানের মধ্যে দিয়ে, শোণিত শুক্রে(র মধ্য দিয়ে আসতে না হয়(পুনর্জন্ম না হয়।'' (কথামৃত)।

শিবপুজোর কী কুৎসিৎ কদর্য চিত্র! এর পরে রয়েছে আবার পূর্বজন্মের কথা, সেই চুরাশী ল(জন্মের কথা।

এবার আমাদের এখানকার শিবপুজোর মানে কর। শিব ঐক্যস্থাপনে। এই ঐক্য কী ক'রে হয়? একজন মানুষকে ভেতরে দেখে। আমাদের এখানে শিবপুজোর অর্থ কী? একত্ব লাভ করা, জগতের মনুষ্যজাতির সঙ্গে এক হওয়া। এইবার দুটো ছবি পাশাপাশি রেখে তুলনা কর দেখি। Aesthetic sense দিয়েই বিচার কর। দুটো ছবি পাশাপাশি রাখা চলে না। যদি কোন একজিবিশন হয়, এ দুটো ছবি পাশাপাশি রাখা যাবে না। আমরা এর কী অর্থ পেয়েছি বল্ দেখি? জগতে কেউ শিবপুজোর এই অর্থ করতে পারবে? যা ইচ্ছা করিস, এই শিবপুজোর কথা ভুলিস নি। যদি পারিস লিখে রাখিস।

ষড়ত্রিংশৎ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— জুলাই মাস, ১৯৬১)

*** সেই যে ব্রহ্মদত্যির খাঁচা দেখেছিলুম, তার আসল অর্থ তো এখনও বলা হয়নি**। দেখ, তারা এসেছিল ব্রহ্ম হতে, তা তো হ'ল না, হ'ল দত্যি। আর জগৎ জুড়ে কেন? ব্রহ্ম কেউ হয়নি রে। জগতে কেউ ব্রহ্মত্বলাভ করেনি, তাই জগৎ জুড়ে ব্রহ্মদত্যির খাঁচা।

*** আমি কিন্তু ডাকিনী দেখেছি**। একটা বড় বাড়ি। সেই বাড়িটার মধ্যে তিনটি মেয়েছেলের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। বাড়ির দরজাটা পাড়াগাঁয়ের বাড়ির দরজার মত। আমি গিয়ে দুমদুম করে দরজায় ঘা মারতে লাগলুম। সে ভেতরে থেকে দরজাটা খুলে দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল আর আমায় দেখতে লাগল। কী কমনীয় রূপ! অমন স্নিগ্ধ রূপ আমি আর দেখিনি। Tall figure, চোখ দুটি কী সুন্দর! বিশালা(ী!

ডাকিনী কথাটা কোথা থেকে এসেছে জানিস? দা(ায়ণী মানে কী রে? দ(ের মেয়ে? না রে। দা(ায়ণী মানে হল কা(ণ্যের মূর্তি। ওই যে— পাহি মাং যত্তে দ(িণং মুখং। সেই দা(িণ্যের মূর্তি হল দা(ায়ণী। কবে দেখেছি জানিস? এই সেদিন। যখন ঐ 'পা' দেখি তার দিনচারেক আগে। সপ্তধাতুর সাধন আছে জানতুম। ওই যে (ে-াকে আছে— 'ন বা সপ্তধাতুর্ণবা পঞ্চকোষাঃ'! যখনই এই্ কথা পড়েছিলুম তখনই মনে হয়েছিল যে সপ্তধাতুর সাধন আছে। পা দেখিয়ে সেই সপ্তধাতুর সাধন পূর্ণ হল। আমার সাধন কোথা থেকে শু(হয়েছিল বলেছি? প্রাণময় কোষে জল দেখে। অর্থাৎ, অপ্ থেকে তেজ, ম(ৎ, ব্যোম হয়েছে(কিন্তু (িতি তো নীচে, (িতিতে সাধন হয়নি। (িতিও তো একটা ধাতু। পা দেখিয়ে সেই (িতির সাধনের কথা বুঝিয়ে দিলে।

কী অদ্ভুত বল্ দেখি! ডাকিনী দেখলুম, দরজা খুলে দিলে, আমার ভেতরে যাবার পথ খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর তার ক'দিন পরেই দেখলুম আমারই পায়ের চেটো!

কেনই বা দেখলুম আর কী করে দেখলুম ওই মূর্তি বল দেখি!

একটা deep seated impression (গভীর ছাপ) হয়ে আছে। চেষ্টা করছি ভুলে যেতে, কিন্তু পারছি না। সেই চণ্ডীর চামুণ্ডা দেখে যেমন হয়েছিল, এবারেও ঠিক সেই রকমই হয়েছে। মাথার মধ্যে যেন হৈ হৈ করে উঠেছে।

দর্শনের কথা এখনও বেশ মনে রয়েছে। আমি যেন কুয়াশার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলুম। আমি দরজার কাছে আসার আগেই যেন ধাক্কা দিচ্ছি। ঠিক যেন আমি দিচ্ছি না, আমার হয়ে আর কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি ধাক্কা দিচ্ছি। আমি এমন কমনীয় স্নিগ্ধ রূপ আর দেখিনি। আগেও দেখেছি রঙ্গময়ী মায়া মূর্তি। সেও অতি সুন্দর রূপ। কিন্তু তার মধ্যে যেন একটা চাহিদা আছে। ভাষা দিয়ে তার রূপ বোঝাতে পেরেছি। কিন্তু এর বেলায় my language fails, রং মোটেই ফরসা নয়, ফিকে নীল। সাদাসিধে কাপড় পরে আছে, আধ ময়লা, কিন্তু সেই কাপড়ও যেন ফিকে নীল। 'সাজগোজ' নেই— নিরাভরণা। চোখ দু'টি বিশালাক্ষী— কী চোখ! নীচু হয়ে দরজা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ওই রূপ, অমন স্নিগ্ধ রূপ, ওকে বলে কিনা ডাকিনী! এ ডাকিনী নয়, ও হচ্ছে কমলা। ডাকিনী বুঝলুম কী করে! ওই যে Woodroff সাহেবের বইয়ের foot note-এ পেলুম— She is keeper of the door-তাই থেকে বুঝলুম। ওই তো আমাকে দরজা খুলে দিলে।

* **শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম নন-এরিয়্যান ব্রেনের কথা।** হঠাৎ মনে হল আরে এই তো দক্ষ রাজার শিবরহিত যজ্ঞ। শিব ঐক্য বন্ধনে। এই ঐক্যবন্ধন দক্ষ রাজা চাইছে না। কেন? তার নন-এরিয়্যান ব্রেন। তাই সে শিবরহিত যজ্ঞ করছে। যে শিবরহিত যজ্ঞ করে, অর্থাৎ একত্ব চায় না, তার ছাগমুণ্ড, অর্থাৎ তার নন-এরিয়্যান ব্রেন। দক্ষ রাজার ছাগমুণ্ড! বলিহারী যাই পুরাণকারের বুদ্ধিকে। কী চমৎকার depict করেছে।

* **আজ দুপুরেও (২৭-৭-১৯৬১) স্বপ্ন দেখেছি। Doll-এর মত একটা ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে** (ইঙ্গিত ক'রে তার উচ্চতা দেখালেন—

হাত দেড়েক)। আহা কী সুন্দর! ঠিক যেন পুতুলের মত। তার হাতে কী যেন একটা রয়েছে, আঙ্গুল দিয়ে ধরা। আমাকে যেন সেটা দিতে চায়। আমার কাছ বরাবর এসে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তার হাত থেকে নিলুম না কেন বল্ দেখি? আমার তো নেবার প্রয়োজন নেই। আমি ওই যে দেখলুম, ওই দেখাতেই তার দেবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। আমার দেখা মানেই গ্রহণ করা। এই স্বপ্নের কেউ মানে করতে পারিস?

* **আমার আপনা থেকে সব হয়েছিল কেন বল দেখি?** বলতে পারছিস না? আচ্ছা, একটা প্যারাবল্ দিয়ে বলি। মনে কর কারো আট লাখ টাকা আছে। সে কি আবার টাকা ধার করতে যাবে? এবার বল্। প্যারাবল্ দে। এসব জিনিস যার, তারই আপনা থেকে হয়। তাই আগে আগে একটা কথা বলতুম— 'যার, তার।' যার জিনিস তারই হয়, আর আপনা থেকে হয়। বুঝলি?

সপ্তত্রিংশৎ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাস, ১৯৬১)

* **দেখ্ মানুষ কখনও কাউকে ধর্ম দান করতে পারে নি।** এর আগে কেউ কাউকে ধর্ম দান করেনি। ঋষিরা বলছেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। এতে মানুষের কি হোল? মানুষকে কি ধর্ম দান করা হোল? এ একটা intellectual feat। ঠাকুরের 'শান্তি' করার কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু ওকেও তো ধরা যেতে পারে না। শান্তি তো স্থায়ী হয় না, ওতো টেকে না। গির্জায় গেল, সেখানে পাদ্রীদের বক্তৃতাদান। মসজিদে গেল, সেখানে কেউ কাউকে দিচ্ছে না, যে যার নিজের চরকায় তেল দাও। কালিঘাটে গেল, সেখানে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান, আর ওই যা বললি—বলিদান! তারা মানুষকে কী দিল? মানুষ পেল কী? তাই বলছি, এর আগে কেউ কখনও ধর্ম দান করেনি।

* (শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুহুর্মুহু সমাধি, পরে —) এমন কোন যোগৈশ্বর্য আছে যা দেহেতে ফোটে না? দ্বৈতবাদেই বলি, ভগবান যখন এই দেহটা

তৈরী করেছিলেন, তখন বলেছিলেন, তোদের জন্যে একটা মাপকাঠি দিলুম। শুধু তোদের জন্য নয়, জগতের মনুষ্যজাতির মাপকাঠি এই দেহটা (সমাধিস্থ)।

*** ঠাকুর বলছেন, 'বহু জন্ম পরে .....'। আমি কী বলি? আমি বলি, বহু জন্ম নয়, line of heredity**। এ জিনিসটা আমি এমনভাবে বুঝেছি যে তোদেরকে কি বলব। সূক্ষ্মশরীর কাকে বলে তা তোদের বলেছি। স্বপ্নে তোরা অনেকেই উড়েছিস। ওই ওড়াই তো সূক্ষ্ম শরীরের অনুভূতি। আর একরকম সূক্ষ্মশরীর আছে। সে কথা তোদের বলিনি। ধ্যানের সময় কখনও কখনও দেখতে পাওয়া যায়, আমার সামনের দিকে, কিংবা আমার পিছনের দিকে ঠিক আমারই মত আর একটা মূর্তি বসে ধ্যান করছে। সে মূর্তিটা লম্বায় বিগত-খানেক ছোট, আর সব দিক দিয়েই একটু করে ছোট। তাকেও সূক্ষ্ম শরীর বলে।

*** আমি তিনটি অদ্ভুত নারীমূর্তি দেখেছি**। হ্যাঁ, আরও দেখেছি, তবে সে সব আলাদা। একজনকে দেখেছি, তার দৃষ্টি ভূমিতে আনত এবং আবদ্ধ. এ হচ্ছে রহস্যময়ী মায়া মূর্তি। তারপর দেখেছি রঙ্গময়ী মায়ামূর্তি। এই চোখ ঘোরাচ্ছে, এই আঙুল মটকাচ্ছে, আর চারদিকে হুটোপাটি করে বেড়াচ্ছে। ঠাকুরের কথায়, তার চাউনিতে যেন জগৎ টলছে। আর এরপর, এই কিছুদিন আগে দেখলুম ডাকিনী মূর্তি। কি স্নিগ্ধ, শান্ত দৃষ্টি, চোখ দুটো ডানদিক থেকে বাঁদিকে কি সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে নিলে!

আচ্ছা, বলতে পারিস এই তিনজনের তিন রকম চাউনি কেন দেখলুম? ওরে, সে আমার অবস্থার কথা বুঝিয়েছে। প্রথমে দেখছি রহস্যময়ী, অর্থাৎ তখনও আমি কিছু জানি না। তারপরে রঙ্গময়ী মায়ামূর্তি, সব জেনেছি তাই ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্ছি। আর ডাকিনী মূর্তিতে দেখিয়েছে আমার এখনকার অবস্থা।

*** সকালে ঘুম ভাঙল এই কথা ভাবতে ভাবতে যে দ্বৈতবাদ তো থাকবে না, জগৎ থেকে দ্বৈতবাদ নাশ হয়ে যাবে**। তারপর কী হ'ল জানিস? একটা ছেলে বলাই দাঁর দোকানে (স্ট্রাণ্ড রোড ও মহাত্মা

গান্ধী রোডের সংযোগস্থলে সুপরিচিত স্টেশনারী দোকান) কাজ করত। বছর পাঁচ হোল নিজে দোকান করেছে। দোকান খুলতে যাবার সময় রোজ এখানে প্রণাম করে যায়। আজ সকালে (১৩-৮-১৯৬১) সে তার এক দর্শনের কথা বলে গেল। বলে, 'খই ছড়াচ্ছে', আর বলছে বেম্মোস্মি। বেম্মোস্মি মানে কি? আমি তো শুনে অবাক। বললুম, বল্‌তো সব স্বপ্নটা। মস্ত বড় স্বপ্ন। তার মধ্যে আম পেয়েছে, কলা পেয়েছে, বেটাছেলে কালীও দেখেছে। শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছে খই ছড়াতে ছড়াতে আর বলছে, বেম্মোস্মি। সে তো খালি জিজ্ঞাসা করছে বেম্মোস্মি মানে কী? এখন বল্ বেম্মোস্মি মানে কী?

কী আর্শ্চয বল দেখি! যাকে প্রত্যেকবার দাঁড়িপাল্লা তোলবার সময় ভাবতে হয় কতভাবে খদ্দেরকে ঠকাব, কতটা কম দেব, সেও দেখছে, 'ব্রহ্মাস্মি'!

*** (শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় স্বপ্ন দেখেছেন— শ্রীজীবনকৃষ্ণ চলেছেন। তাঁর বগলে রয়েছে সমুদ্রের সাতটি ঢেউ,** অর্থাৎ সপ্তসমুদ্র তাঁর কু(িগত। লৌহ ব্যবসায়ী কালীবাবুর স্ত্রীও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছেন। গতকাল ২০শে আগস্ট, কথাপ্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ(প্র্ন করেন যে ব্যাসের স্ত্রী অর্থাৎ শুকদেবের জননীর নাম কি ছিল। কিন্তু উপস্থিত কারও সে নাম জানা ছিল না। শ্রীযুক্ত(ধীরেন রায় আজ সকালে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ থেকে শুকদেবের মায়ের নাম খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেন। দৈবকৃপায় ভাগবতের একটি অংশের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শুকদেব পরী(িৎকে বিরাট পু(ষের বর্ণনা দিচ্ছেন সেই অংশটি। অন্যান্য বিবরণের মধ্যে আছে যে সপ্তসমুদ্র সেই বিরাট পু(ষের কু(িগত।) ..... সব কথা শুনে শ্রীজীবনকৃষ(বললেন—

কী অদ্ভুত বল দেখি! আমরা বুঝিনা, তাই একে দৈব বলে চালাতে চেষ্টা করি। আসলে কিন্তু তা নয়, নির্গুণ থেকে এর ত্রি(য়া হয়, ধীরেন নির্গুণে চলে গেছে। সেখান থেকে ত্রি(য়া হয়েছে। তাই অদ্ভুত উপায়ে ভোলার স্বপ্নের ব্যাখ্যা ভাগবত থেকে বেরোল। আজ আমি আরও বুঝলুম যে দৈব মানে কি!

*** ঠাকুর বলছেন, বার বছর ধৈর্য্যরেতা হলে মেধা নাড়ী জন্মায়, তাতে সে সব বুঝতে পারে, জানতে পারে।** কি জানতে পারে? দুলাল ঘোষ কত দরে দুধ কিনেছে জানতে পারে? কি করে দই বিক্রী করে তা তো আমরা জানি। আচ্ছা যাক, পিতার বীজানুর স্থান কোথায় জানিস? মাথায়! সেই বীজানু রেতঃর সঙ্গে মিশে বর্হিমুখী হয়ে হয় আত্মজ, কিন্তু সে আত্মজ পিতার রূপ পায় কি? পিতার বীজাণুতে যে আত্মজ সৃষ্টি হয় সে পিতার রূপ (হুবহু) পায় না কেন, তার একটা কারণ হোল সেটা অন্য একটা এজেন্সীর থ্রু দিয়ে জন্মায়।

আচ্ছা, এইবার ঊর্ধরেতার কথা ধর। সেই বীজাণু বহির্মুখী না হয়ে যদি অন্তর্মুখী হয় তা হলে তার রূপ পায় না? হ্যাঁ, রূপ পায়। তাই এত লোক আমার এই রূপ দেখছে। Energy! এই energy static না kinetic? Energy কখনও static হতে পারে না, এটা kinetic, kinetic in its own way। আর সেই energy সহস্রারে এই রূপ সৃষ্টি করছে। তফাতটা কোথায় হচ্ছে? পিতার বীজাণুর বেলায় যে আত্মজের জন্ম হচ্ছে সে পিতার রূপ পাচ্ছে না। কিন্তু ঊর্ধরেতার বেলায় সে তার রূপ পায়। এখন বুঝতে পারলি ঊর্ধরেতা কি বুঝতে পারে, কি জানতে পারে? এই যে জিনিষটা বুঝলুম তাই জানতে পারে।

*** সক্রেটিস বলেছিল know thyself। সক্রেটিস নিজেকে জেনেছিল কি?** যদি জানত তাহলে নিশ্চয়ই কিছু বলে যেত। তারপর তার disciple প্লেটো এই issue-টাকে take up করলে। সে অনেক ভেবে চিন্তে বললে, 'The great unkown and unknowable. এর পরে আমরা চলে আসছি শঙ্করে। শঙ্কর বললেন, চিদানন্দরূপ শিবোহম্! প্লেটো যেমন বললে negative দিয়ে, শঙ্করের কিন্তু negative নয়, তার positive। কিন্তু এই চিদানন্দরূপ কী তা সে বলতে পারছে না। এবার আমরা চলে আসছি একেবারে রবীন্দ্রনাথে। বেদ quote ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন, আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভবুদ্ধি সকলকে এক করে। বুদ্ধি বলতে এখানে মন বোঝাচ্ছে। শুভবুদ্ধি অর্থাৎ শুদ্ধ মন। ঠাকুর বলেছেন, শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা, শুদ্ধ আত্মাও তা। আর এই কথা কী তা তোরা ভালভাবে জানিস।

প্লেটো বললেন, The great unknown and unknowable. কেন? ব্যষ্টিতে The great অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা যায় না। এখন তোরা কী বলবি? হ্যাঁ, The great known and knowable ব্যষ্টিতে হয় না। তাই সমষ্টিতে তোরা বলছিস— The great known and knowable। ওদের সব কথা আজ উল্টে গেছে। তাই 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ' একথার বদলে তোরা বলছিস 'ঈশ্বরঃ সিদ্ধঃ সপ্রমাণম্'।

অষ্টত্রিংশৎ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— ফেব্রুয়ারী মাস ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ)

*** আজ ভোর রাত্রেও একটা অনুভূতি হয়েছে** (৯/২/১৯৬২)। কি হোল আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। দেখছি— (মুখের উপরের চোয়াল থেকে মাথার খুলি পর্যন্ত দেখিয়ে) আমার এখান থেকে এই পর্যন্ত যেন ফুলে উঠেছে, আর সব যেন খুলে খুলে যেতে লাগল। সে যে কী অনুভূতি তা তোদের কি করে বোঝাই! আমার ভিতরে তখন যেন হাসি এল, ভেতর থেকে যেন হাসি হচ্ছে। আমার খুব ভয় হোল। ভয়েতে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তোদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এখন যেন মনে হচ্ছে এর অর্থ Some power will act. Some latent capacity বোধ হয় ফুটবে!

*** মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ?** যখনই একথা শুনি মনে হয় বই থেকে পাতাটা ছিঁড়ে ফেলি। গুরুগিরি করার মতলব। আমি বড় তোমরা ছোট। তোমরা আমার সঙ্গ কর, অর্থাৎ সেবা কর। একটা বিষয়ে ঠাকুরকে হাজার হাজার বার সাধুবাদ দিই, কেন না তিনিই প্রথমে বলে গেছেন, মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। গুরুর শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন। মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ— এ-যে বেদের কত বিপরীত কথা তা বলতে পারছি না। ভাব দেখি ঋষি কি বলছে— তৎ ত্বম্ অসি, তুমিই সেই! পিতা উদ্দালক বলছে পুত্র শ্বেতকেতুকে। পিতা, পিতৃদেব! তিনি তো

তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর জ্যেষ্ঠত্ব অস্বীকার করেই বলছেন— তত্ত্বমসি। তুমিই সেই! কই, তিনি তো নিজেকে বড় বলছেন না, বলছেন- তুমিও যা, আমিও তা। আহা তত্ত্বমসি কথার কি ব্যাখ্যাই আজ হোল রে!

* **হ্যাঁরে, নীলকণ্ঠ মানে কীরে? শিব, কেমন না?** আর কিছু? আর কিছু মানে করতে পারিস তোরা? নীল কী কী জিনিস হয়? নীল হয় সমুদ্র, বিষ আর আকাশ। আর কণ্ঠ কোন ভূমি? পঞ্চম ভূমি। কণ্ঠে, অর্থাৎ পঞ্চম ভূমিতে মন উঠলে আকাশ দর্শন হয়, একথা জানিস তো? তা হলে নীলকণ্ঠ মানে কী হচ্ছে? যারই আকাশ দর্শন হয়েছে সেই নীলকণ্ঠ।

* **বিবাহের সংস্কার থাকে মাথায়।** হ্যাঁরে, দেখা যায়। একটা সরু ফাইবারের মত। স্বপ্নে সেই ফাইবারটাকেই দেখায় একটা খালের মত। আমি তখন এক বন্ধুর বাড়িতে যেতুম। একদিন স্বপ্নে দেখছি— আমি তাদের বাড়িতে গেছি। তার মা বাইরের দিকে বসে আছেন। আমি ক্রস ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছি। তার মা তখন তার বড়দার নাম ধরে ডেকে বলছেন—ওরে খোকা পালিয়ে যাচ্ছে ও বিয়ে করবে না, পালিয়ে যাচ্ছে। ওকে ধর। ওরা ধরতে আসছে। আমার সামনে একটা খাল। তার ওপর সাঁকো। আমি এক লাফে সেই খাল পার হয়ে ওপারে গিয়ে পড়লুম।

* তখন আমি ও বাড়িতে (হাওড়া, কালী ব্যানার্জী লেনে), **একদিন কেষ্টদাকে বললুম, দেখ কেষ্টদা, জয়রামবাটীতে আমি ঠাকুরের রঘুবীরকে দেখেছি, কিন্তু ঠাকুর যে শীতলার পূজা করতেন সে শীতলাকে তো দেখিনি।** একটু পরেই আবার সব মনে পড়ে গেল। বলে উঠলুম, না গো কেষ্টদা, শীতলাকে তো দেখেছি। আমার তখন ১০ বছর বয়স। একবার আমার প্যারাটাইফয়েড হয়েছিল। সেই সময় দেখেছিলুম সন্ধ্যের পর একটি মেয়েছেলে এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিত। একদিন নয়, দুদিন দেখেছি তাকে। একদিন আমার ডান দিকটায় আর একদিন আমার বাঁদিকটায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। আমি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তুমি কে গা? সে বলেছিল, আমি শীতলা।

আচ্ছা, এই শীতলাকে কেন দেখলুম বলতে পারিস? আজ (৭/২/১৯৬২) বিকালে হঠাৎ এর অর্থ বুঝতে পেরেছি; বুঝে হতভম্ব হয়ে গেছি। এ কীরে বাবা! অনুভূতি হয়েছে এগার বছর বয়সে আর এখন আমার উনসত্তর বছর চলছে। দীর্ঘ ৫৮ বছর পর একটা অনুভূতির অর্থ বোধ হোল আমার কাছে। ও শীতলা কে? বাইরে থেকে তো আসেনি। আমারই কারণশরীর সংস্কারজ মূর্তি ধারণ করে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। অর্থাৎ আমার দেহকে শীতল করে দিলে। আমার রিপুনিচয়ের তেজ খর্ব করে দেহকে শান্ত করে দিলে, আমার দেহ শীতল হোল, স্নিগ্ধ হোল। How inconceivable! কী queer! strange! কী spontaneous! কী wonderful! তাই তো নির্বাক হয়ে গেছি, হাঁ হয়ে আছি। ১১ বছর বয়সে শীতলাকে দেখলুম কি করে? এ করলো কে? শুয়ে শুয়ে তাই ভাবছিলুম—আচ্ছা, আরও কম বয়সে আমার আর কী দর্শন হয়েছে? হ্যাঁ,সব কথা বেশ মনে আছে। **প্রথম দর্শন হয়েছিল কালীমূর্তি।** সাড়ে তিন থেকে চার বছর বয়সে সেই যে ভূত দেখেছিলুম এ তার আগে। এ দেখেছিলুম আমতায়। মাতামহ তখন সাবরেজিস্ট্রার, আমতায় থাকেন। মাতামহ, আমি আর দিদিমা এক সঙ্গে শুতুম। একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেছে। দেখি, দিদিমা পাশে নেই। দিদিমা কোথায় গেল? খুঁজতে খুঁজতে দেখি দিদিমা খাটের নিচে বসে আছেন। খাটের পাশে একটি কালী ঠাকুরের পট থাকতো, সেই পটের কাছে বসে আছেন, সামনে পূজার যেন কিছু উপকরণ। আমি খাটের শেষ দিকটায় এসে বসেছি, মশারীটা পিঠে ঠেকেছে। আমি তখন খুঁত খুঁত করে কান্না শুরু করে দিয়েছি, উদ্দেশ্য কি জানিস তো? দিদিমার মাই খাব। আমার সামনের দিকটায় বাইরে যাবার দরজা। দরজার দিকটায় চোখ পড়তে দেখি—মা কালী! আমি তখন চিৎকার করে উঠেছি—ওগো দিদিমা, তোমার মা কালী আমায় খাঁড়া দিয়ে কাটতে আসছে গো! সঙ্গে সঙ্গে মাতামহের ঘুম ভেঙ্গে গেছে, দিদিমাও উঠে পড়েছেন। ওঁরা আমায় ধরে খাটে শুইয়ে দিলেন, এই হোল আমার প্রথম দর্শন। এরপর দিদিমা আর কালী পুজো করেন নি। হয়ত ভেবেছিলেন, কি জানি, আমার ছেলের যদি কোন ক্ষতি হয়।

দ্বিতীয় দর্শন সাড়ে তিন থেকে চার বছর বয়সে, সে আমতায় নয়,

তখন আমি খিদিরপুরে। এই সময় একদিন দুপুরবেলায় আমি সেই পরাবিদ্যা দেখেছিলুম। আমার **তৃতীয় দর্শন হয় এর অনেক পরে**। তখন আর খিদিরপুরে নয়, গড়পারে। এ অনুভূতি আমার জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল না স্বপ্নে দর্শন হয়েছিল তা আমি ঠিক করতে পারতুম না। এখন যেন মনে হয় এ অনুভূতি স্বপ্নেই হয়েছিল। কিন্তু এত deep সে অনুভূতি হয়েছিল যে আমার মনে হতো বুঝি সত্যি সত্যিই এই ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে। সবটা আমার মনে নেই, শুধু এইটুকু মনে আছে যে একটা গরু আমাকে তাড়া করেছে। সে শিঙ্ দিয়ে আমায় গুঁতিয়ে দিতে আমি একটা পুকুরে পড়ে গেছি। তারপর এক অজানা লোক এসে আমায় জল থেকে তুলেছিল, এইটুকু মনে আছে। আমার মনে হোত এ ঘটনা সত্যিই যেন আমার জীবনে ঘটেছে, কিন্তু কাউকে যে জিজ্ঞাসা করব যে, হ্যাঁগা, আমার জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে কি না— তা আর হয়নি।

চতুর্থ দর্শন হোল ওই শীতলা।

কী বলব বল্ দেখি! ১১ বছর বয়সে যে অনুভূতি হয়েছে তার অর্থ যদি পাই ৬৯ বছর বয়সে, তবে আর যে সব অনুভূতি হয়েছে! সারাজীবনে কতই তো অনুভূতি হয়েছে। আমি তো আমার বুদ্ধি দিয়েই ব্যাখ্যা করেছি, প্রকৃত অর্থ কী তা কে জানে!

ঊনচত্বারিংশৎ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— নভেম্বর, ১৯৬১ থেকে জানুয়ারী, ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দ)

* **আমি এই সব হয়েছি,—** আমি অন্য কিছু হয়েছি কিনা জানি না, তবে আমি এসব মানুষ হয়েছি। মানুষ মানে ব্রহ্ম, অর্থাৎ মানুষই ব্রহ্ম, আর সে কথার প্রমাণ দিচ্ছিস তোরা। 'তত্ত্বমসি' কথার একটা নতুন ব্যাখ্যা আজ শুনে রাখ. তোরা বলছিস তৎ ত্বম্ অসি। অর্থাৎ তোরা বলছিস যে 'আমিই সেই,' 'আমিই সব হয়েছি' 'তত্ত্বমসি'।

* আজ একটা স্মরণীয় দিন (৮/১/১৯৬২)। **সেই যে সপ্তাহ খানেক আগে দক্ষিনা বলে একটা লোককে দেখেছিলুম, আজ তার মানে বুঝতে**

পারলুম। সেদিন বেলা তখন দেড়টা। ওরা আসতে কথামৃতখানা ওদের হাতে দিলুম। ভাবলুম, আজ আর ধ্যান করব না। কিন্তু রোজকার অভ্যাস কি ছাড়ে? ধ্যান করতে বসলুম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধ্যানে ডুবে গেলুম। গভীর ধ্যানে দেখলুম একটা লোককে, তার নাম দক্ষিণা। ৪২ বছর আগে তাকে দেখেছিলুম। আমার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই ছিল না। শুধু জানতুম তার নাম দক্ষিণা, এই পর্যন্ত। নীল রংয়ের কাপড় গায়ে, দক্ষিণাকে দেখতে দেখতেই ধ্যান ভাঙ্গল। তারপর আর থাকতে পারলুম না, সকলকে বলেই ফেললুম, দেখ্, ৪২ বছর আগে দেখেছিলুম দক্ষিণাকে, আজ হঠাৎ আবার তাকে দেখলুম কেন বল দেখি? সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাও জানি না। এই দক্ষিণাকে দেখার অর্থ কি! তবে কি আমার দক্ষিণার ব্যবস্থা হোল! এবার কি যেতে হবে!

তোরা তো বুঝতে পারিস না, ক'দিন ধরে মাথার মধ্যে যে কি হয়ে আছে কি বলব। কেন দেখলুম ওই দক্ষিনাকে? আজ সন্ধ্যার পর ভাবছিলুম, আচ্ছা এই দক্ষিণা মানে কি জগৎগুরু? মনে মনে এই চিন্তা করছি— দক্ষিণা মানে কি জগৎগুরু, আর মাথার মধ্যে দেখছি গোপালকে (হারুদার ছোট ভাই)। এরকম কখনও হয়নি, এই প্রথম হোল। মনে এক রকম চিন্তা আর মাথায় ফুটল এক মূর্তি। ঘরে বললুম সে কথা। ক্ষিতীশ বললে, 'গো' মানে পৃথিবী, 'গোপাল' মানে যিনি পৃথিবীকে পালন করেন। অমনি পরিষ্কার ভাবে মানে বুঝতে পারলুম, আমার স্বরূপ হচ্ছে দাক্ষিণ্য। দাক্ষিণ্যের দ্বারাই পৃথিবীর লোককে পালন করা হচ্ছে। কী সুন্দর মানে পাওয়া গেল দেখ দেখি! আমি ছট্‌ফট্ করছিলুম মানে বোঝার জন্যে, জ্ঞাননেত্রে গোপালকে দেখিয়ে কি পরিষ্কার ভাবে মানে বুঝিয়ে দিল। আচ্ছা, পালন মানে শাসন করা, control করাও তো বোঝায়? (কিছুক্ষণ পরে) সব বুঝতে পেরেছি রে, সব বুঝেছি। নেঃ পড়্, কথামৃত পড়্।

এখন খুলেই বলি। এখানে যা হয়েছে — I am the doer, I am the author, I am the master। নে, আমাকে এখন হটা, হটা কেউ, challenge কর। যদি কেউ chllenge করতে আসে তাকে সাফ জিজ্ঞাসা করব, why did it not start with you ?

✻ **অনেকদিন পরে কাল একটা স্বপ্ন দেখেছি** (২১/১/১৯৬২)। আমি বসে আছি, আমার দু'পাশে দুটো গ্লাস। ঐ ওখানে তাকে যে জলখাবার গ্লাস আছে, তার চেয়ে সাইজে একটু বড়। দুটো গ্লাসই খালি। তোরা কিছু মানে করতে পারিস?

✻ **কাল (২২/১/১৯৬২) দুটো দৈববাণী করেছে**। এক, 'দরজা খুলে দে,' আর দুই, 'যত পারিস খেয়ে নে'। এর আবার কি মানে কে জানে!

✻ **তোরা তো সব অনেক উপনিষদ্ পড়েছিস। বল দেখি 'ধর্ম' মানে কী?** উপনিষদ্ ধর্ম বলতে কি বলেছে? (সকলে চুপ করে আছেন) কিছু নেই রে, কিছু নেই। 'মানুষের ধর্মে' রবীন্দ্রনাথ বেশ লিখেছেন যে, মানুষ হয় সর্বজনীন, সর্বকালীন। এই তার ধর্ম। সর্বজনীন কথাটার মানে কী বলত? 'জনীন' কথাটা আসছে 'জনয়তি' ধাতু থেকে। অর্থাৎ সর্বজনের মধ্যে যিনি নিজেকে সৃষ্টি করেন তিনিই হলেন সর্বজনীন। আর সর্বকালীন? ওই যে ঠাকুরদা দেখে, বাপ দেখে, নাতিও দেখে। ওই হল সর্বকালীন।

আমাদের দেশে ধর্ম দাঁড়িয়েছে কোথায়? না, ভক্ত প্রার্থনা করছে, হে ভগবান, ঘড়া ঘড়া মোহর ঢেলে দাও, এই তো? ওরে ওসব কিছু নয় রে, ওসব কিছু নয়। ধর্ম হচ্ছে প্রাণশক্তি, জীবনীশক্তির ঐশ্বর্য, আর এই ঐশ্বর্য সকলেই স্বীকার করছে। এখানে পরাবিদ্যা, উপনিষদ সব উড়িয়ে দেওয়া হোল। এ বোঝা ভারী শক্ত। হ্যাঁ রে, প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তির ঐশ্বর্য। এর পর আর কি কথা বলব!

✻ [কথামৃত পড়া শেষ হয়েছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ খাট থেকে নামছেন, মেঝেতে বসবেন, কাপড় খুলে গেছে, কাপড় বাঁধতে বাঁধতে বললেন—]

আর একটু হলেই পরমহংস! হ্যাঁরে **ছেলেবেলায় যেমন ছিলুম এখনও তাই। কাপড় আর সামলাতে পারি না**। তখন কতই বা বয়েস। এই এতটুকু! (হাতের ঈঙ্গিত করে উচ্চতায় দু'হাত মত দেখালেন)। তখন পড়তুম খিদিরপুর একাডেমীতে। কাপড় পরে যেতে হত। কাপড়ের খুঁটে বাঁধা থাকত একটা পয়সা। কোন কোন দিন কাপড় খুলে যেত।

আমি তো আর বাঁধতে পারতুম না। একটা ছেলেকে বলতুম, সে কাপড়টা পরিয়ে দিত আর তাকে আমি ওই পয়সাটা দিয়ে দিতুম। যেদিন কাপড় খুলত না সেদিন ওই পয়সাটা দিয়ে এক পয়সার লুচি কিনে খেতুম। হ্যাঁরে, তখন এক পয়সার চাকের মত বড় বড় লুচি পাওয়া যেত, তাকে বলত টানা লুচি। আর তার সঙ্গে দিত হয় ভাজি, নয় ডাল আর নয় একটু হালুয়া। তাই কিনে খেতুম, ব্যস্।

✻ **আজ (২৬/১/১৯৬২) ভোরে একটা স্বপ্ন দেখেছি,** তোরা মানে কর দেখি!— সেটা যেন একটা অফিস। আমি অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে রয়েছেন অনিলবাবু বলে এক ভদ্রলোক। জায়গাটা যেন covered। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলুম একটা খাবারের দোকান। শো-কেসে খাবার সাজান রয়েছে। কিন্তু বড় নোংরা। আমার খেতে ইচ্ছা হোল না। তারপরেই আর একটা দোকান। সেটা কিন্তু ওর চেয়ে অনেক ভাল করে সাজান। এখানেও শো কেসে খাবার সাজান রয়েছে। আমার যেন মনে হচ্ছে ওগুলো ক্ষীরের খাবার, লাল অয়েল পেপারে মোড়া, লম্বা লম্বা, এই চম্‌চম্ টাইপের। দোকানদার আমায় দেখে বলছে, ও খাবার আপনার উপযুক্ত নয়, ও ক্ষীর ভাল নয়। আমি তখন দোকান ছেড়ে আরও এগিয়ে যেতে লাগলুম। সেই অনিলবাবু বলে ভদ্রলোকটি তখন আর আমার সঙ্গে নেই। একটু এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে দেখলুম একটি নারী বসে আছে, placid, complacent স্নিগ্ধা, সৌম্যা, পরনে শাড়ী নয় একটা ধুতি। শীর্ণাও বলা যায় না, আবার মোটাও নয়, বেশ মূর্তিটি কিন্তু। গায়ের রঙ তোর মত (একজনকে দেখিয়ে)। আমি আরও এগিয়ে যাচ্ছি, একটু দূরে বসে আছে আর একটি নারী। বয়েস আগের মেয়েটির চেয়ে কিছু বেশী। কুৎসিৎ, কদাকার, মুখে ক্ষত, dimples। সে কাঁদছে আর আমায় জিজ্ঞাসা করছে, আমার কিসে শান্তি হবে, **আমার কিসে শান্তি হবে? আমি তাকে বললুম, ভগবান ভগবান কর, শান্তি হবে**। ভগবান ভগবান বলতে বলতে আমার ঘুম ভাঙল।

এই কুৎসিৎ কদাকার মূর্তিটি কে বলত? ওই মেয়েটি হচ্ছে জগৎ। আর আমি বলছি, ভগবান ভগবান কর, তার মানে কি রে? অর্থাৎ

ভগবানই বলছে। তাইতেই তাদের হয়ে গেল। তাদের আর কিছু করতে হবে না, আমার বলাতেই হয়ে যাবে। সেই যে বলেছিলুম, আমার মধ্যে যা ফুটবে তাই জগতে হবে; কিভাবে হচ্ছে তা তো বুঝিনি। এতদিনে বোঝালে। জগতকে দেখাল একটা ছোট নারীমূর্তি রূপে। সে আমার শরণাগতা, অর্থাৎ আজ্ঞাধীনা, আমি বললেই হবে! এত লোককে যে দেখছিলুম, এতদিন ধরে বুঝতে পারিনি যে এটা কী হচ্ছে। শেষকালে সেই জগৎকে দেখাল একটা নারীমূর্তি ধরে!

শিল্পী, শিল্পী! কে এই অদ্ভুত শিল্পী বল দেখি? কী অদ্ভুত তার রচনা! অবাক হয়ে যেতে হবে এসব কথা ভাবলে। তোদের পুরাণে আছে না, এই পৃথিবী গোমূর্তি ধারণ ক'রে ব্রহ্মা না বিষ্ণুর কাছে গিয়েছিল বলতে যে পৃথিবীর ভার আর বহন করতে পারছি না? সেই শাশ্বত অশান্তি চলে এসেছে এতদিন। এর practical effect কী তা তো বলতে পারছি না।

এ হোল শারীরবিদ্যা। জন্মাবার পূর্বে আমি ছিলাম কোথায়? পিতার দেহে; তারপর এলাম মাতৃগর্ভে। পৃথিবীতে এলাম, সেই হোল নিত্য থেকে লীলায় আসা। তারপর দেহ বেড়ে চলল আর এই জিনিসটাও এগুতে লাগল। সচ্চিদানন্দগুরু উদয় হলেন দেহে, তারপর ধাপে ধাপে হতে লাগল আগম নিগম। হোল জগৎব্যাপী। আবার সেই জগৎ গুটিয়ে এল আমার ভিতরে। আবার তাকে এনে দিলে বাইরে, দেখালে একটা নারীমূর্তি রূপে।

কী অদ্ভুত এই মনুষ্য দেহ বল দেখি। 'বরুণ রাজার ভাণ্ডারে কত রত্ন লুকিয়ে আছে, বরুণ রাজার খবর নেই।' আহা কী অদ্ভুত ব্যাখ্যাই হোল রে!

* **গত কালের অনুভূতির মধ্যে আমার ভেতরের একটা রূপ দেখাবার চেষ্টা করছে।** সেই যে কাল কুৎসিত মেয়েটিকে বলছি— ভগবান ভগবান কর। সে আমি বলছি বটে, আমার form টা দেখে বুঝছি, কিন্তু ভেতরে যেন আর কেউ, সে যেন এই রক্ত মাংসে গড়া নয়, আর কেউ বলছে, ভগবান ভগবান কর শান্তি পাবে। সেই যে

স্বপ্নে (ডাকিনী বা কমলা মূর্তি দর্শনের সময়ে) আমি দরজায় পৌঁছবার আগে থেকেই ধাক্কা দিচ্ছি, সেখানেও সেই একই জিনিস, ধাক্কা আমি দিচ্ছি না, কেননা আমি তখনও দরজা থেকে দূরে, আমার ভেতরের কোন বিরাট পুরুষ আগে থেকেই ধাক্কা দিচ্ছে। গত কয়েকটা স্বপ্নে আমাকে যেন এই জিনিসটা বোঝাতে চেষ্টা করছে— ভেতরে যেন আর কিছু রয়েছে, সেই যেন আমার হয়ে কাজ করছে।

চত্বারিংশৎ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— এপ্রিল ও মে, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ)

* **সাধন জগতে প্রতীকের ব্যবহার করে মানুষের প্রাণশক্তির স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে দিয়েছে আমাদের দেশের আচার্যরা।** পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে সাধন হচ্ছে। ওরা করছে কী? অহঙ্কারের হিমালয় গড়ে তুলে বলছে, ওগো দেখো, আমি তোমাদের চেয়ে কত বড়! পঞ্চমুণ্ডীর আসনের আসল অর্থ কী বল্ দেখি? মুণ্ডি হচ্ছে মাথা — সহস্রার। পাঁচজনের সহস্রারে যার আসন, অর্থাৎ যে জগৎব্যাপী তারই হোল পঞ্চমুণ্ডীর আসন। চৌধুরীকে (দেবকুমার) দেখিয়েছিল—তিনজন হলে ব্যষ্টি, পাঁচজন হলে সমষ্টি— জগৎব্যাপী। ওঃ কী বুদ্ধি! মানুষ আপনা থেকে হয় জগৎব্যাপী। তাকে ওরা টেনে নিয়ে করল পঞ্চমুণ্ডীর আসন! ওদের সব জিনিসটাই এই রকম। পঞ্চবটীও তাই, মূলাধারে আছে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চিত্রা বজ্রাণী—এই পাঁচটা নাড়ী। একে বাইরে পাঁচটা গাছ পুঁতে করলে পঞ্চবটী। দেহে আছে সপ্তভূমি, তাকে করলে মন্দিরে ওঠার সাতটা সিঁড়ি।

* কয়েকদিন আগে চিত্ত একটা স্বপ্নে দেখেছিল **আমার সমস্ত দেহটায় চোখ।** তখন এর মানে কিছু বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলুম— ওই যে দেখিয়েছে আমার সমস্ত দেহটা মৌচাক হয়ে গেছে, এও বুঝি সেই রকম আর একটা কিছু দেখিয়েছে। বিষ্ণুর ধ্যানমন্ত্রে আছে তিনি সহস্রচক্ষু, সহস্রহস্ত ইত্যাদি। ওটা কিন্তু বেদের কথা, বেদ থেকে ওরা এইভাবে নিয়েছে। বেদে 'পুরুষের' বর্ণনায় ওই কথা আছে, তিনি সহস্রচক্ষু ... ইত্যাদি। ঐতরেয় উপনিষদে ঋষিরা বলছে, আমরা

সেই পুরুষকে হারিয়েছি। তাই যাগ যজ্ঞ ক'রে তাঁকে ফিরে পাবার চেষ্টা করছি। আর চিত্তকে দেখাল আমার সারা দেহটায় চোখ— সহস্রচক্ষু! কী করে দেখাল বল্ দেখি!

*** আজ (১১/৫/১৯৬২) বুঝতে পারলুম তথাগত কথার মানে কী।** বুদ্ধকে ওরা বলছে তথাগত। Old Testament-এ বলছে One is to come। তারপর যীশুকে বলল— He is that One! কিন্তু জিনিসটা চলে এসেছে সেই উপনিষদের সময় থেকে। তারা সেই পুরুষকে খুঁজছে। সমস্ত ধর্মের মধ্যে কথাটা ওই ভাবে চলে এসেছে। প্রায় সব ধর্মাচার্যকেই বলা হয়েছে, তিনিই সেই পুরুষ। আর কিভাবে দেখাল বল্ দেখি সেই পুরুষকে! আমি এক এক সময় ভাবি— কেন এত লোক আমায় দেখে? কে দেখায়? আজ বুঝছিস স্বপ্নে আমাকে দেখার মানে কী? পরশু দিন ধ্যানে দেখেছিলুম মশারী গোড়ান হচ্ছে। কাল দেখলুম মশারী গুড়িয়ে তোলা হয়েছে, আর আজ বুঝলুম চিত্তের ওই স্বপ্নের অর্থ।

* শনিবার, ৫ই মে, ১৯৬২, শ্রীচিত্ত ভট্টাচার্য স্বপ্ন দেখেন শ্রীজীবনকৃষ্ণের সর্বাঙ্গে চক্ষু, ১১ই মে শুক্রবার আলোচনা প্রসঙ্গে স্বয়ং শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেই স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ করেন। **যজুর্বেদে যে পুরুষের কথা বর্ণনা করা আছে, তিনি কেবল সহস্রচক্ষু নন, তিনি সহস্রশীর্ষ।** জীবনযজ্ঞের অভিনব শিল্পী যিনি সকলকে নিয়ে এক অভূতপূর্ব নূতন শিল্পের অবতারণা করেছেন তাঁর শিল্প চাতুর্যে তো কোন খুঁত নেই। তিনিই আবার দেখালেন যে শ্রীজীবনকৃষ্ণ কেবল সহস্রচক্ষু নন, তিনি সহস্রশীর্ষ। শ্রীধীরেন রায় মহাশয়ের দাদা শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ, যিনি ঘাটশিলায় থাকেন তিনি চিত্তবাবুর স্বপ্ন বা তার ব্যাখ্যার কথা কিছুই জানতেন না। দ্বিজেনবাবুও একটি স্বপ্ন দেখেন ৭ই অথবা ৮ই মে। স্বপ্নটি তিনি তাঁর অপর ভাই শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে লিখে পাঠান। স্বপ্নের বিবরণ নিচে দেওয়া গেল—

শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের নাক থেকে মাথা পর্যন্ত অংশটি দেখা যাচ্ছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখের নিচে অনেক মুখ দেখা যাচ্ছে। মুখগুলি একের পর এক গোলাকারে ঘুরে যাচ্ছে। তাতে নলিনীবাবু শৈলেনবাবু, ধীরেনবাবু, স্বপ্ন দ্রষ্টা নিজে, ঘরের পরিচিত অনেক লোকের মুখের সঙ্গে অপরিচিত অনেক মুখও দেখা যাচ্ছে। ছবিতে রাবণের যেমন দশ মুণ্ড দেখা যায় তেমন অবস্থা বলে স্বপ্নদ্রষ্টার মনে হচ্ছে না। কেবল শ্রীজীবনকৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণের মুখমণ্ডল স্থির রয়েছে। অপর মুখগুলি বিবর্তিত হচ্ছে। চেনা, অচেনা, ছোট, বড়, কারও সাদা দাড়ি, কারও সাদা লম্বা চুল। কত নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখমণ্ডল কখনও বর্ণাঢ্য, কখনও বা উজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্বর।

*** আজ সকালবেলা অথর্ব বেদের পুরুষ-সূক্তটা পড়ছিলুম।** পুরুষ-সূক্তটা আরম্ভ হচ্ছে পুরুষের ওই রকম বর্ণনা দিয়ে- তাঁর সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু ইত্যাদি। তার কিছু পরেই বর্ণনা রয়েছে— তারা যজ্ঞ করছে আর যজ্ঞ থেকে ১ জোড়া ঘোড়া,— একটা ঘোটক, আর একটা ঘোটকী, ১ জোড়া গরু,— একটা গাভী, আর একটা ষাঁড়, ১ জোড়া ছাগল,— একটা ছাগ আর একটা ছাগী বেরোচ্ছে।

ন'হাজার বছর আগে এই অথর্ব বেদ লেখা হয়েছে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কারও মাথায় কি ঢোকেনি— এ জিনিসটা কী বলছে ওরা? যজ্ঞ করছে আর তার থেকে এক জোড়া ঘোড়া, এক জোড়া গরু আর এক জোড়া ছাগল বেরোচ্ছে— এ আবার কি? বললেই বলবে— হ্যাঁ, তারা করতে পারত। তোমাদের সে শক্তি নেই তাই তোমরা পার না। ন'হাজার বছর ধরে এই কথা চলে আসছে। শুধু ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীতেও তো কত লোক অথর্ব বেদের ওই কথা পড়েছে। কারও মাথায় কি ঢোকেনি কী বলছে ওরা! অথচ পুরুষ-সূক্তের গোড়ায় 'পুরুষের' কি চমৎকার বর্ণনাই দিয়েছে। আর তার পরেই বলছে যজ্ঞ থেকে ঘোড়া বেরোচ্ছে, গরু বেরোচ্ছে, ছাগল বেরোচ্ছে।

আমি কিন্তু বুঝে ফেলেছিলুম। চট করে বুঝে ফেললুম ওরা কি বলছে। যোগের অর্থ নয়, সাদা কথাতেই ধরতে হবে ওরা কি বলছে। সভ্যতার বিকাশ কী করে হয়েছিল অথর্ব বেদ তাই বলে যাচ্ছে। যজ্ঞ কী রে? জীবনযজ্ঞ। ওরা সেই পুরুষকে ভেতরে পেয়েছিল। তাইতে ওদের brain power develop করেছিল। বনের পশুকে পোষ মানিয়ে নিজের কাজে লাগাতে শিখেছিল। পুরুষযজ্ঞ থেকে উত্থিত হোল ১ জোড়া ঘোড়া,

১ জোড়া গরু আর এক জোড়া ছাগল, অর্থাৎ অথর্ব বেদ বলে যাচ্ছে সেই পুরুষকে অন্তরে লাভ করে কিভাবে তাদের সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

* ‘যোগ’ কথার মানে আমি কী দিয়েছি? পরিবর্তন। এই যোগের ক্রিয়া মানুষের দেহে দু’ভাবে হচ্ছে। (১) মানুষটা বদলাচ্ছে, ক্রমাগত বদলাচ্ছে। ছিল এক বছরের শিশু, হোলো দু’বছরের বালক। তারপর কিশোর, তারপর যুবা, তারপর প্রৌঢ়, তারপর বৃদ্ধ। সব সময়েই তার মধ্যে পরিবর্তন চলেছে। মানুষের দেহে যোগের ক্রিয়া আপনা থেকেই চলেছে।

(২) মানুষের দেহে আর এক পরিবর্তন হয়, সে হচ্ছে কুণ্ডলিনী শক্তির পরিবর্তন। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হোল। তারপর তার ঊর্ধ্বগতি। সহস্রারে ভগবান দর্শন। সে ভগবান হয়ে গেল। সে যে ভগবান হোল তার প্রমাণ কী? প্রমাণ দেবে জগৎ। জীব-চৈতন্যকে সে তার প্রাণশক্তির পরিবর্তিত রূপে রূপায়িত করল। যোগ কথাটার কি extended মানে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছিস! It is applicable to every human being।

এই পরিবর্তনের কথা আধুনিক scientific world-এ কে বলেছেন? বলেছেন আইনস্টাইন, তাঁর Theory of Relativity-তে। তিনিও বলেছেন যে, পৃথিবীতে ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের জন্যই কোন conclusion-এ আসা যায় না। কেন না কোন জিনিস সম্বন্ধে যে conclusion করা হোল, conclusion-এর পর সে জিনিসটার পরিবর্তন হয়ে গেছে। আইনস্টাইন এই পরিবর্তনের কথা ধরেছে, কিন্তু তার effect বলতে পারছে না। এই effect আমরা দেখতে পাচ্ছি। যতই পরিবর্তন হোক আমাকে দেখাটা তো বদলাচ্ছে না। এইখানে পাচ্ছি — Supremacy of Yoga over modern science। পরিবর্তনের মধ্যেও আমাকে দেখাটা বদলাচ্ছে না।

বৌদ্ধেরা এই পরিবর্তনের কথা ধরেছিল, আর এখানেই হিন্দুদের সঙ্গে তাদের বিরোধ। বৌদ্ধেরা বলছে মানুষের জীবনে ক্রমাগত এই পরিবর্তন হচ্ছে। হিন্দুরা বলছে, থাম! এর পিছনে noumena (বস্তু জগতের গুণাগুণশূন্য ও শুধুমাত্র অনুভূতির বিষয়) আছে, সে অক্ষয় অব্যয়। তাকে আগে জানতে চেষ্টা কর।

* গতকাল (২৩/৫/১৯৬২) তোদের বলেছিলুম বোধ হয় মনে আছে যে, **এই পরাবিদ্যা এখন brain power আশ্রয় করে ফুটে উঠছে। ঋষিদের সময় ছিল দেহের শক্তি, তারা বলছে নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ**। আর এখন সেই পরাবিদ্যা ফুটে উঠছে brain power আশ্রয় ক’রে। কাল তোদের এই কথা বলেছি তো! তখনও বুঝতে পারিনি যে একথা আমি ‘ধর্ম ও অনুভূতি’র প্রথম ভাগে লিখে গেছি। বুঝলুম আজ, একটু আগে। কোথায় লিখে গেছি বলতো! ওই যে যেখানে বর্ণনা দিচ্ছি যে, বাবুর গলা পর্যন্ত চাদর ঢাকা। ওই স্বপ্নে তো আমাকে দেখিয়েছে যে brain power আশ্রয় ক’রে এ জিনিসটা ফুটবে। স্বপ্ন দেখেছি প্রায় ৪০ বছর আগে। তার একটা অর্থই আমি দিয়ে এসেছি যে নিম্নাঙ্গের সাধন আর হবে না। এর আর একটা যে অর্থ রয়েছে সে কথা ধরলুম ৭০ বছর বয়সে। স্বপ্ন! স্বপ্ন! স্বপ্ন! স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমরা করি। দেখতে পাচ্ছিস— স্বপ্ন কী ভয়ানক জিনিস!

* **গতকাল (২৯-৫-১৯৬২) আদি পুরুষকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছি**। কতকগুলো লোহার গরাদ দিয়ে একটা জায়গার প্রায় তিন ভাগ যেন ঘেরা রয়েছে। তার ভেতরে এ ধারটায় রয়েছে বছর পঁচিশ বয়সের একজন লোক। আর ও-ধারে রয়েছে একজন প্রৌঢ়, বয়স ৩৫ থেকে ৪০-এর মধ্যে। আর বেড়ার বাইরে ওধারে আছে একজন বৃদ্ধ, লোল চর্ম। আমি এধার থেকে ওধারে যেখানে সেই বৃদ্ধটি রয়েছে সেখানে গিয়ে ফিরে এলুম। কোন কথাবার্তা তার সঙ্গে হয়নি। যখন ফিরে আসছি তখন সেই প্রৌঢ়, যার বয়েস ৩৫ থেকে ৪০-এর মধ্যে সে বলছে— দর্শন তো হয়েছে!

স্বপ্নের কি মানে বলতো! ওঃ কি অদ্ভুত ভাবে দেখিয়েছে রে ওই লোক দুটি কে? একজন হচ্ছে বেদ আর একজন হচ্ছে উপনিষদ। উপনিষদ বেদের পরে হয়েছে, তাই তার বয়েস কম। আর ওই যে বৃদ্ধটি বসে আছে ও হচ্ছে পরাবিদ্যা। জিনিসটা কিভাবে হয়েছে তাই দেখিয়েছে। সেই আদিপুরুষ যার এই পরাবিদ্যা লাভ হয়েছিল তার কত পরে বেদ আর উপনিষদ লেখা হয়েছিল তাই দেখিয়েছে।

আমার মনে হচ্ছে ওই বৃদ্ধ লোকটির রূপ যেন আমারই রূপ, সে যেন আমি। তার প্রমাণও আছে, কেন না আমি তো তার সঙ্গে কথা কই নি। দেখাচ্ছে যে আমিই সেই আদিপুরুষ। (কিছুক্ষণ পরে) একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকে যাচ্ছে। এ জিনিসটা বাংলা দেশেই হোল কেন? এও তো হতে পারে আমি সেই আদিপুরুষের বংশধর!

আমাদের সেই আদিপুরুষের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। বেদের যুগ থেকেই সে জিনিসটা চাপা পড়ে এসেছে। সে জিনিসটা আবার প্রতিষ্ঠা করেছে তোদের দিয়ে। আমাদের দেখিয়েছে ধর্মের বর্তমান পরিস্থিতি কী।

একচত্বারিংশৎ প্রবাহ

(আলোচনাকাল— জুন থেকে অক্টোবর ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ)

* **ঠাকুর বলছেন, 'জানি কিনা আর একবার আসতে হবে।'** একথার সোজা মানে কি দাঁড়ায় বল দেখি? যোগের মানে ধরতে হবে না, Psycho-analysis ক'রে বল্। এ কথার সোজা মানে হচ্ছে যে তাঁর অপূর্ণতার কথা তিনি বুঝেছিলেন। Purpose of the human life has not been fulfilled। তাই তিনি আর একবার আসতে চাইছেন।

* **আমি অনেকদিন ভেবেছি, ঠাকুর ন্যাংটো হয়ে বেড়াতেন কেন?** কোন কারণ খুঁজে পাইনি। আজ কথা বলতে বলতে হঠাৎ বুঝতে পারলুম। যখন তিনি ন্যাংটো হয়ে বেড়াতেন তখন দেখা যায় তিনি কিছুটা প্রকৃতিস্থ, কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। অর্থাৎ তখন তাঁর brain-এর aboriginality-র cell ফুটে উঠত। মানুষ যখন ন্যাংটো হয়ে বেড়াত সেই সময়কার সংস্কার কি রকম তাঁর মাথায় ফুটে উঠত। তাই তখন কাপড় ফেলে দিয়ে বেড়াতেন। এতে কি ধর্ম হোল। ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা নয়, দেহের ধর্ম ফুটে উঠল।

ঠাকুরের ছ'মাস নির্বিকল্প সমাধিতে থাকার কথায় তোদের বলেছি যে, মানুষ যখন arctic zone-এ থাকত তখন তারা ছ'মাস ঘুমাতো, ছ'মাস জেগে থাকত। সেই সংস্কার ঠাকুরের মধ্যে কিভাবে ফুটে উঠেছিল।

তাই তিনি ছ'মাস নির্বিকল্প সমাধিতে ছিলেন। ন্যাংটো হয়ে থাকার ব্যাপারটাও তাই। Aboriginal সংস্কার কিভাবে তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত।

* **খালি খাবারের আয়োজন! ঠাকুর যাচ্ছেন ভক্তদের বাড়ি, খাবারের আয়োজন সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন।** বুঝলি না? রামবাবুর বাগানে যাচ্ছেন, সুরেশবাবুর বাগানে যাচ্ছেন, কী হচ্ছে? খাবারের আয়োজন সঙ্গে যাচ্ছে না? কেশববাবু দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন ঠাকুরের কাছে, জিজ্ঞাসা করছেন, আজও কি মুড়ি নারকোল? কেন? দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কাছে এসে খাবারের কথা মনে পড়ে কেন? আচার্য কী করছেন? তাদের মন থেকে সেই প্রবৃত্তি মুছে দিতে পারেন নি? এই যে এই ভিটেয় তোরা আসিস, এখানে এসে কি খাবারের কথা তোদের মনে পড়ে? কখনও তো সে কথা ওঠেনি বাবা। খাবারের জায়গা জগতে কি আর নেই রে?

* **ওই যে গান পড়া হচ্ছে— 'মা কি আমার কালো রে,'**— আমি মাও জানি না, বাপও জানি না। আমি জানি আমার ধর্ম। এ হচ্ছে মনুষ্যজীবনের স্বাভাবিক সত্য। সেই সত্যকে ধারণের ক্ষমতা থাকলেই ফুটে উঠবে।

* **দ্বৈতবাদে একজন বড়, আর একজন ছোট।** দ্বৈতবাদ এরই ওপর base করা— একজন বড়, অপর সকলে তার ভজনা কর। আর, আমাদের বেদ বলছে— সকলেই সেই ব্রহ্ম। 'তত্ত্বমসি'— বলেছেন ঋষিরা। আমরা দেখছি—দ্বৈতবাদীদের কথা ভুল, ঋষিদের কথাই ঠিক। ঋষিদের কথাই যে ঠিক তার প্রমাণ কী? প্রমাণ আমাদের এই ঘরে।

* আমি জন্মেছি এই মনুষ্যজাতির মধ্যে। **আমি আমার গান গাইব, না মনুষ্যজাতির গান গাইব?** মনুষ্যজাতির গান গাইব। এত লোক দেখার পর একটা কথা বলতে পারা যায় যে আমার রূপ সকলের মধ্যেই আছে। মনুষ্যজাতির সেই গান একই সুরে বাঁধা।

* **যদি কেউ প্রশ্ন করে, মশাই, আপনি মেয়েদের কাছে আসতে দেন না, কেন?**— আমি উত্তর দেব— মানুষ জানে না যোগ কাকে বলে। মূর্খ জগৎ জানুক যোগ কী, যোগ কাকে বলে। আর আমি তো

তাদের কল্যাণ করছি। যে চার্জ করতে আসবে আমি তারও কল্যাণ করছি।

* **ওরে, কামচারের কথা শোন**। জন্তু জানোয়ারে আমার কত টান তা তো জানিস। কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারি না। পেচ্ছাব করতে যাচ্ছি দেখলুম কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে বারান্দার ওই কোণটায় শুয়ে আছে। অন্য সময় হোলে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিতুম। আজ মনে হোল, আহা থাক, চারিদিকে জল, কোথায়ই বা যাবে। তারপর পেচ্ছাব করতে বসে কাকে দেখলুম বল্ দেখি! কাকে দেখা উচিত? দেখলুম অনাথকে। মনে হোল, ওকে দেখলুম কেন? তারপর মনে পড়ল, ওই কুকুরটার কথা ভেবেছি, তাই অনাথকে দেখলুম। আমি তো এই ব্যাখ্যা করলুম, তোরা যা পারিস ব্যাখ্যা করিস।

* **বেদে আছে আদি পুরুষের কথা**। এক সময় মানুষ ছিল রাক্ষস স্বভাবের। রাক্ষস রে রাক্ষস! কাঁচা মাংস খেয়ে বেঁচে থাকত আর তাদের দেহে হজম শক্তিও ছিল। কাঁচা মাংসই হজম করে ফেলত। তারপর এলেন আদিপুরুষ। ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে লাগল। তারা আগুন জ্বালাতে শিখল, বনের পশুকে বশ করতে শিখল। আদিপুরুষের আর্বিভাবের পর তাদের brain power developed হতে লাগল। বেদ হচ্ছে সেই আদিপুরুষেরই কথা।

* **আজ দুপুরে (২২/৭/১৯৬২) একটা দর্শনে দেখালো উপনিষদের পালা শেষ হয়েছে**। দুটোর সময় তো পাঠ শুরু হোল। আমি তো ধ্যান করতে বসলুম। তারপর দেখলুম যেন একটা উপনিষদ্। এই উপনিষদ্টার যেন (শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে তখন উপনিষদ্ গ্রন্থ ছিল।) একটা পাতা খোলা রয়েছে। তারপর সে পাতাটা উল্টে গেল। পরের পাতায় খানিকটা লেখা রয়েছে, তারপর আর লেখা নেই, সাদা পাতা, এই-এই রকম। (শ্রীজীবনকৃষ্ণ উপনিষদের একটি পাতা খুলে দেখালেন। মাঝ পাতায় পরিচ্ছেদ বা খণ্ড শেষ হয়ে গেলে অবশিষ্ট পাতাটি যেমন সাদা থাকে ঠিক সেইরকম)।

লেখাটা শেষ হয়ে গেল, তারপর আর লেখা নেই, এর কী মানে করবি বল্ দেখি? ওরে উপনিষদের হাঙ্গামা চুকে গেল। আজ ক'মাস ধরে উপনিষদ্ থেকে কত কথা আলোচনা করা হয়েছে, আমরা দেখেছি যে

এখানকার এই জিনিসটা উপনিষদের ওপর base করা যায়। এবার উপনিষদের পালা শেষ হোল তাই দেখাল।

* (পুরীধামে অবস্থান কালে) **জগন্নাথের মন্দিরের গোপুরম্ দেখে শ্রীরঙ্গপত্তমের গোপুরমের কথা মনে পড়েছিল**। শ্রীরঙ্গপত্তমের গোপুরম্ এত বড় যে British soldiers-রা যখন French Army-কে তাড়া করেছিল তখন দু'ডিভিসন French soldiers শ্রীরঙ্গপত্তমের গোপুরমের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। British soldiers-রা বুঝতে পারেনি।

শ্রীরঙ্গপত্তমের মন্দির যে তৈরী করিয়েছিল, কথা বলতে বলতে তাকে দেখতে পাচ্ছিলুম। এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে অনেকটা মুনির মত। কিন্তু তাকে তো identify করতে পারব না।

* (পুরীধামে অবস্থানকালে) **এখানে মহাসমুদ্রের ডাক শোনা যায়**। মহাপ্রভু এই ডাক শুনেছিলেন। এই সময় নিজেকে control করা বড় শক্ত। মহাপ্রভু control করতে পারেননি। তাই তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

দেখ, যারাই আমাকে দেখেছে তাদের মত ভাগ্যবান লোক এ পৃথিবীতে এসেছে কিনা সন্দেহ।

দ্বি-চত্বারিংশৎ প্রবাহ

(পুরীধামে, ২৬শে হইতে ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৬৩)

* ছান্দোগ্য (উপনিষদ্) কী বলছে শোন্—

এবম্ এব এষ সম্প্রসাদঃ, অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়
পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য, স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে।

—এ তো এখানে যা হয়েছে সেই কথাই বলছে। আমাদের কথাই বলছে। এ সব কথা চাপা পড়ে গিয়েছিল। আগ্নেয়গিরির তলায় আছে অগ্নিকুণ্ড। সেই অগ্নিকুণ্ডের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল এই সব কথা। বেদের এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। (শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'ব্রহ্মসূত্র' নামক পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে ওই মন্ত্রটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া আছে)। কী বুঝেছেন এঁরা?

আমরা দেখতে পাচ্ছি কী? — Monster worship। একটা কাঠের থুম বসিয়ে রেখে আজ ৭৯০ বছর ধ'রে সারা ভারতবর্ষের লোককে প্রতারণা ক'রে চলেছে। — জগন্নাথ রে বাবা জগন্নাথ! ওটা কী বল্ দেখি! ই-য়া বড় বড় চোখ, এক কিম্ভুতকিমাকার মূর্তি! ছাপ্পান্নবার ভোগ কিরে বাবা! মানুষ কি ৫৬ বার খেতে পারে? — এই তোদের ধর্ম! তোদের কী হয়েছে তা বোঝাবার জন্যই আমি এত ক'রে পড়াচ্ছি। তোরা যা বুঝেছিস, আর যে ব্যাখ্যা দিলি ওরা তা পারেনি। জিনিসটা কী? It is the gradual unfoldment of the divinity lying dormant in man। এ সব কথা চাপা পড়ে গিয়েছিল; ওই যে বললুম, আগ্নেয়গিরির নীচে যে অগ্নিকুণ্ড থাকে তার তলায়! তবে ছান্দোগ্যও যে সব কথা বলতে পেরেছে তা নয়। আমাকে চাক্ষুষ না দেখে বহু লোক আগে স্বপ্নে আমায় দেখেছে, তার কোন উল্লেখ তো নেই। তবে মোটামুটি এ জিনিসটার একটা আভাস পাচ্ছি।

* অনেকদিন আগে একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম— আমি অন্ধকার গহ্বর থেকে একজন লোককে টেনে তুললাম। সে বললে, বাবুজী মশাই, আপনি জানবেন **আপনি ভগবান; তবে গুপ্তভাবে লীলা**। যে লোকটাকে দেখেছিলুম তার নাম হচ্ছে অনাথবন্ধু আর এখানে এই যে বাড়িটাতে আছি, এই বাড়িটার নাম অনাথবন্ধু (পুরী গৌরবাটসাহীতে)। এটা অনাথবন্ধু চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোকের বাড়ি। কী আশ্চর্য বল্ দেখি!

* ক'দিন আগে একটা বাণী পেয়েছি— **'আমাকে আর ব্রহ্ম বলিসনি**।' গোপালকে বলেছিলুম সে কথা। চার পাঁচ দিন আগে আর একটা দৈববাণী হয়েছিল— **'বেঁচে থাকাটাই পুণ্য, মরে যাওয়াই পাপ**।'

* এই যে তোরা আমার সঙ্গে বেড়াচ্ছিস, একদিন তোদের মনে হবে— এইভাবে বেড়িয়ে কী আনন্দই পেয়েছি। এমন আনন্দ জগতে কোথাও পাবি না রে!

(শ্রীরামপুর। অক্টোবর ২, ১৯৬৩)

* **এবার পুরী গিয়ে আমি গোড়া থেকেই মহাপ্রভু সম্বন্ধে**

খোঁজখবর করতে চেষ্টা করেছি। জ্যান্ত মানুষটা কি উবে গেল! তা তো হতে পারে না। যে কথা জেনেছি সে হচ্ছে এক horrible tale।

উড়িষ্যার লোকেরা গোড়ায় ছিল আদিম অধিবাসী। তারপর দ্রাবিড়ী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এক সংকর জাতির উদ্ভব হোল। তারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করল বটে, কিন্তু সে হিন্দুধর্ম হোল সেমিটিক (semitic)। তারা আর্যধর্মের কিছু নেয়নি। মহাপ্রভুকেও তারা নিতে পারেনি। ধীরে ধীরে একটা অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল। শেষে একদিন যখন তিনি মুর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁকে জ্যান্ত অবস্থায় একটা লোহার বাক্সে পুরে খুব সম্ভব ওই গুণ্ডিচা বাড়িতে পুঁতে ফেলা হয়। এই কাজ করতে তিনদিন সময় লেগেছিল। মনে হয় আর যারা সে সময় ছিল তাদেরও মেরে ফেলা হয়। গদাধর, যিনি টোটা গোপীনাথ মূর্তি পূজা করতেন, তাঁর তো কোথাও সমাধি নেই। হরিদাসের সমাধি রয়েছে, গদাধরের সমাধি নেই কেন? তাঁকেও কি ওরা মেরে ফেলেছিল? এক তিনি দেশছাড়া হয়ে পালাতে পারেন। কিন্তু তা হলেও তো তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসতেন। স্বরূপ দামোদরের কথা ভাব না। তিনি তখন ভুবনেশ্বরে। তিনি শুনলেন মহাপ্রভু অপ্রকট হয়েছেন। তখন তাঁর কী করা উচিত ছিল বল্ দেখি? তাঁর তো পুরীতে ফিরে আসা উচিত, অন্ততঃ মহাপ্রভুর সমাধি ক্ষেত্র দেখে যাওয়া উচিত। তা না ক'রে তিনি সোজা ফিরে এলেন বাংলাদেশে। তিনি শুনেছিলেন যে পুরীতে ভারী গোলমাল, তাই আর ওদিকেই পা মাড়ান নি।

আমার তো মনে হয় গম্ভীরাও ওরা দখল ক'রে রেখেছিল। রামদাস বাবাজী মহারাজ যাঁর শিষ্য, কী নাম তাঁর? হ্যাঁ, চরণদাস বাবাজী। তিনিই ওই গম্ভীরা পুনরুদ্ধার করেন। During the British rule গম্ভীরা পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। যে দেশে মহাপ্রভু জন্মেছিলেন সে দেশ তিনি ত্যাগ করেছিলেন আর যে দেশ তিনি adopt করেছিলেন, there he was murdered!

(কেদার দেউটি লেন)

* **মঠকে আমি কী চক্ষে দেখতুম তা তোরা কী বুঝবি!** মঠে যেতুম, সঙ্গে ঠোঙা নয় রে, চ্যাংড়া থাকত। মঠের সাধুদের দিতে হবে!

আবার এমন সময় ফিরে আসতুম যে সন্ধ্যের সময় বাড়িতে ফিরে এসে যাতে ধ্যান করতে পারি। হেম পালের ইট খোলার গদী ছিল, ওই মঠের পাশেই। ওদের গদীর পাশ দিয়েই তখন মঠে যেতে হত। হেম পালের ছেলে থাকত গদীতে। একদিন মঠ থেকে বেরোচ্ছি, ডাকছে 'ও মশাই শুনুন। হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছি।' কী আর করি, গেলুম ভেতরে। আমায় বলছে, 'আপনি মঠে যান তো? আপনাকে আমি দেখি। এত লোক যাওয়া আসা করে, সাধুরা যায়, ভক্তেরা যায়, কিন্তু আপনারই দেখি ঠিক ঠিক।' বেদও ঠিক ওই কথা বলছে— অচেনা, অজানা লোক বলবে। হেম পালের ছেলে একেবারে oppositionist। সেও বললে, মশাই আপনারই ঠিক ঠিক।

* কী অদ্ভুত এই মনুষ্য জীবন! **মানুষটা কী তা নিজেই জগতে তার প্রমাণ রেখে যাচ্ছে**। মানুষের দুটো জীবন, একটা ব্যবহারিক, একটা আত্মিক। প্রথমে ব্যবহারিক জীবনের কথা ধর্। মাইকেল এঞ্জেলো ছবি এঁকে জগতকে দেখালেন তিনি একজন শিল্পী। মার্কনী আবিষ্কার করলেন ওয়ারলেস। এডিসন আবিষ্কার করলেন ইলেকট্রিক বাল্ব। তাঁরা জগতে দেখালেন তাঁরা বৈজ্ঞানিক। রবি ঠাকুর লিখলেন কবিতা। জগতকে দেখালেন তিনি একজন কবি। এঁরা কী তা এঁরা নিজে হাতে জগতে প্রমাণ রেখে গেছেন। মাইকেল এঞ্জেলো ছবি না এঁকে পারতেন না। মার্কনী বা এডিসন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার না ক'রে পারতেন না। রবি ঠাকুর কবিতা না লিখে পারতেন না। একে বলে fulfilment of purpose।

এবার আত্মিক জীবনের কথা ধর্। আমার জীবনে যে সত্য সেই সত্য আপনা থেকে ফুটে উঠেছে জগতে। জগতকে দেখাচ্ছে সেই সত্য কী। দেখছিস কী অদ্ভুত এই জগত! কী অদ্ভুত এই মনুষ্য জীবন!

* আমি তো কোন কিছুই নিইনি। (ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থে) প্রথম ভাগের নিবেদনে ঠিক এই কথাই লেখা হয়েছে যে, **যেখানে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে সেটি হোল— এই হাজার হাজার লোকের আমাকে দেখা**। আমি তো বলতে পারতুম— দেখ, আমি অবতার, তাই তোরা আমাকে দেখিস। কিন্তু ওসব কিছু তো আমি নিইনি। তা না হলে জগতে অবতারত্ব

প্রথম আমার মধ্যেই ফুটেছে. আমিই প্রথম বলেছি— অবতারত্ব কী। কিন্তু তাতেই বা হোল কী! আমার তো সেই দু'খানা হাত আর দু'খানা পা।

* **এ জগতে সত্য কী বল্ দেখি?**— আমি! আমি কে? বেদ কী বলছে? আমি ব্রহ্ম; অহং ব্রহ্মাস্মি।— ব্রহ্মত্ব হলে কী হয়? সকলে তাঁকে ভেতরে দেখে— স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে। তোদের বাড়ির লোক যখন বলে, মা বলে, কি ভাই বলে, কি বোন বলে, কি আর কেউ বলে যে, ওনাকে দেখেছি, তখন ওরা কী বলে জানিস? ওরা বলে উনি ব্রহ্ম।

এরপর আর কী আছে বাবা? হ্যাঁ আছে, কিন্তু তার তো কোন প্রমাণ দিতে পারব না। তখন পেচ্ছাব করতে বাইরে যাব, দেখি ওই কোণে একটা ব্যাগ রয়েছে। ব্যাগের দিকে নজর পড়ল, অমনি ফুটে উঠল অভয়। বুঝলুম অভয়ের ব্যাগ। কিন্তু এর কোন প্রমাণ দিতে পারব না। 'সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি'— এর তো কোন প্রমাণ নেই।

* **অহং ব্রহ্মাস্মি— একথা জানলেই ব্রহ্মজ্ঞান হোল না**। মানুষ ব্রহ্ম এই জানাই হোল ব্রহ্মজ্ঞান।

. . . প্রবাহ

(আলোচনাকাল— জানুয়ারী, ১৯৬৪)

* **তন্ত্রের main motive (মূল উদ্দেশ্য) কী জানিস?** শুনে রাখ, ওদের motive হচ্ছে— To explore the human capacities lying latent in man. কিন্তু তারা অন্য পথে চলে গেছে। মানুষ চেষ্টা করে তো explore করতে পারবে না। আপনা থেকে যদি হয় তবে হয়। ওরা ওই করতে গিয়ে অনেক নীচে নেমে গেছে। মারণ, উচাটন, বশীকরণ এসব কি? ওই controlling power acquire করার চেষ্টা। একজন লোককে যদি মারতে পারা যায় তবে সকলেই control-এ থাকবে। প্রয়োজন হলে একশো লোককেও মারা যাবে।

* বেদে কী আছে? মানুষের কথা, মানুষকে নিয়েই বেদ। সেই মানুষের অনন্ত শক্তি। তাই মানুষ বেদাতীত।

* **বেদ বলছে, এ জন্মেই যদি হয় তবেই হোল, না হ'লে মহতী বিনাশ।** আমি বলছি, না, মানুষের সমস্ত জীবনটাই আনন্দ। সে হয়ত ভুগছে, দুঃখ পাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে, তবু সে বেঁচে থাকে কি নিয়ে? সে বেঁচে থাকে আশা নিয়ে। কিসের আশা। সে আনন্দ নিয়েই আছে, কিন্তু সে ধরতে পারে না। He may be perpetually ailing, but he does not know that he is aiming at Ananda. In any state of life, in any condition of life সে আনন্দ নিয়েই আছে। We are revealing the inner qualities of human life. সদাশিব! perpetually happy and prosperous. তাই ওরা বলছে, তিনি আনন্দে সৃষ্টি করেন, আনন্দে পালন করেন, আনন্দে সংহার করেন।

* (একটি যুবক এসেছে, শ্রীদিলীপ দত্তের বন্ধু। তাকে উদ্দেশ্য করে, শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন)

চৈতন্য মানে কী বুঝিস বল দেখি! বাংলা ভাষা তো, হিব্রু তো নয়। বল্ না, চৈতন্য মানে কী? আচ্ছা বল দেখি, তুই কে? (কিছুক্ষণ পরে) খুঁজে পাচ্ছিস্ না? আচ্ছা, আমি কে? আমি কখন থাকব না? যখন মরে যাব। তা হলে 'আমি' কে হচ্ছে? আমার ভেতর থেকে যে আমাকে কথা বলাচ্ছে, যে আমার এই হাতটা নাড়াচ্ছে সেই হচ্ছে 'আমি'! এই রকম সবার মধ্যেই সেই আমি রয়েছে। একেই ওরা বলছে সর্বভূতে এক আত্মা। সকলের মধ্যে যে সেই এক 'আমি' রয়েছে তার প্রমাণ কি? তার একটা রূপ তো চাই। তবে তো প্রমাণ হবে। এই তো এরা সব বসে রয়েছে, এরা সকলে আমাকে ভেতরে দেখে। শুধু এরা একা নয়। এদের বাড়ির ছেলে, মেয়ে, বাপ-মা, ভাই বোন, সকলেই আমাকে দেখে।

বেদে এই কথা আছে। বেদ বলছে, তোর যদি ব্রহ্মত্ব লাভ হয় তবে সকলে তোকে তাদের অন্তরে দেখবে। তোকে তারাই জানাবে যে, ওগো আমরা তুমি হয়েছি। বেদ বলছে—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতো বা কুমারী
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।

এ হচ্ছে এক দিক দিয়ে। আবার, তুই সকলকে তোর ভেতরে দেখবি। সর্বভূতানি চ আত্মনি। বেদ বলছে, মানুষ ব্রহ্ম। তুই যে ব্রহ্ম হয়েছিস, এই চৈতন্য তোকে কে দেবে? জগতের মানুষ দেবে। এবার বুঝলি চৈতন্য কী?

* **উৎপ্রেক্ষা নিয়েই ওরা জীবন কাটিয়ে গেল।** কবির কাব্য, বাস্তবের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কতটুকু! আর এ কী মহাকাব্য—বল দেখি! আমার জীবন কাটছে কী নিয়ে বল দেখি! সকলকে নিয়ে। এক একটি পা ফেলি, এক এক জন ফুটে ওঠে। অন্তরে আবার বাইরে!

* **এই যে সূর্যমণ্ডলে লোকে আমায় দেখে, এটা কী বল দেখি?** আর কাউকে লোক এই রকম সূর্যমণ্ডলের মধ্যে দেখে নি কেন? ঠাকুরকে কি কেউ এই ভাবে সূর্যমণ্ডলের মধ্যে দেখেছিল? কই না তো! সূর্যমণ্ডলে দেখা নিয়ে কত রকম ব্যাখ্যাই তো দিয়েছি। আজ আর এক ব্যাখ্যা শোন। সূর্যকে যেমন পৃথিবীর লোক দেখে, সকলেই দেখে, কেউ বাদ যায় না, আমাকেও তেমনই পৃথিবীর সমস্ত লোক দেখবে। সূর্যমণ্ডলের মধ্যে আমাকে দেখিয়ে হয়ত একথাই বোঝাতে চাইছে যে, পৃথিবীর সকলেই আমাকে দেখবে।

* কাল (১৯-১-১৯৬৪) একটা দৈববাণী পেয়েছি। **দেখছি একটা ছোট আমি, আর একটা বড় আমি।** ছোট আমি বলছি— আমার সব ঝঞ্ঝাট চুকে গেছে। বিরাট আমি বলছি, আমার কিন্তু সব ঝঞ্ঝাট চোকেনি। এর মানে কী বলতে পারিস্? ছোট আমি হ'ল জীব-চৈতন্য। বড় আমি হোল শিব-চৈতন্য। এ জিনিসটা প্রায় দু'মাসের মধ্যে কেমন অদ্ভুতভাবে develop করেছে।

তখন আমি পুরীতে। দেখছি,— আমি যেন দুজন। একটা ছোট (ঈঙ্গিতে আধ হাত দেখিয়ে) আমি, আর একটা বিরাট বড় আমি। ছোট আমি যেন দূর থেকে কাতরভাবে আবদারের সুরে বলছে, ইচ্ছামৃত্যু চেয়ে নে না! অনেকক্ষণ ধরে গজ-গজ করতে লাগল। বিরাট আমি চুপ করে রইল, কোন সাড়া-শব্দ দিল না।

এর মাস দুই পরে তখন আমি শ্রীরামপুরে। এবার বড় আমি

বলছে ছোট আমিকে, তোর চা খাওয়া আমি বন্ধ করবো। এদেরকে তারপর বললুম দৈববাণীর কথা, দেখ রে, আমার চা খাওয়া বোধ হয় বন্ধ হবে। হ্যাঁ রে বাবা, তোরা জানিস না হয়ত এমন অসুখও হতে পারে, যে আমার চা খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর আবার দেখলুম কাল— ছোট আমি বলছে, আমার সব পাট চুকে গেছে; বড় আমি, বিরাট আমি বলছে— আমার কিন্তু সব পাট চোকে নি।

দেখ, ছ'মাসের মধ্যে জিনিসটা কেমন develop করেছে। প্রথমে জীব বলছে শিবকে, কিন্তু শিব কোন response করছে না। অর্থাৎ তখন undeveloped, তারপর শিব বলছে জীবকে, তোর চা খাওয়া বন্ধ করবো। কিন্তু জীব চুপচাপ। অর্থাৎ এখনও undeveloped, তারপর কেমন develop করেছে দেখ। জীব আর শিব দুজনে কথা কইছে। অর্থাৎ ছ'মাসের মধ্যে brain-এর cell কেমন develop করেছে বেশ বুঝতে পেরে গেছি।

*** ওরে, তোরা জানিস না, I was an ardent student of history**। ছাত্রাবস্থায় ইতিহাস পড়ে বুঝেছিলুম যে ও! গ্রীক আলেকজাণ্ডার হেরে গিয়ে ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তোদেরকে বলেছি সে কথা। আর এতদিন পরে একজন বিদেশীর মুখে তার সমর্থন পাওয়া গেল। রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মার্শাল জুকভ্ ভারতবর্ষে এসে এক সৈন্য সমাবেশে ভারতীয় সৈন্যদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন যে আপনারাই সেই সব বীরের বংশধর যারা গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারকে পরাজিত করেছিলেন। আরও বলব? বলি। কলেজে পড়তে পড়তেই বইয়েতে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ভুল ধরেছিলুম।

* বিলেতে কখনও কখনও রাস্তায় ছেলেরা দেখতে পেয়ে বলে উঠতো, John, John! Look here, a German is going! তখন আমার শরীর যে কি রকম ছিল তা কী বলব!

* যৌগিক রূপ লেখা (ধর্ম ও অনুভূতি) শুরু করি ছোট্ট নোটবুকে। পেন্সিল দিয়ে লিখতুম। তারপর মনে হোল,— আরে এ তো অনেক বড় হবে, পেন্সিল দিয়ে তো হবে না। তখন কালি কলম ধরি। কালি কলম মানে কি? ফাউন্টেন পেন নাকি? একটা নিব আর হোল্ডার কিনে তাই দিয়ে লেখা। তখন কি জানতুম কী লেখা হচ্ছে! জানলে কি আর লিখতে পারতুম।

*** তখন কোঁড়ার বাগানে আমি আর ফটিক থাকি। পরে তারা এসে জুটল**। সেই চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যের গল্পের মত রে। ফটিক বিছানা করত কি সুন্দর। এমন সুন্দর বিছানা পাতা দেখা যায় না। আমি মাঝখানে শুতুম, আর ওরা দুজন শুতো দুধারে। কেন বলতো? ধারে শোয়া যে comfortable (আরামদায়ক)।

একদিন ভোর রাত্রে, ঘুম ভেঙে গেছে। ভোর রাত্রিতে ওঠা যে অনেক দিনের অভ্যাস। তখন তারাও উঠে পড়েছে। তারাকে তখন জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা ফটিকের কি বিয়ে? আজ তার আশীর্বাদ? আমি স্বপ্ন দেখলুম ফটিকের বিয়ে হবে। আজ তার আশীর্বাদ, তার দাদা আসছে আমাকে নেমন্তন্ন করতে। তারা বললে, হ্যাঁ, ওর বিয়ে, আজ ওর আশীর্বাদ ও আপনাকে জানায়নি, চেপে গেছে। তারপর আমরা হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে তৈরী হয়ে রইলুম। ফটিকের দাদা এল নেমন্তন্ন করতে।

তখন আমার ভগবান দর্শন হয়ে গেছে। এই রকম কত দর্শনই হয়েছে সারা জীবন ভরে ..... কটা কথা তোদের বলব? আর বলার ফুরসৎ কোথায়?

* আচ্ছা, **আমার দেহেতেই পরাবিদ্যা ফুটল কেন বল দেখি?** বেদের কথায় স উত্তম পুরুষঃ। The Best Man, the BEST MAN in the midst of the human race. বুঝতে পেরেছিস? তুই বুঝতে পেরেছিস (শ্রীজীবনকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে পুলক, চক্ষে অশ্রু)! এ কেষ্ট নয়, বিষ্টু নয়, মা শেতলাও নয়, The BEST MAN in the midst of the human race. এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার হবার পর এসব হয়েছে, না জন্ম থেকেই হয়েছে? দুই-ই-সত্য!

আয় বাবা আয়

'আয় বাবা, আয়।'

শ্রীজীবনকৃষ্ণের ওই প্রাণ জুড়ান ডাক যাঁরা শুনেছেন, না-জানি তাঁরা কত ভাগ্যবান। তাঁদের সকলকে প্রণাম।

এমন মধুঝরা, এমন স্নেহভরা, এমন তাপহরা ডাক আর তো কোথাও শোনা যাবে না। কি মাধুর্য যে ওই ডাকের মধ্যে তা কেমন করে বোঝান যাবে। পিতাও বুঝি এমন দরদ দিয়ে, এত স্নেহভরে তার সন্তানকে ডাকতে পারে না। সন্তানকে দেখে মায়ের প্রাণ কি ঠিক এমনিভাবেই ব্যাকুল হয়? যাঁরা তাঁর সঙ্গ করতেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ ছিলেন তাঁদের সকলের পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই— বন্ধু সবার উপরে। তাই তাঁর কাছে আসার জন্য সকলের কত ব্যাকুলতা, কি আন্তরিক আগ্রহ। পথের দূরত্ব কোন বাধা মানে নি। কর্মের বন্ধন আলগা হয়ে গেছে। বয়সের বোঝাও হার মেনেছে। তাঁর কাছে কেউ এসেছে নবদ্বীপ থেকে, কেউ রাণাঘাট থেকে, কেউ বা বর্ধমান, কেউ ব্যান্ডেল থেকে, হাওড়া-কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে তো লোক আসার বিরাম ছিল না। কেউ এসেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে, কেউ বা সুযোগ পেলেই ছুটে ছুটে এসেছে। বেশিরভাগ লোক আসত দৈনন্দিন কর্মজীবনের শেষে কর্মক্লান্ত দেহে, হয়তো বা পেটে ক্ষুধা আর অবসন্ন মন নিয়ে। কিন্তু শ্রান্তি ক্লান্তি রোগ শোক ক্ষুধা জড়তা কোথায় বিদায় নিত, যখন ঘরে ঢুকতেই কানে আসত শ্রীজীবনকৃষ্ণের সুধামাখা কণ্ঠস্বর — 'আয় বাবা আয়।'

শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরখানিতে অগণিত লোকসমাগম হয়েছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেছে। কিন্তু কে কোথা থেকে আসছে, কার কী পরিচয়, কে কোথায় কী কাজ করে, তাঁর ঘরে, এসব কথা খুব কমই আলোচনা হয়েছে। বছরের পর বছর এক সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটালেও, আজও খুব কম লোকই পরস্পরের পূর্ণ পরিচয় জানে। কে মুখুজ্জে, কে বাঁড়ুজ্জে, কে চাটুজ্জে, কে বা ঘোষ, বোস, মিত্তির এসব খবর অনেকেরই জানা নেই। ওসব কোথায় যেন ভেসে গেছে। আবার কেউবা হয়ত শুধু

মুখুজ্জে-মশাই, কেউ বা শুধু রায়-মশাই নামেই চির পরিচিত হয়ে রইলেন। কয়েকজনের আবার বেশ নূতন নামকরণ হয়ে গেল। একটি ছেলে আসত বনগাঁ থেকে। তার নাম হয়ে গেল— বনগাঁ। পরে সে কলকাতা অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করল। কিন্তু তার বনগাঁ নাম আর ঘুচল না। এখন ধীরেন বললে অনেকেই হয়ত চিনবে না। কিন্তু বনগাঁ বললে সকলেই চিনবে ছেলেটিকে। আর একটি ছেলে আসত, বেশ লম্বাটে গড়ন, মাঝারি স্বাস্থ্য। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার নাম দিলেন 'সেপাই'। সে দিন থেকে সে সেপাই হয়ে গেল। ক'জন আর তার আসল নাম জানে? এইভাবে কারো নতুন পরিচয় হলো 'বাণীর মামা'। কেউ বা হলো 'বিরাটী'। আরও কত আছে। মানুষের প্রকৃত পরিচয় হলো তার অন্তর সম্পদে। অন্তরের সেই অক্ষয় সম্পদ ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবার জন্যই শ্রীজীবনকৃষ্ণ সকলকে কাছে ডাকতেন— 'আয় বাবা, আয়'।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া থেকেই শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে লোকসমাগম খুব বেড়ে যায়। কত লোক তাঁর কাছে এসেছে তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শনি ও রবিবারে বা অন্যান্য ছুটির দিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তিন চারশো লোকও এসেছে। চার-পাঁচ বছরের বালক থেকে আশি-পঁচাশি বছরের বৃদ্ধেরও আগমন হয়েছে। এদের মধ্যে শিক্ষিতও যেমন ছিল, অশিক্ষিত বা একেবারে নিরক্ষরও কম ছিল না। শিক্ষক-মশাই সঙ্গে করে এনেছেন তাঁর ছাত্রদলকে, আবার কখনো ছাত্ররাও টেনে এনেছে তাদের শিক্ষকবৃন্দকে। এমনিভাবে মালিক এসেছেন আবার শ্রমিকও এসেছেন। তাঁর কাছে সতেজ জোয়ান পুরুষ যেমন এসেছে, আবার পঙ্গু বিকলাঙ্গও এসেছে। ওই ঘরে সচ্চরিত্র ধর্মপ্রাণ লোকের আগমন হয়েছে, আবার চোর ডাকাতও বাদ যায় নি। কেউ এসেছে শুচিশুভ্র পোশাকে, কেউ বা এসেছে জীর্ণ মলিন বেশে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ কারো কাছ থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করতেন না। তাই তাঁর কাছে সকলকেই আসতে হতো রিক্ত হস্তে। সকলের জন্যই অবারিত উন্মুক্ত দ্বার, জাতি-বর্ণ-কর্ম-ধর্ম নির্বিশেষে, পরিচিত অপরিচিত যে কেউ যখনই গেছে সকলকে সমান সমাদরে কাছে ডেকেছেন— 'আয় বাবা, আয়!'

ব্রহ্মত্বে সকল মানুষের জন্মগত অধিকার, It is his birth right— বলতেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। কথাটি তাঁর কোন শুভ চিন্তা বা শুভ ইচ্ছার প্রকাশমাত্র নয়। প্রমাণহীন কোন কথা শ্রীজীবনকৃষ্ণ কখনও গ্রহণ করেননি। তিনি বলতেন, ধর্মেরও প্রমাণ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, চাঁদামামা সকলকার মামা। শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করে গেলেন যে, সত্যিই চাঁদামামা সকলকার। তখন তিনি হাওড়ার কদমতলা (ব্যাঁটরা) এলাকায় কেদারনাথ দেউটি লেনে থাকেন। কয়েকটি ছেলে কাছাকাছি একটি কারখানায় কাজ করে। পরে জানা গেছিল যে তারা কোনা থেকে আসে। যাতায়াতের পথে তারা রাস্তা থেকে জীবনকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে যায়। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে যখন তারা প্রণাম জানাচ্ছে, শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাদের ভিতরে ডাকলেন। সেদিন থেকে তারা প্রায়ই আসে, কখনও ধ্যান করে, কখনও পাঠ শুনে চলে যায়। ক্রমে তারা শ্রীজীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দর্শন করতে লাগল। নানা অনুভূতিলাভে তাদের জীবন ধন্য হল। আশ্বস্ত হলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। শাস্ত্রমতে যারা কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের নাকি আত্মিক স্ফুরণ হয় না। একথা যে সত্য নয়, প্রতিটি মানুষ যে ব্রহ্মত্ব বা একত্ব (abstract equality) লাভের অধিকারী এ-কথা জানবার জন্যই কঠোর পরিশ্রম করে যাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয় শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাদের কাছে ডেকেছিলেন— 'আয় বাবা, আয়'। একটি মেথর দু'বেলা কেদারনাথ দেউটি লেন পরিষ্কার করে যায়। একদিন (২০-৬-১৯৫৭) বেলা প্রায় তিনটে। কাজ সেরে মেথরটি ফিরে যাচ্ছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাকে ডেকে এনে কাছে বসালেন। দেখিয়ে দিলেন কী করে ধ্যান করতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ধ্যানে ডুবে গেল। ধ্যান ভাঙলে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ বাবা, কিছু দর্শন হলো?'

হ্যাঁ, দেখেছি।

কী দেখেছিস?

তার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বুঝিয়ে দিল, দেখেছি আপনাকে। আর, ওই যে— সে দেখিয়ে দিল ঘরে টাঙানো শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে। আর-আর-ওই যে-ওঁকেও দেখেছি। ঘরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে ঝুলছিল সারদা মায়ের ছবির একটি ক্যালেণ্ডার। সেটিও

চিহ্নিত হলো। রাস্তার ঝাড়ুদার, লোকচক্ষে হেয়, সাধারণতঃ অস্পৃশ্য, মানবব্রহ্ম শ্রীজীবনকৃষ্ণের অভিষেক হলো তারও অন্তরে। এমনি আরও কত ঘটনা। প্রায় প্রতিদিনই তাঁর ঘরে সাধারণ গৃহী মানুষের কত বিস্ময়কর অনুভূতির কথা শোনা যেত। অধিকারীভেদ, তথা লোক বাছাবাছি পরীক্ষানিরীক্ষা, বাধা-নিষেধ সমস্ত কিছুর মূল উৎপাটন ক'রে সকল মানুষকে সমানভাবে ডাক দিয়েছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ — 'আয় বাবা, আয়। তোর হিস্যে নিয়ে যা।'

অফিসের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তাঁর ঘর থেকে বেরোবার সুযোগ শ্রীজীবনকৃষ্ণ খুবই কম পেয়েছেন। কিন্তু সকালের দিকে একটু বেড়িয়ে আসার অভ্যাস তাঁর বরাবর ছিল। কারো আসার কথা না-থাকলে বা কেউ না-এলে তিনি বেরিয়ে পড়তেন। খুব হাঁটতে পারতেন তিনি। হাওড়া শহর এবং সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে বোধহয় এমন পথ খুব কম আছে যেখানে তাঁর পদচিহ্ন পড়েনি। কখনও কখনও কলকাতা বা অন্যান্য অঞ্চলেও বেড়াতে যেতেন।

এই বেড়ানো কতটা তাঁর নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে তা ঠিক জানা নেই। তবে আর একটি উদ্দেশ্যের কথা দৈবাৎ তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে। একদিন কথা-প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন— কদমতলার মোড়ে একদিন রতনকে (রতনচন্দ্র দাস) দেখলুম, মনে হলো, বাঃ, বেশ লোকটি তো। তার কয়েকদিন পরেই দেখি ও এসে হাজির। বেড়াতে যাবার প্রসঙ্গেই আর একদিন প্রকাশ পেলো— যেখান দিয়ে যাই যদি কারো হবার হয় আপনা থেকে হয়ে যাবে। কেবল যারা ঘরে এসেছে তাদেরকেই কাছে ডাকেন নি। যারা আসেনা, কিছু জানেনা, পথে পথে ঘুরে শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাদের উদ্দেশ্যেও ডাক দিয়ে বেড়িয়েছেন— 'আয় বাবা, আয়'!

বর-যাত্রী

একবার একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। বরযাত্রী হয়ে সারারাত ধরে আনন্দ করতে করতে চলেছি কত অজানা পথ দিয়ে। সঙ্গে চলেছেন অনাদি নামে একজন ভদ্রলোক। তিনিই আমাদের সকলকে নিয়ে চলেছেন। যাত্রার সমাপ্তি হোল বারাণসী ধামে এসে। বাস্তব জীবনেও বরযাত্রী হয়ে বারাণসী যাবার দুর্লভ সুযোগ এসেছিল। বর মানে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ভগবান,— যিনি সকল বিষয়ে সকলের চেয়ে বড়। সেই সুখ-স্মৃতি নিবেদন করা যাক।

১লা অক্টোবর, সোমবার, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ।

বেশ কিছু লোক সন্ধ্যার পর সমবেত হয়েছেন হাওড়া ষ্টেশনের নির্দিষ্ট প্লাটফর্মটিতে। আজ শ্রীজীবনকৃষ্ণ অনির্দিষ্টকালের জন্য সকলকে ছেড়ে চলেছেন। আপাততঃ তিনি কিছুদিন থাকবেন কাশীধামে, পরে অন্য কোথাও চলে যাবেন। আজ সকলের বিষণ্ণ বদন, কারো বা চোখ দুটি অশ্রুসজল। কোন কোন বাড়ীর মেয়েরা এসেছেন, সকলের অলক্ষ্যে থেকে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে একটু দর্শনের আশায়। তৃতীয় শ্রেণীর নির্দিষ্ট কামরায় বসে আছেন তিনি। তাঁর পরনে ধুতি ও পাঞ্জাবী, পায়ে জুতা। সকলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে। আজ সারাদিন অগণিত মানুষ এসেছে তাঁর কাছে। তবু ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। ষ্টেশনে এসেও সকলকে হাসিমুখে কাছে ডাকছেন, সকলের সঙ্গে কথা বলছেন। কথা প্রসঙ্গে বার বার ফিরে আসছেন তাঁর জীবন-সঙ্গীতের মূল সুরে— 'বাবা, ভগবান বাইরে কোথাও নেই, ভগবান তোর ভেতরে।' ক্রমশ ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এল। কিন্তু প্রাণের দেবতাকে বিদায় দিতে কার বা মন চায়! বিচ্ছেদের চরম সময়ে অনেকে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুহুর্মুহু সমাধিমগ্ন হতে লাগলেন। জয় রামকৃষ্ণ, জয় ঠাকুর, জয় জীবনকৃষ্ণ ধ্বনিতে মুখরিত হোল রেলওয়ে প্লাট ফর্ম্। ট্রেনটি ধীরে ধীরে গতি বাড়িয়ে এগিয়ে চলল গন্তব্য পথে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের অনুমতি পেয়ে তাঁর সঙ্গে চলেছেন আরও সাতজন। কেষ্ট মহারাজ, মৃত্যুঞ্জয় রায়, রঘুনাথ সেন, সৌরেন ভট্টাচার্য্য, কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন চট্টোপাধ্যায় ও সৌমেনবাবু। নবাগত সৌমেনবাবুর

এক নিকটাত্মীয়ের বাড়ীতে শ্রীজীবনকৃষ্ণের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এবার যারা সঙ্গে চলেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন বিবাহিত লোক আছেন। এটি এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

ট্রেনটি ষ্টেশন এলাকা ছেড়ে যাবার পর সকলে জিনিসপত্র একটু গুছিয়ে নিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণের সামনের সারিতে আশেপাশে নিবিড় হয়ে বসলেন। সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, দেখলি বাবা, এই হচ্ছে মায়ার রাজ্য। আর এক মায়ার বন্ধনের মধ্যে ঠাকুর ফেলেছিলেন। এদেরকে যে ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়নি, বলে, জানিয়ে আসতে পেরেছি এই ঠাকুরের অশেষ কৃপা। তারপর প্রবাহিত হলো ভাগবত কথার মন্দাকিনী ধারা।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, দেখ, আজ ৫০০ বছর ধরে ভগবান বাঙালী জাতকে কৃপা করে আসছেন। ৫০০ বছর আগে এই বাঙালীর ঘরে জন্মেছিলেন মহাপ্রভু। আবার ৫০০ বছর পরে এই বাঙলা দেশেই লীলা করলেন ঠাকুর। বাঙালীর ওপর ভগবানের কত কৃপা বলত! ট্রেনের গতির মতই আলোচনার ধারাও বিভিন্নমুখী হতে লাগল। আজ এক স্বর্গীয় আনন্দের বাহন হয়েছে ট্রেনের কামরাটি। বর্ধমানের কাছে আসতে গাড়ীর গতি মন্দীভূত হোল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ পকেট থেকে তিনটি টাকা বার করে মহারাজকে সীতাভোগ মিহিদানা আনতে বললেন। মাত্র দেড় টাকাতে দু চ্যাংড়া মিষ্টি পাওয়া গেল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ সকলকে এক রকম জোর করেই সীতাভোগ মিহিদানা খাওয়ালেন। বর্ধমান ষ্টেশন ছাড়লে তিনি বিছানায় এক প্রান্তে ঠেসান দিয়ে বসে রইলেন, নিজের জায়গাটি ছেড়ে দিলেন অপর সকলের শোবার জন্যে। রিজার্ভ সীটের কামরা। অনুরোধ উপরোধ করেও কোন ফল হোল না, শ্রীজীবনকৃষ্ণ অতন্দ্র প্রহরীর মত সারারাত জেগে বসে রইলেন। তাঁর কাছে শোনা শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে গেল। একদিন রাত্রে সেবক লাটু (পরে স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ঠাকুরের পদসেবা করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্নেহমাখা স্বরে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁরে লেটো, ভগবান কখন ঘুমোন বলত? লাটু বললেন, হামনে ক্যামনে জানবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ওরে লেটো, ভগবান কখনও ঘুমোন না রে। তাই তো আমরা সকলে ঘুমিয়ে বাঁচি!

ভোর প্রায় ছয়টার সময় একটি ষ্টেশনের কাছে এসে সিগনাল না পাওয়ায়

গাড়ী থেমে গেল। একাদিক্রমে প্রায় ৪০ মিনিট গাড়ী এখানে দাঁড়িয়ে রইল। শোনা গেল আমাদের আগের ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাবার জন্যই এই অবস্থা। পরে গাড়ী ছাড়ল বটে কিন্তু যত বেলা বাড়ে তত আরও দেরী হয়। নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় চার ঘণ্টা পরে, বেলা ১টা ৩৫ মিনিটে কাশীধামে এসে পৌঁছান গেল। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর তত্ত্বাবধানে সমস্ত জিনিস-পত্র নামিয়ে দু'খানি গাড়ী ভাড়া করা হোল। পথ দেখিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য একটি গাড়ীতে রইলেন সৌমেনবাবু, আর একটি গাড়ীতে রঘুনাথ ভাই। রঘুনাথ কয়েকবার কাশীতে এসেছেন এবং এখানে অনেকদিন কাটিয়ে গেছেন। তাই শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন—কাশী expert। রঘুনাথ ভাই নিজেই আর একটি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এই দলে ছিলেন মোট আটজন। রঘুনাথ ভাই নিজের সম্বন্ধে বলতেন আট পাগলের এক পাগল। ক্রমে দুটি গাড়ীই এসে পড়ল ২০৯ নং রামাপুরায় শ্রীনাথ ভবনে। উঁচু ভিতের উপর বাড়িটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। উঁচু রক। মাঝখান দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার সিঁড়ি। সিঁড়ির কোলে বড় দালান। দালানের ডানদিকে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। দোতলায় দু'খানি ঘরেই আপাততঃ সকলের থাকার ব্যবস্থা। পাশাপাশি দু'খানি প্রশস্ত ঘর। ঘর দুটির পূর্বদিকে লোহার রেলিং দেওয়া সুন্দর বারান্দা। ভিতরের দালান দিয়ে ও বাইরের বারান্দা দিয়ে ঘর দু'খানির মধ্যে যাতায়াত করা যায়। দালানের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে স্নানঘর, ও পরে রান্নাঘর। বাড়িটির পূর্ব দিকে রাস্তার পারে একটি ছোট মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন একটি ধর্মশালা। কিন্তু এই বাড়িতে এসে শ্রীজীবনকৃষ্ণ খুব আনন্দিত হতে পারলেন না। বাড়ীর একতলায় যারা থাকে তারা সংসারী মানুষ। মেয়েরা ওই দালান ব্যবহার করে। তাদের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করা শ্রীজীবনকৃষ্ণের আদৌ মনঃপূত নয়। নিবেদিত প্রাণ মৃত্যুঞ্জয়বাবু শ্রীজীবনকৃষ্ণের অসুবিধার কথা উপলব্ধি করে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে কথা বললেন। ঠিক হোল যে শ্রীজীবনকৃষ্ণের যাতায়াতের সময় মেয়েরা দালান থেকে সরে যাবেন। আপাততঃ একটি কঠিন বাধা অতিক্রম করা গেল। উত্তর প্রান্তের ঘরটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হোল। এবার ধোয়া মোছা ও পরিষ্কার করার পালা। সকলের আপ্রাণ চেষ্টায় বাড়ীর এই অংশটি এক নূতন শ্রীধারণ করল। ক্রমে স্নানাদি পর্ব শেষ হলে দোকান থেকে খাবার কিনে আনা হোল। সামান্য জলযোগেই সারাদিনের মত শ্রীজীবনকৃষ্ণের আহার শেষ হোল। তিনি একটু

স্থির হয়ে বসেছেন বিছানা পাতা চৌকির উপর। ঘরে দু'তিন জন লোক আছেন। এমন সময় কোথা হতে তিনটি ছোট বড় হনুমান তাঁর ঘরের উত্তরের জানালায় এসে হাজির হোল। হনুমান দর্শন মাত্র চক্ষের নিমেষে শ্রীজীবনকৃষ্ণের সমস্ত দেহ তোলপাড় করে মহাবায়ু জাগ্রত হয়ে উঠল। তাঁর বরবপু এক বিচিত্র রূপ ধারণ করল। তাঁর এই রকম অবস্থা আর কখনও দেখার সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু কি আশ্চর্য। হনুমানগুলিকে তাড়িয়ে দেওয়া হলে তিনি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন।

এই শিবভূমি কাশী। ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র বারাণসী। কাশী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শোনা যায় যে কাশ নামে এক রাজা এই নগরীর পত্তন করেন প্রায় ১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। আর, বরুণা এবং অসি নদীর সঙ্গম-স্থল বলে বারাণসী নামেও এই স্থানটি বিখ্যাত। রামায়ণে, মহাভারতে বৌদ্ধ-জাতকে, জৈন ধর্মগ্রন্থে বারাণসীর উল্লেখ আছে। সপ্তম শতাব্দীতে চীন দেশের পরিব্রাজক হিউ-এন্-সাঙ্ ভারত পরিক্রমায় বারাণসীতে এসেছিলেন। তিনি এখানে দেখেছিলেন ৩০টি বৌদ্ধ বিহার, ৩০০০ ভিক্ষু এবং ১০০টি হিন্দু মন্দির। এখন এখানে দেড় হাজারের বেশী মন্দির আছে এবং গঙ্গাতীরে আছে প্রায় আশিটি স্নানের ঘাট। যুগে যুগে জ্ঞানী-গুণী সাধু সন্ত সমাগমে বারাণসীর ধুলিকণা পবিত্র হয়ে আছে। এখানে এসেছেন বুদ্ধদেব, এসেছেন মহাবীর, এসেছেন শঙ্কারাচার্য, গুরু নানক, এসেছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। প্রায় শতবর্ষ আগে এখানে এসেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। পুণ্য বারাণসীধামে মহামানবের আগমনধারা অক্ষুণ্ণ হয়ে রইল শ্রীজীবনকৃষ্ণের শুভাগমনে। একদিন হাওড়ায় কেদার দেউটি লেনের ঘরখানিতে তিনি বলেছিলেন, দেখ্, গঙ্গায় কেউ স্নান করে নিজে পবিত্র হবার জন্য, আবার কেউ স্নান করে গঙ্গার জলকে পবিত্র করার জন্য। বারাণসী তীর্থভূমির মহিমা অম্লান উজ্জ্বল রাখার জন্যই যেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ এখানে আগমন করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে এর আগেও শ্রীজীবনকৃষ্ণ একবার কাশীধামে এসেছিলেন। মাণিক্য পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা হতে তাঁর নিজের কথার পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে— '১৯২৬ সালে যখন কাশী যাই তখন একদিন মাত্র বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়েছিলুম। কচুরী গলির ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। খুব ভীড়

ছিল। তাই আর কখনও মন্দিরের দিকে পা বাড়াই নি। তবু দেখতুম যখনই বেরোতুম, আপনা হতেই জপ হোত। অহল্যাবাই ঘাটে ধ্যান করতে বসতুম। মন আপনা থেকে হু-হু করে উঠে যেত। খুব ধ্যান হোত। তখনই বুঝেছিলুম যে স্থান মাহাত্ম্য আছে।'

শ্রীজীবনকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে অনেকে বিকালের দিকে একটু বেড়াতে বেরোলেন। ক্রমে দিবা অবসান হোল। মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির মাঙ্গলিক ধ্বনিতে বারাণসী মুখরিত হোল। শ্রীজীবনকৃষ্ণের নির্দেশে যথারীতি পাঠ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবন নাট্যের আর একটি অঙ্কের যবনিকা উত্তোলন হোল। এবার নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গসুখ উপভোগ এবং তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী সুধা পান। যৌবনে যখন মহামানবদের জীবনী পড়ার সুযোগ হয়েছিল তখন যারা তাঁদের নিরন্তর সঙ্গ করেছেন— অন্তরঙ্গ— তাদের কথাই বেশী করে মনে পড়ত। তারা মহামানবের কাছে কাছে থেকেছেন, তাঁদের সেবা করেছেন, অহোরাত্র তাঁদের অমৃতময়ী বাণী শুনেছেন, না জানি তারা কত ভাগ্যবান। তাই যখন সেই সৌভাগ্য এল একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তখন মনে হোল— একি স্বপ্ন, না সত্য? তাঁর কৃপায় এক অভাজন স্থান পায় তাঁর চরণতলে, তাঁর প্রবাসলীলায়। মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের গান ঃ—

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে।

রাত্রি সোয়া আটটার পর পাঠ শেষ হোল, এক নূতন পরিবেশে শ্রীজীবনকৃষ্ণ সান্নিধ্যে ভজনানন্দের পর ভোজনের জন্য আবার বাইরে বেরোতে হবে, কাশী ভ্রমণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোল যে এবার রান্নার কোন আয়োজন ছিল না, মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার কাশী, এখানে অন্নের অভাব নেই। প্রচুর হোটেল, খাবারের দোকান, ভাত, রুটি, পুরি, লুচি, মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি—যার যেমন অভিরুচি, যার যেমন সামর্থ্য, যার যেমন ইচ্ছা। শ্রীজীবনকৃষ্ণের জন্যও আলাদা কোন ব্যবস্থা করতে তিনি দেন নি। এমন কি দুবেলা চায়ের জন্য তাঁর নির্দেশে জামার পকেট থেকে পয়সা নিয়ে রাস্তার দোকান থেকেই চা কিনে আনা হয়েছে, মহানন্দে তাই তিনি

গ্রহণ করেছেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রায়ই বলতেন—ওরে আমি তোদের মতই একজন সাধারণ মানুষ, সামান্য, নগণ্য আমি। শুধু মুখের কথায় নয়, ব্যবহারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে প্রমাণ তিনি রেখে গিয়েছেন।

এক নূতন আনন্দে, অনাস্বাদিত মাধুর্যে প্রথম দিনটি অতিবাহিত হোল। পরদিন বুধবার, তেসরা অক্টোবর, ১৯৫৬। ভোর রাত্রে শ্রীজীবনকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল, বারাণসী তখনও নিদ্রামগনা, আকাশ অন্ধকার। দূর হতে পাখীর কল-গীতিতে ভেসে আসছে ঊষার আগমনী সঙ্গীত, পূবদিকের বারান্দা দিয়ে তাঁর ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁর ঘরের পশ্চিম দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি দেবীর দুইটি ক্যালাণ্ডারের ছবি টাঙ্গান হয়েছিল। সেই ছবি দুটির কাছে গিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণ হাত তুলে নাচছেন আর বলছেন— জয় ঠাকুর, জয় মা, জয় ঠাকুর, জয় মা! নাচের ভঙ্গী বিচিত্র। দু'পায়ের গোড়ালী তুলে আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দু'হাত তুলে নৃত্য। নৃত্যের পর প্রণাম, ছবির পা দুখানিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম। কী প্রাণঢালা আত্মনিবেদন। প্রণামের সঙ্গে যেন তাঁর সমস্ত সত্ত্বাকে নিবেদন করছেন ঠাকুরের শ্রীচরণে, এমনিভাবে কয়েকবার। শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা শেষ হলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। খাটে বসিয়ে ধ্যান করতে বললেন। তিনিও ধ্যান শুরু করলেন। ধ্যানে কিছু দর্শন হোল না, কিন্তু অনুভব করলাম ধীরে ধীরে জৈবী অস্তিত্ব লোপ পাচ্ছে। হাত নেই, পা নেই, কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেই, কিছু নেই। শুধু আছে একটু বোধমাত্র। এই বোধটুকু যেন অসীম আনন্দলোকে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেদিন বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম যে শ্রীজীবনকৃষ্ণ-সান্নিধ্যই হচ্ছে স্বর্গ এবং তাঁর পূত সঙ্গে যে আনন্দানুভূতি তাই স্বর্গসুখ।

ধ্যান ভাঙ্গলে সকলকে ঘরে ডাকা হোল, শ্রীজীবনকৃষ্ণ নিজে কথামৃত পাঠ শুরু করে অপরকে পড়তে দিলেন। প্রায় সোয়া ছ'টা পর্যন্ত পাঠ চলল। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সারা হলে ভ্রমণের পালা। সকলে একসঙ্গে বেড়াতে গেলে কাজের অসুবিধা হবে, তাই পালা করে দুজন বাড়ীতে থাকতেন। তারা ঘর ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিপাটি করে ঘরগুলি গুছিয়ে রাখতেন। আজ মহালয়া। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ও অপর সকলে গঙ্গাস্নান সেরে

ঁবিশ্বনাথ দর্শনে গেলেন। ফিরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি পাঠ চলল বেলা প্রায় দশটা পর্যন্ত, তারপর মধ্যাহ্ন আহারের বিরতি। কেষ্ট মহারাজ ও আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণ চললেন 'বেনারস লজ' নামে এক হোটেলে, পথে এক ভাঁড় করে দই কেনা হল, হোটেলের খাবার খুব ভাল নয়, কোন রকমে খাওয়া চলে এই মাত্র। ইতস্ততঃ না করে শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেই অন্নই গ্রহণ করলেন। সাধারণ মানুষের মতই খাওয়া তাঁর। কেবল এক টুকরো করে মাছ অতিরিক্ত নেওয়া হয়েছিল। খাওয়া শেষ হলে সকলে নিজের নিজের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলেন। এর পর বেলা প্রায় ২।৷ টা পর্যন্ত বিশ্রাম। কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণ একটানা এতক্ষণ বিশ্রাম করতেন না। একটু বিশ্রাম করে অবশিষ্ট সময় তিনি ধ্যান করে কাটাতেন। বিকালে পাঠ শেষ হলে তিনি আর বেড়াতে বেরোতেন না, কিন্তু অপর সকলকেই বেড়াতে যেতে বললেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংসারী ছিলেন না। কিন্তু সংসারী মানুষের কাছে তিনি ছিলেন এক আদর্শ পুরুষ। সন্ধ্যায় বেড়িয়ে ফিরলে তাঁর কাছে বিবরণ দিতে হোত— কোথা দিয়ে কি ভাবে বেড়িয়ে আসা হোল। শুনে হয়ত বলতেন— ওঃ, ওখানে গিয়েছিলি, বাঃ বেশ হয়েছে! তাঁর এই আনন্দ উচ্ছ্বাসে বিকালের বেড়ানটাও আনন্দময় হয়ে উঠত। সকলের দিকে সমান নজর। নৈশ আহার শেষ করে এসে প্রত্যেককে তাঁর কাছে খাওয়ার পূর্ণ বিবরণ দিতে হোত। কোথায় খাওয়া হোল— কেমন দোকান— কি খেলি? রুটি? বেশ বেশ। ক'খানা রুটি খেলি? ওমা! মোটে চারখানা— ওতে কি হবে রে? কাল খাওয়া আর একটু বাড়াবি। মাংস খেয়েছিস? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত বিবরণ দিতে হোত। তবে সেদিনের মত সবার ছুটি। সন্তানের কাছ থেকে সব খবর নেওয়ার জন্য বাবা মা কি প্রতিদিন এইভাবে প্রতীক্ষা করেন? কাশীতে শ্রীজীবনকৃষ্ণ এক অভিনব সংসার পেতেছিলেন— কিছুই নেই অথচ সবই আছে!

৪ঠা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রে স্বপ্নে দর্শন হোল— বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গের ভিতর থেকে উদয় হলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ, পরণে ধুতিপাঞ্জাবী। স্বপ্নটি নিবেদন করা হলে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন— কাশী আসার ফল পেলি।

আজ সকালে অসি নদীর সঙ্গমস্থান পর্যন্ত বেড়াতে যাওয়া হোল। শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গে চলেছেন কেষ্ট মহারাজ, সৌরেন, সৌমেনবাবু ও আরও কয়েকজন, ইতিমধ্যে প্রভাতের স্নিগ্ধ মধুর বাতাস প্রখর হয়ে উঠেছে। চোখে মুখে রৌদ্র লেগে শ্রীজীবনকৃষ্ণের কষ্ট হচ্ছে দেখে একজন তাঁর মাথায় ছাতা ধরলেন। অমনি তিনি প্রতিবাদ করে উঠলেন, তাঁর নির্দেশে ছাতা বন্ধ করতে হোল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, মথুরবাবু যখন কাশীতে এসেছিলেন তখন পাইক বরকন্দাজরা তাঁর মাথায় ছাতা ধরত। তিনি এখানে রাজার মত থাকতেন। তা বাবা, তোরা যে আমাকে রাজা মহারাজা করে তুলতে চাস। একথা বলেই মৃদু হাস্যে পরিবেশটিকে হালকা করে দিলেন। আজ কথাপ্রসঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, ওরাই কোন রকমে এই কৃষ্টিটুকু এখনও বজায় রেখেছে।

৫ই অক্টোবর সকালে বেড়াতে বেরিয়ে কয়েকজনের ইচ্ছা হোল আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যাওয়া যাক। শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেন, বললেন— ওদের (মঠের স্বামীজীদের) সঙ্গে দেখা হলে ওদের যে সব টেনে নেব রে। কিন্তু সকলের আগ্রহ দেখে তিনি রাজী হলেন। সকলকে একটি করে টাকা প্রণামী দিতে বললেন, নিজেও পকেট থেকে একটি টাকা বার করে দিলেন। মঠের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার আগে প্রধান ফটকের দুটি থামেই মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। মঠের উত্তরপূর্ব দিকের পথ ধরে মন্দিরে আসা হোল, মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির কাছে আসামাত্র শ্রীজীবনকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে ভাবাবস্থা প্রকাশ পেল, কম্পমান বরতনু কোন রকমে সিঁড়ি কয়টি অতিক্রম করে আসার পরই, ভূলুণ্ঠিত প্রণতি। উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের নয়নাভিরাম মূর্তি, নীচে প্রণাম শয়ানে শ্রীজীবনকৃষ্ণ। পিছনের পা দুটি তোলা অবস্থায় হাত দুটিও করজোড়ে নমস্কার নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে সমাধি। প্রণাম নিবেদনের এই অপরূপ দৃশ্যটি কখনও ভোলার নয়। ফেরার সময় দেখা গেল দালানে দুর্গা প্রতিমা রঙ করা হচ্ছে। স্বামীজীরা দূরে আছেন, বড় বড় হাঁড়ি কড়ার বিলি বন্দোবস্ত করছেন, কেউ কিছু বুঝতেও পারলেন না, জানতেও পারলেন না। শ্রীজীবনকৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হোল।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের খাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে দেখে গতকাল বিকাল থেকে মৃত্যুঞ্জয়বাবু ও রঘুনাথ ভাই ভাল হোটেলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আজ সকালে বেড়িয়ে আসার পর যখন শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি পাঠ চলছে তখন রঘুনাথ ভাই ফিরে এসে এক আনন্দ সংবাদ জানাল। বীরেশ্বর পাঁড়ের ধর্মশালা সংলগ্ন হোটেলে আজ থেকে খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। স্পেশাল খাবার, লোক পিছু দু-টাকা। বীরেশ্বর পাঁড়ে ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু, সুসাহিত্যিক এবং শিক্ষাব্রতী (১৮৪২-১৯১১)। তাঁর নামাঙ্কিত এই ভোজনশালাটি পরিচালনা করেন তার এক প্রপৌত্র। এখানে খাবার সুব্যবস্থা হবে এই আশায় সকলে আনন্দিত হলেন। পাঠ শেষ হলে স্নানাদি সেরে যথাসময়ে খেতে যাবার জন্য শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রস্তুত হলেন। কিন্তু যখন শুনলেন যে আজ প্রথম দিন বলে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করতে আরো আধ ঘণ্টা দেরী হবে তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং কারো কোন কথায় কর্ণপাত না করে আজও বেনারস লজে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করে এলেন। অপ্রত্যাশিত এই পরিস্থিতিতে সকলের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। আগে থেকে ব্যবস্থা করা আছে বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েকজনকে যেতে হোল ধর্মশালা সংলগ্ন ওই হোটেলে, এখানেও আর এক বিস্ময়। হোটেল পরিচালকটি বয়সে তরুণ, সুদর্শন, বিনয় নম্র তার ব্যবহার। দেখা গেল ভালভাবে খাওয়াবার ব্যাপারে তার আন্তরিকতার অভাব নেই। রান্নাগুলিও বেশ সুস্বাদু। হৃষ্টচিত্তে ভোজন পর্ব সমাধা করে শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে সমস্ত বিবরণ নিবেদন করা হোল, সব শুনে তিনি পরদিন থেকে ওখানে যেতে রাজী হলেন। রঘুনাথ ভাইয়ের বুক থেকে যেন একটা ভারী পাথর সরে গেল। পরিবেশ আবার আগের মত আনন্দোচ্ছল হয়ে উঠল।

৬ই অক্টোবর শনিবার সকালে ঠিক হোল যে আজ বরুণা নদীর সঙ্গমস্থান পর্যন্ত বেড়াতে যাওয়া হবে, পায়ে হেঁটে চলা সুরু হয়ে গেল। চকের ধার দিয়ে যাবার সময় বিশ্বনাথের মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরীর কথা উঠল, অনেকে হয়ত জানেন যে পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বিধ্বস্ত হয়। পুরাতন মন্দিরের গায়েই

গড়ে ওঠে একটি নূতন মসজিদ। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রাণী অহল্যাবাই আবার একটি নূতন মন্দির তৈরী করে দেন এবং বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গটি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের স্বর্ণচূড়াটির জন্য অর্থদান করেন মহারাজা রণজিৎ সিংহ। যখন এইসব কথা উঠল তখন মন্দিরের কাছাকাছি রাস্তা দিয়েই যাওয়া হচ্ছিল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ আগ্রহ প্রকাশ করায় পুরাতন মন্দির প্রাঙ্গণে আসা হোল। পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, রত্নবেদী, মসজিদ, নূতন মন্দির সবই ওই জায়গা থেকে ভালভাবে দেখা যায়। দেখতে দেখতে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হলেন। বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বলছেন জয়— মহম্মদ। জয় বিশ্বনাথ! জয় ঠাকুর! আর ক্ষণে ক্ষণে তিনি ভাবসমাধিতে মগ্ন হচ্ছেন। সে এক অপূর্ব-দৃশ্য, অপূর্ব-পরিবেশ, শ্রীজীবনকৃষ্ণের কণ্ঠে একসঙ্গে — বিশ্বনাথের ঠাকুরের, ও মহম্মদের জয়ধ্বনি শুনে বলতে ইচ্ছা হোল— হে ভগবান তোমারই জয়— তোমারই জয়।

কিছুক্ষণ পরে আবার পদযাত্রা শুরু হয়ে গেল। ক্রমে গঙ্গানদীর মূল সেতুটির কাছে আসা হোল। বড় সেতুটিতে ওঠার আগে আর একটি ছোট সেতুর উপরে উঠতে হয়। রঘুনাথভাই এবার সানন্দে ঘোষণা করলেন— এই পোলটির নীচেই বরুণা নদী। সকলে বরুণা নদী দেখার আগ্রহে নীচের দিকে চেয়ে চেয়ে পোলে উঠছেন। কিন্তু নদী কই! প্রথমে দেখা গেল সারি দেওয়া ল্যাম্প পোষ্টের চূড়া, পরে ল্যাম্প ফিট করা ব্র্যাকেটগুলি, পরে গোটা ল্যাম্প পোষ্টগুলি এবং সব শেষে নীচে পীচের রাস্তা। বরুণা নদী কোথায়? রঘুনাথ ভাই ভুলে গেছেন যে বরুণা নদী সেতুর এপারে নয়, ওপারে। হাস্য পরিহাসের এই দুর্লভ সুযোগ কেউ হারাতে রাজী নয়। সকলের সঙ্গে রঙ্গনাথ শ্রীজীবনকৃষ্ণও যোগ দিলেন। তারপর বড় পোলটির মাঝখানে আসা হোল। এখান থেকে কাশীর দৃশ্য বড় নয়নাভিরাম, অসংখ্য মন্দির, ঘাট, গম্বুজ, মিনার; প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে গঙ্গার জলে তার প্রতিবিম্ব। যেন এক মায়াময় স্বপ্নপুরী। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির যেন এক প্রস্ফুটিত পুষ্প। এই নয়নবিমোহন দৃশ্যাবলি দেখতে দেখতে শ্রীজীবনকৃষ্ণ সমাধিমগ্ন হলেন, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে তিনি সূর্য-প্রণাম করে ফেরার পথে পা বাড়ালেন! এবার বাসে করে ফেরা হোল। শ্রীজীবনকৃষ্ণই সকলের ভাড়া দিলেন।

গতকাল ক্ষিতীশবাবুর দাদা জ্যোতিষ বাবু এবং তাঁর সঙ্গে নীরোদ ও বরাট নামে দুই ভদ্রলোক এসেছেন এলাহাবাদ থেকে, আজ বিকালে তাঁরা চলে যাবেন। আজ সকালে ক্ষিতীশবাবুও এসেছেন। সকলের খাবার ব্যবস্থা হোল বীরেশ্বর পাঁড়ের ধর্মশালা সংলগ্ন ওই হোটেলে। যথাসময়ে আজ শ্রীজীবনকৃষ্ণও সকলের সঙ্গে সেখানে খেতে গেলেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ও আপ্যায়নে সকলেই খুব খুশী হলেন। যে যুবকটি হোটেলটি পরিচালনা করেন তাঁকে ডেকে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভোজন কক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি রাখতে বললেন।

দেখতে দেখতে মহাসপ্তমীর দিন এসে গেল— ১১ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার। শ্রীজীবনকৃষ্ণ অদর্শনে কাতর বহু লোক ঠিক করেছেন এবার পূজার ছুটির কয়েকটি দিন তাঁরা কাশীধামে শ্রীজীবনকৃষ্ণ সঙ্গে কাটাবেন। গতকাল হাওড়া থেকে এসেছেন গণেশ, অজিত, জলধর, সন্তোষ গুছাইত। তাঁদের ষ্টেশন থেকে আনবার জন্য কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রেন অনেকক্ষণ লেট ছিল। তাদের আসতে দেরী হচ্ছে দেখে জীবনকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তারা আসতে তিনি শান্ত হলেন। আজ কলকাতা থেকে বহু ভক্ত আসছেন। রঘুনাথ ভাই ও সৌরেনকে ষ্টেশনে যেতে নির্দেশ দিলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। নিজেও যাবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু সকলের ইচ্ছানুসারে তিনি স্টেশনে না গিয়ে কেষ্ট মহারাজ ও আর একজনকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন। অদ্বৈত আশ্রম ও থিয়সফিকাল সোসাইটির পথ ধরে ক্রমাগত পশ্চিমের পথ ধরে চলতে লাগলেন। পথিমধ্যে কত কথা, কত আলোচনা। মানুষের দেহের মধ্যে ভগবান-একথা যখন সে জানবে তখনই সর্ববিধ বন্ধন থেকে তার মুক্তি। কথা বলতে বলতে রেল লাইনের কাছে তিনি এসে পড়লেন। নিজেই খোঁজ নিলেন বেনারস স্টেশন কত দূর? যখন শুনলেন যে পায়ে হাঁটা পথে মাত্র মাইল দেড়েক দূর আর ট্রেন আসার নির্দিষ্ট সময়ের আরও ৩৫ মিনিট বাকী তখন ধরে বসলেন ষ্টেশনেই যাবেন— রেল লাইনের পথ ধরে। ''আহা ওরা আসছে কত কষ্ট করে, হঠাৎ যদি আমাদের ষ্টেশনে দেখতে পায় ওদের কত আনন্দ হবে বলত''। শ্রীজীবনকৃষ্ণের ইচ্ছা! 'না' বলে কার সাধ্য? সবাই আনন্দ পাবে তার

জন্য শত কষ্ট স্বীকার করতেও রাজী। চললেন লাইন ধরে—বৃষ্টিতে পিছল পথে। কোথাও কাদা জল, কোথাও বা নানা আবর্জনা, কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সেই অবস্থাতেই কথা বলতে বলতে চলেছেন দৃষ্টি কেবল সামনের দিকে। ষ্টেশনের কাছে যখন এসেছেন তখন ঘামে গায়ের পাঞ্জাবীটা ভিজে গেছে। কিন্তু এখানে এসে হতাশ হতে হোল। গাড়ী আজও লেট; বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ ট্রেন পৌঁছবার সম্ভাবনা। এই অবস্থায় অপেক্ষা করা নিরর্থক। তাই বাসে করে তিনি বাড়ী ফিরে এলেন, অধীর আগ্রহে সকলের আগমনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন, ট্রেন-যাত্রীরা শ্রীনাথ ভবনে এসে পৌঁছলেন বেলা ১১টায়। এলেন সুধীনবাবু, অনাথ, অরুণ, গোপাল, জ্যোতির্ময়, দিলীপ, মুরারী, ধীরেন (বনগাঁ), হীরু বাবু, বিমলবাবু এবং আরো অনেকে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এতদিন অদর্শনের গোপন ব্যথা আজ আর কোন বাধা মানে না। তাঁরা কাঁদেন, শ্রীজীবনকৃষ্ণের চোখেও জল, বেদানার্ত কণ্ঠে তিনি বললেন— ওরে তোদের সকলকে ছেড়ে আমি এতদিন কি করে ছিলুম রে!

আমার পণ্ডিতমশাই

গাছের পাতাটি নড়ে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছা— বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর, শনিবার অপরাহ্ন। হাওড়া, কদমতলার কেদার দেউটি লেনে, শ্রীজীবনকৃষ্ণের জনাকীর্ণ ঘরখানিতে সত্যান্বেষী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়ের শুভাগমন হ'ল। নিঃসন্দেহে সেও শ্রীজীবনকৃষ্ণের ইচ্ছায়, তাঁরই প্রয়োজনে।

প্রায় দেড় বছর আগে, তেসরা জুন, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ, মঙ্গলবার, শ্রীজীবনকৃষ্ণ অত্যন্ত আকস্মিকভাবে কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। সন্ধ্যার পর থেকে প্রায় বেহুঁশ হয়ে রইলেন। সারা রাত ওইভাবেই কাটল। কেউ তখন বুঝতে পারলেন না যে শ্রীজীবনকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবনে একটি নূতন অধ্যায় জন্মলাভ করতে চলেছে। পরের দিন, অর্থাৎ চৌঠা জুন বিকাল থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া গেল। সে দিন তিনি যেন আবহমানকালের সমস্ত সংস্কারের ব্যাধি থেকে মুক্ত, স্বরূপ প্রকাশোন্মুখ, শুচিস্নাত এক নবজাতক। দ্বিধা এবং সঙ্কোচের আবরণ দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজেই উদঘাটিত করলেন তাঁর ব্রহ্মত্বের স্বরূপ। যে আসে তাকেই তিনি প্রশ্ন করেন, হ্যাঁরে তোরা ভজিস রামকৃষ্ণ, কিন্তু দেখিস জীবনকৃষ্ণ। কেন? এর কারণ কি? পাঁচই জুন বৃহস্পতিবার আরও পরিষ্কারভাবে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন,— দেখ্, আমরা পড়ি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, আলোচনা করি তাঁরই জীবনী। তাঁরই কথার যৌগিক ব্যাখ্যা করি। আর সবার মধ্যে রয়েছে একটা basic unity,— আমরা সকলে তাঁর ভক্ত, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। না, না, ভক্ত বলব না— ওতে অহঙ্কার হয়। আমরা সকলে তাঁর দাসানুদাস। কিন্তু তাঁকে না দেখে তোরা (স্বপ্নে, ধ্যানে) আমাকে দেখিস কেন? কিছুদিন পরে প্রশ্নের প্রথম অংশটি তিনি বাদ দিলেন। বললেন, আচ্ছা 'ভজিস রামকৃষ্ণ'— এ কথাটা না হয় বাদ দে, কিন্তু আমাকে কেন দেখিস? জগতে আর কি কোন লোক নেই? সকলেই নিরুত্তর! এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে?

প্রশ্ন করে নিবৃত্ত হবার মানুষ ছিলেন না শ্রীজীবনকৃষ্ণ। জগতের প্রচলিত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় কি না, তিনি নিজেই দেখতে শুরু করলেন। এর আগে ধর্মগ্রন্থ তিনি বড় একটা পড়তেন না। এখন নিত্য নূতন ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে দেশের অনেক প্রাজ্ঞব্যক্তিরও সমাগম হতে লাগল। কিন্তু সংখ্যাতীত মানুষ— বালক বালিকা, পুরুষ নারী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা কেন যে তাঁকে বাস্তবে চাক্ষুষ দেখে বা না দেখে, তাঁর কথা শুনে বা না শুনে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে বাইরে দেখে তার কোন কারণ কেউ দেখাতে পারলেন না, বা কোথাও পাওয়াও গেল না। যত দিন যায় তাঁকে দেখতে পাওয়া মানুষের সংখ্যা তত বেড়ে চলে। তারই সঙ্গে বেড়ে চলে তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাবার উদগ্র ইচ্ছা— এত অসংখ্য মানুষ তাঁকে দেখছে এর কারণ কি? দেখতে দেখতে দেড় বছর কেটে গেল। তাঁর ঘরে এলেন ধীরেন্দ্রনাথ। আসার ঠিক দশ দিন আগে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণকে। তখন অজানা এক মানুষরূপে, তাঁর হাত ধরে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। ইঙ্গিত করছেন কেবল তাঁরই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে।

অকৃতদার ধীরেন্দ্রনাথ এলেন তাঁর অধীত বিদ্যার পশরা নিয়ে। কালে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন— আমার পণ্ডিতমশাই। ছোট খাট মানুষটি। সাদাসিধে তাঁর বেশভূষা, যেমন বিনয়ী তেমন মধুর তাঁর কথাবার্তা। দেখলে বোঝা যায় না যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের পদস্থ এক অফিসার, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে মহাপ্রাণ এক সুধী ও সাধক। ধীরেন্দ্রনাথকে কাছে পেয়ে উৎসাহিত হলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। ঘরের আলোচনা এক নূতন ধারায় উজ্জীবিত হয়ে উঠল। শুধু আলোচনা নয়, এক এক দিন তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন স্বপ্নে তাঁর সুদুর্লভ অনুভূতির বিচিত্র কাহিনী। আলোচনা আর অনুভূতির কাহিনীতে শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরখানি নন্দিত হয়ে ওঠে।

ধীরেন্দ্রনাথের বিয়োগমথিত স্মৃতির পথ ধরে মন সেই আনন্দমধুর দিনগুলিতে আবার ফিরে যেতে চায়। ধীরেন্দ্রনাথের আগমন কিভাবে শ্রীজীবনকৃষ্ণের স্বরূপ উন্মোচন-সহায়ক হয়েছিল এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তারই কিছু আলোচনা করা যাক।

৫ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার, ১৯৬০। ধীরেনদার একটি স্বপ্ন নিবেদন করলেন

স্বয়ং শ্রীজীবনকৃষ্ণ— ধীরেন একটা স্বপ্ন দেখেছে। ওঃ কি স্বপ্নই দেখেছে। সবটা বলে কি হবে? জিষ্টাই (সারাংশ) বলি— এযাবৎ মানুষের ভগবান দর্শন হয়েছে, কিন্তু মানুষ কখনও ভগবান হয়নি। এই প্রথম মানুষ ভগবান হয়েছে। আমিই ওকে একথা বলছি। কেন বল দেখি? অন্য কেউ তো বলতে পারতো। না রে, একথা বলার অধিকার আর কারো হয় নি যে!

২৮শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, ১৯৬০, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি। আজ কথামৃতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন— জীবন্মুক্ত অবস্থায় মানুষ কী করে? পাখীর বাসা যদি পুড়ে যায় পাখী কী করে? (একটু থামিয়া) ওরে পেয়েছিরে, পেয়েছিরে, পেয়েছি! একেই তো বলে বিদেহ-মুক্তি। ব্যষ্টিতে আমি হলুম জীবন্মুক্ত, সমষ্টিতে হ'ল বিদেহ-মুক্তি। এই বিদেহ-মুক্ত অবস্থার জন্যেই তোরা আমায় দেখতে পাস।

ধীরেনদা— পুরাণকার তাই বিদেহ-রাজ জনকের কথা বলে গেছেন। জনক অর্থাৎ স্রষ্টা, যিনি নিজেকে সৃষ্টি করেন। যেমন, আপনি নিজেকে আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করছেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— ওরে হ্যাঁ, তাই তো! বিদেহরাজ জনক! তা বাবা, আমি তো এসব জানি না। তবে এইটুকু বলা যায় যে ওদের কল্পনা এখানে ফুটে উঠেছে। তোদেরকে চারটে প্রশ্ন করেছিলুম মনে আছে? তার মধ্যে একটা হচ্ছে কেন তোরা আমাকে দেখিস। আজ সেই 'কেন'র উত্তর পাওয়া গেল। আমার বিদেহ-মুক্ত অবস্থা তাই তোরা আমাকে দেখিস। আজ ঠাকুরের জন্মতিথি। আজ কি জিনিষ পাওয়া গেল রে!

১৩ই মার্চ, রবিবার, ১৯৬০, আজ দোলযাত্রা। আজ ধীরেনদার একটি স্বপ্ন-কাহিনী শুনে মন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মনে হল এই শুভদিনে ধীরেনদার স্বপ্ন দিয়ে সকলের মন নতুন করে বুঝি রাঙিয়ে দিলেন স্বপ্নেশ্বরনাথ শ্রীজীবনকৃষ্ণ। স্বপ্নটি এই—

তিনি একটি তীর্থক্ষেত্রে গিয়েছেন। সেই তীর্থক্ষেত্রের প্রবেশপথের সামনে একটি সাধু শুয়ে আছেন। সাধুটি ধীরেনদাকে বললেন— 'কেঁও তোম্ ঘমণ্ড করতা হ্যায়? কেঁও তোম্ অখণ্ড়কো খণ্ড করতা হ্যায়? সব রাম হ্যায়।' ধীরেনদা তীর্থক্ষেত্রের ভিতরে প্রবেশ করলেন। চতুর্দোলার

মত সব রয়েছে। তারই মধ্যে দোকান ইত্যাদি। ধীরেনদা দেখলেন— সেই মেলায় দোকানী হচ্ছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ, খরিদ্দার শ্রীজীবনকৃষ্ণ, পূজারী শ্রীজীবনকৃষ্ণ, দেবতাও শ্রীজীবনকৃষ্ণ। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ছাড়া কোথাও কেউ নেই। মেলা দেখে ধীরেনদা ফিরছেন। দেখলেন সেই যে সাধুটি শুয়ে ছিলেন তাঁর প্রতি লোমকূপে শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

স্বপ্নের কথা শুনে মাথা নত হয়ে এল। মনে মনে বললাম— ধন্য ধীরেনদা, সার্থক জন্ম তোমার। তোমাকে অসংখ্য প্রণাম!

১৯শে মে, বৃহস্পতিবার, ১৯৬০।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, আমি ঋষি দেখেছি। ই-য়া তার বুকের ছাতি। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি— তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে? সে বললে— না। তারপরই দেখছি এক পণ্ডিতকে। তাকেও জিজ্ঞাসা করলুম— তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে? সে বললে— না। সেই বনের পথ ধরেই এগিয়ে চলেছি। রাজবাড়ীতে পৌঁছালুম। কিন্তু রাজাকে দেখতে পেলুম না। ঘুম ভেঙে গেল। আচ্ছা, রাজাকে কেন দেখলুম না, তোরা কেউ বলতে পারিস?

ধীরেনদা— কেমন করে আর দেখবেন? আপনিই যে রাজা!

শ্রীজীবনকৃষ্ণ (চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে)— আমিই রাজা! ছেঁড়া কাপড় গুলো কোথায় গেল? সে গুলো ধোপার বাড়ী দিয়েছি। খাই পরের বাড়ীতে .....। আমি রাজা!

২৯শে মে, রবিবার, ১৯৬০।

আজ শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁর রঙ্গময়ী মায়ামূর্তি দর্শনের বিবরণ দিলেন—

একটি বারান্দা। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। একটি ১১/১২ বছরের মেয়ে (বলরাম বসুর কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণময়ী যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন করেছিলেন) শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অর্দ্ধবৃত্তাকার পথে বেষ্টন করে রঙ্গ করছে। ছুটাছুটি করে কখনও আঙ্গুল মট্‌কাচ্ছে। কখনও করছে নানা রকম ভ্রূ-ভঙ্গী। নানা ভাবে রঙ্গ করছে বলেই শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁর এই দর্শনকে রঙ্গময়ী মায়ামূর্তি দর্শন বলেছেন।

ধীরেনদা তখন ঘরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণের রঙ্গময়ী মায়ামূর্তি দর্শনের কথা শুনে তিনি বললেন যে অর্দ্ধবৃত্তাকার পথে শিবকে প্রদক্ষিণ করার কথা শাস্ত্রে নির্দেশ আছে। উমা এইভাবেই শিবকে বরণ করেছিলেন।

অর্দ্ধবৃত্তাকার পথে উমার শিবকে বরণের কথা ঘরে আর কারো জানা ছিল না। একচল্লিশ বছর আগে শ্রীজীবনকৃষ্ণের এই রঙ্গময়ী মায়ামূর্তি দর্শন হয়। তাঁর এই দর্শনের সঙ্গে শাস্ত্রোল্লিখিত বিবরণের এক অপূর্ব সামঞ্জস্য রয়ে গেছে একথা ধীরেনদার কাছ থেকে শুনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বিস্ময়াবিষ্ট হলেন।

কিন্তু বিস্ময়ের পালা তখনও শেষ হয় নি। রাত্রে কথামৃত পাঠ শেষ হয়েছে। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছেন। ধীরেনদাও চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আবার ফিরে এসেছেন। তাঁর মনে পড়েছে যে আজই উমা চতুর্থী। তিনি প্রকাশ করলেন যে, উমা যেদিন শিবকে বরণ করেছিলেন, সেই তিথিই উমা চতুর্থী বলে নির্দিষ্ট হয়ে এসেছে। আজ সেই উমা চতুর্থী। ধীরেনদার কথা শুনে সকলে বিস্ময়াভিভূত হলেন। মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইন—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী!

২৪শে জুলাই, রবিবার, ১৯৬০।

আজকের প্রভাতী আসরে শ্রীজীবনকৃষ্ণ জানালেন—ধীরেন একটা স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নটা তোদেরকে বলি। ধীরেন দেখছে— সে আর স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) রয়েছে। ধীরেন ধ্যান করবে। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করছে, আমি কি আপনার ধ্যান করবো? স্বামীজী বললেন, তুমি হাওড়ায় যাঁর কাছে যাও, আমি তাঁর ধ্যান করি। ..... কী অদ্ভুত বল দেখি!

গতকাল ধীরেনের এই স্বপ্নের কথা শোনার পর আমার একটা স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল! সে কথা আর বলা হয় নি। স্বপ্নে

দেখছি— একটা বাড়ী। সেই বাড়ীর সামনে দিয়ে রাস্তা। রাস্তার ওপারেই একটা বড় দীঘি। দীঘির চারদিক দিয়ে রাস্তা, দীঘির ওপারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন স্বামীজী। তিনি যেন একজন Standard Bearer (পতাকাবাহী), তাঁর পিঠের দিকে যেন একটা Pole আর সেই পোলেতে একটা ব্যানার (পতাকা) টাঙানো রয়েছে। আমি সেই বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে স্বামীজীর দিকে এগিয়ে গেলুম। তাঁর কাছে এসে তাঁকে যেমনি প্রণাম করতে যাচ্ছি, স্বামীজী যেন কাতর হয়ে বলছেন, ''আপনি আমায় প্রণাম করবেন না, আপনি আমায় প্রণাম করবেন না।'' .....

এর একটা মানে হচ্ছে যে স্বামীজীর অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থা তুলনা করে দেখাচ্ছে। আমার স্বধাম থেকে কত নেমে এসে তবে স্বামীজীর স্থান! আর স্বামীজীকে Standard Bearer দেখাচ্ছে কেন বল দেখি? কিসের পতাকা নিয়ে বেড়াচ্ছেন? ওই যে— Point of Union।*

৪ঠা আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, ১৯৬০।

কথামৃতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, ওই যে ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলছেন, ব্রহ্মই কাল। লোকে বলে কালে কত এল, কত গেলরে ভাই,— কি করে একথা বোঝাবি যে ব্রহ্মই কাল। মধ্যবয়সী একজন লোক বললেন,— এখানকার কথা দিয়ে বোঝাব। আমার বাবা আপনাকে দেখেছিলেন। আমার ছেলেমেয়েরাও আপনাকে দেখে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, এই তিন পুরুষ, অর্থাৎ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ— তিন পুরুষেই আমি আছি, অর্থাৎ আমি শাশ্বত।

এমন সময় ধীরেনদা বললেন, তিন পুরুষে যে শাশ্বত হয় একথা আমাদের লোকাচারেও পাওয়া যায়। কেউ মারা গেলে এক বৎসর পরে তার সপিণ্ডকরণ হয়। সেই সপিণ্ডকরণের সময় তিন পুরুষের পিণ্ড এক

*Point of Union সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য— "That plan alone is practical, which does not destroy the individuality of any man in religion and at the same time shows him a point of union with all others." (The Ideal of a Universal Religion.) সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দর্শন করা স্বামীজীর ঐকান্তিক কামনার যেন এক বাস্তব রূপায়ণ। যে যাঁকেই ভজনা করুন না কেন, অন্তরে দেখেন শ্রীজীবনকৃষ্ণকে— The Point of Union!

সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তার মানে এই যে তিন পুরুষের সঙ্গে মৃত ব্যক্তি শাশ্বত হয়ে রইলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ধীরেনদার কথা শুনে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন। পরে ধীরে গম্ভীর স্বরে বললেন,— কার জন্যে এসব নিয়ম হয়েছে, কে জানে!

১৪ই আগস্ট। রবিবার; জন্মাষ্টমী; ১৯৬০।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, এখন আমাদের কাছে জীবনের উদ্দেশ্য কি? ঈশ্বর দর্শন, না একত্বলাভ? ধীরেনদা উত্তর দিলেন, একত্বলাভ!

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— প্রণাম হই বাবা, প্রণাম হই তোকে। হ্যাঁ, এই একত্বলাভই বড়। কেননা, specific ঈশ্বর দর্শন তো হয় না।

২৮শে সেপ্টেম্বর, বুধবার; মহাষ্টমী, ১৯৬০।

আজ মহাষ্টমী, ঘর লোকে পরিপূর্ণ। আলোচনার ধারা যেন গান্ধার থেকে ধৈবত ও নিষাদ বা নিখাদের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। জীবন ও জগত থেকে আলোচনা এগিয়ে চলল অমরত্বের দিকে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, ওরে, আমাকে দেখিয়েছে যে রে! রূপধারণ করে, আমার হাত ধরে একটার পর একটা করে দেখিয়েছে। ওই যে শ্লোকটা—

অসতো মা সদগময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

গোটা শ্লোকটা আমাকে রূপধারণ করে দেখিয়েছে। দেখছি— আমি যেন ফাঁকা জায়গা থেকে একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম (অসতো মা সদ্গময়)। সেই বাড়ীটার একটা ঘরের মধ্যে ঢুকতে আদিত্য বলে একজন লোক— সে তখন মারা গিয়েছিল— আমার হাত ধরে একতলা থেকে দোতলায় পার করে দিলে (তমসো মা জ্যোতির্গময়) । তারপর অমৃতবাবু বলে একজন লোককে দেখলাম। তিনি ছিলেন Deputy Inspector of School। তিনিও তখন মৃত। অমৃতবাবু আমার হাত ধরে তেতলায় পার করে দিলেন (মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।) এইভাবে একটার পর একটা দেখিয়েছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের কথা শেষ হলে ধীরেনদা বললেন,— আপনি যখন অমরত্বের কথা বলছিলেন আমি তখন ঘড়ি দেখছিলুম। দেখলুম— সন্ধি পূজার সময় শেষ হতে চলেছে আর আপনিও অমরত্বের কথা বলছেন। মর জগতের সঙ্গে অমর জগতের সন্ধিই সন্ধিপূজার উদ্দেশ্য। ..... ধীরেনদার কথা শুনে বিস্ময় বিজড়িত স্বরে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, তোর কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি। যেদিন তুই উমা চতুর্থীর কথা বলেছিলি, সেদিন যেমন অবাক হয়েছিলুম, আজও তেমনি অবাক হয়েছি। এ রকম strange coincidence হয় কী করে? বড় আশ্চর্য তো!

১৪ই অক্টোবর, শুক্রবার, ১৯৬০।

আজ আলোচনা প্রসঙ্গে যোগের কথা উঠল, শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, আমাদের দেশে যোগ বললে লোকে হঠযোগই বুঝত। ঠাকুরই রাজযোগের কথা আবার বলে গেছেন।

ধীরেনদা আজ শ্রীজীবনকৃষ্ণের পাশেই বসেছিলেন। রাজযোগের কথা হতে তিনি ধীরেনদার হাত দুটি ধরে ব্যাকুলভাবে বললেন— দেখ্, আমার বাপ চোদ্দপুরুষ কেউ তো কখনও রাজযোগের কথা জানত না। আমার দেহেতে ফুটল কেমন করে বল দেখি?

ধীরেনদা— হিন্দু ধর্মের কথায় আমি এর ব্যাখ্যা দিতে পারি।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— তাই বল্ না।

ধীরেনদা— ভগবান নিজে এসেছেন যে!

বাতাহত সমুদ্রের মত শ্রীজীবনকৃষ্ণের বরতনু আন্দোলিত হয়ে উঠল। আঃ— আঃ— করে হুঙ্কার করে তিনি ভাবাবিষ্ট হলেন। ঘর নিঃশব্দ, কারো মুখে কোন কথা নেই। নিজেকে সংবরণ করে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, তোদের কাছে হেরে গেলাম ..... জেতার উপায় নেই ..... হেরে গেলাম!

২০শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ১৯৬০।

আজকের সমাবেশে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, আমার একটা দর্শনের কথা আজ তোদের বলি শোন। আমি দেখছি একটা বড় সিন্ধুক। একটা lower class মারাঠী type-এর লোক— মাথায় এক দিক দিয়ে পাগড়ী—

মালকোঁচা বেঁধে কাপড় পরা— এসে সিন্ধুকের ডালা দুটো খুলে ফেল্‌ল। সিন্ধুকের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সে দুটো খুব বড় বড় লাল Ruby— আমার হাতে দিলে। আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। এই স্বপ্নের কিছু মানে করতে পারিস তোরা?

ধীরেনদা বললেন— রত্ন দুটি যখন দিয়েছে, তখন তা জগতে প্রকাশ পাবে; তবেই তো তার মূল্য! অর্থাৎ, দুটি জিনিস জগতে ফুটবে। ..... শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন— ওরে হ্যাঁ, তাইতো! এখন তো এর মানে পেলুম। দুটি জিনিস তো জগতে ফুটেছে— একটি ব্যষ্টি, আর একটি সমষ্টি!

২২শে নভেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯৬০।

ধীরেনদা আজ আসেন নি। কিন্তু রবিবার রাত্রে দেখা স্বপ্নের একটি নৈবেদ্য পাঠিয়েছেন বন্ধুবর শ্রীচিত্ত ভট্টাচার্য মারফৎ। ধীরেনদা দেখেছেন— তিনি শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরে এসে কথামৃত পাঠ করছেন। এমন সময় শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁকে একটি আম দিলেন। আমটি দেখতে কাঁচা ও শক্ত। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ধীরেনদাকে আমটি খেতে বললেন। কিন্তু ধীরেনদার মনে হচ্ছে আমটি কাঁচা আর টক্, তাই আমটি খেতে তাঁর একান্ত অনিচ্ছা। শ্রীজীবনকৃষ্ণ আবার অনুরোধ করায় ধীরেনদা আমটি খেতে শুরু করলেন, কিন্তু কী আশ্চর্য্য! অপূর্ব আস্বাদ ওই আমটির। তাছাড়া যত খান আমটি আর ফুরায় না। যেমন ছিল, পেট ভরে খাওয়ার পরেও আমটি তেমনি রইল। তিনি অপরকে আমটি খেতে দিলেন।

স্বপ্নটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন,— ধীরেন কথামৃত পড়ছে, আমি ওকে একটা আম দিলুম— এর মানে কি বল দেখি। আমাকে কথামৃত শোনাচ্ছে কি না, তাই ওকে ব্রহ্মজ্ঞান দিচ্ছি। তোরা স্বপ্নের মানে করিস— স্বপ্ন কি অদ্ভুত তা বুঝতে পারছিস? যারাই আমাকে কথামৃত শোনাবে তাদেরই ব্রহ্মজ্ঞান হবে। আমটি কাঁচা কেন? অর্থাৎ আমার যা হয়েছে তা তো ওর হয় নি। আবার, ওতে ওর অবস্থাও বোঝাচ্ছে— ধীরেন হ'ল বর্ণচোরা আম। বর্ণচোরা কেন? ধীরেন যাকে এখানকার কথা বলবে সে ওকে দেখবে না— দেখবে আমাকে। তাই বর্ণচোরা। যারাই আমাকে কথামৃত শোনাবে তারাই হোল ওই বর্ণচোরা আম!

২০শে জুন, মঙ্গলবার, ১৯৬১।

ধীরেনদা আজ একটি স্বপ্নের কথা ঘরে নিবেদন করলেন,— একটি কাগজের প্যাকেটে কি যেন মোড়া রয়েছে। ধীরেনদার মনে হচ্ছে ওই প্যাকেটটি পাঠিয়েছেন স্বয়ং শ্রীজীবনকৃষ্ণ। এমন সময় সেখানে এলেন— দিলীপবাবু ('সুধা কুম্ভ' লেখক— শ্রীদিলীপ কুমার ঘোষ)। তিনি মোড়কটি খুলে তার ভিতর থেকে কী যেন খেতে লাগলেন। সকলের মুখে একই প্রশ্ন, কী আছে ওই প্যাকেটটির মধ্যে? দিলীপবাবু বললেন— মাখন! তখন সকলেই প্যাকেট থেকে এক এক তাল মাখন নিয়ে খেতে লাগলেন। ..... ধীরেনদা দেখলেন— খাবার পর সকলেই ঘরের বাইরে চলে গেল। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছেন— এরা গেল কোথায়? বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির মধ্যেই তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন। ধীরেনদা তখন সম্পূর্ণরূপে নিরাবরণ— একেবারে উলঙ্গ! .....

শুদ্ধসত্ব ধীরেন্দ্রনাথ প্রায় আট বছর শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেছিলেন। এখানে মাত্র কয়েকটি দিনের কথা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হ'ল। কিন্তু তার সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা না জানালে অনেক কথাই যেন না-বলা রয়ে যায়। জগতের অগণিত মানুষ যুগ যুগান্ত ধরে ব্রহ্মের যে রূপ কল্পনা করে এসেছে, শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ সেই মানুষ-ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণের পূত সঙ্গের অমৃতধারায় অবগাহন করে তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গ করেছেন। ১৯৬২-'৬৩ সালে পুরীতে অবস্থান কালে ধীরেন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গ করেছেন। এই সময়েই ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি শ্লোক শ্রীজীবনকৃষ্ণকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং পরে পুরী অবস্থানকালেই তিনি সমষ্টিগত সাধনের নূতন আলোকে 'ধর্ম ও অনুভূতি' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ নূতনভাবে রচনা করেন। এই গ্রন্থে উপনিষদ হতে বহু শ্লোকের উদ্ধৃতি, রচনাকালে ধীরেন্দ্রনাথের উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রায় এগার মাস পুরীতে থাকার পর শ্রীজীবনকৃষ্ণ ফিরে এলেন। এবার তাঁর আবাস শ্রীরামপুরে (১৩ নং কক্রেন রোডে, শ্রীরবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে)। কয়েকজন ভক্তসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথও এই

সময়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন এবং এখানেই তিনি ‘ধর্ম ও অনুভূতি’ গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের মুদ্রণকার্য তত্ত্বাবধান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— কেউ নিজে আমটি খেয়ে মুখ পুঁছে ফেলে। আবার কেউ সেটিকে ভাগ করে নিজেও খায় আর অপরকেও দেয়। ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই শেষোক্ত দলে। তিনি নিজে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে পরিতৃপ্ত হন নি। তাঁর ঐকান্তিক অভিপ্রায় ছিল সত্যের যে প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নি তাঁর অন্তরকে আলোকিত করেছে, অপরেও সেই আলোকে উদ্ভাসিত হোক। এই প্রার্থনা আমাদের সকলেরই। আর তা আজ বাস্তব রূপ পাচ্ছে। দেশকালের গণ্ডী ছাড়িয়ে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অন্তরে সত্যমূর্তি শ্রীজীবনকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ ফুটে উঠছে — সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে তাদের হৃদয়।

লহ প্রণাম

হে ভগবান!
ধরার ধূলার হে মহামানব
জীবনকৃষ্ণ নাম
লহ গো, লহ প্রণাম!

কত উপচার পূজা আয়োজন
কোন কিছু আর নাহি প্রয়োজন
হৃদি মাঝে তুমি প্রকাশ আপনি
অন্তরযামী ভগবান!

স্বরগ তোমার নিবাস নহে
বিরাজ হে তুমি হৃদয় মাঝে
দেহ মন্দিরে মুরতি তোমার
মঙ্গলময় ভগবান।

তোমার প্রকাশে অপার শান্তি
দূরে চলে যায় সকল ভ্রান্তি
আনন্দ মুরতি জীবনকৃষ্ণ
হৃদয়-বল্লভ ভগবান!

শিশু ও বৃদ্ধ, মুর্খ জ্ঞানী,
পুরুষ ও নারী, দুঃখী ধনী
সবা মাঝে তুমি এক হয়ে আছ
জগত জীবন ভগবান!

ধরার মানুষ হয় ভগবান
মানুষ ব্রহ্ম করিলে প্রমাণ,
মুদিত নয়ন খুলে দিলে তুমি
মহিমাময় ভগবান!

[দ্বৈতবাদের ভাব নিয়ে রচিত উপরোক্ত গানটি মেয়ের গানের শিক্ষককে দিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। উনি খুশি হয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে ভগবান, ব্রহ্ম ইত্যাদি কথা গ্রহণ করতেন না। বলতেন, ভগবান বলে আমায় দূরে সরিয়ে রাখিস না, আমি আর তোরা এক।]